মূল মুদ্রণের পূর্বের কপি

প্রশিক্ষণ মডিউল

কমিউনিটি প্যারামেডিক-২০১৮

নবমপত্র

শিশু স্বাস্থ্য

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

প্রিন্ট: ২৪-০১-২০১৯

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের

মৌলিক প্রশিক্ষণ

বিষয় : ৯

শিশু স্বাস্থ্য

বিষয় ৯ ঃ শিশু স্বাস্থ্য

অধ্যায় ১ : ইপিআই

পাঠ-১	বাংলাদেশে ইপিআই (EPI) কর্মসূচী	৭
পাঠ-২	টিকা কিভাবে দেহকে রক্ষা করে এবং কি কি টিকা প্রদান করা হয়	১০
পাঠ-৩	প্রতিরোধযোগ্য ৪টি রোগ (ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও যক্ষ্মা), এর জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও প্রতিরোধ	১২
পাঠ-৪	পোলিওমাইলাইটিস, হাম, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, রুবেলা এবং নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া রোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ, চিহ্ন ও প্রতিরোধ	১৭
পাঠ-৫	বংলাদেশের প্রচলিত টিকাদান কর্মসূচি ও সিডিউল	২৫
পাঠ-৬	টিকা প্রদানের জন্য অনুসরণীয়	২৭
পাঠ-৭	টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ব্যবস্থাপনা	৩২
পাঠ-৮	কোল্ড চেইন	৩৪
পাঠ-৯	টিকা সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও নীতিমালা	৩৯
পাঠ-১০	টিকা সংমিশ্রণ	৪৭
পাঠ-১১	টিকা (ইনজেকশন) প্রয়োগ	৫০
পাঠ-১২	এএফপি ও ইপিআই রোগ নিরীক্ষণ	৫৫
পাঠ-১৩	শিশুদের অভিভাবক ও মায়েদের জন্য ইপিআই মূল বার্তা	৬০

অধ্যায় ২ ঃ শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ও পুষ্টি

পাঠ-১	শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সংজ্ঞা এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি	৬২
পাঠ- ২	শিশুর বিকাশের মাইলষ্টোন বা মাইলফলক ও শিশুর মানসিক বিকাশের ধাপসমূহ	৬৪
পাঠ-৩	শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ব্যহত হওয়ার কারণসমূহ	৬৭
পাঠ-৪	শিশুর ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিসমূহ	৬৯
পাঠ-৫	শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড পূরণ ও ব্যবহার	৭৭
পাঠ-৬	শিশুর ক্রমবৃদ্ধি সংক্রান্ত মায়েদের পুষ্টি শিক্ষা	৮৮
পাঠ-৭	খাদ্য ও পুষ্টি	৯০
পাঠ-৮	অনুপুষ্টি	৯৫
পাঠ-৯	দামী ও সস্তা খাবার	১০৬
পাঠ-১০	শিশুর অপুষ্টি	১০৮
পাঠ-১১	ভিটামিন-এ অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং জটিলতা	১১২
পাঠ-১২	ভিটামিন এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা	১১৭
পাঠ-১৩	আঁশযুক্ত খাবার	১২২
পাঠ-১৪	রক্তস্বল্পতা	১২৯

পাঠ-১৫	মায়ের দুধ খাওয়ানো ও শিশু পুষ্টি	১৩৫
পাঠ-১৬	শিশুর বাড়তি খাবার (৬-২৩ মাস) ওশিশুর স্বাভাবিক খাবার (২৪-৫৯ মাস)	১৪৪
পাঠ-১৭	কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি	১৫২
পাঠ-১৮	গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি	১৫৭
পাঠ-১৯	খাদ্য নিরাপত্তা, খাবারের গুনগত মান এবং নিরাপদ খাবার	১৭৫
পাঠ-২০	দূর্যোগকালীন অপুষ্টির কারণ, খাদ্য সহায়তা এবং IYCF এর নীতিসমূহ	১৮৮
পাঠ-২১	অপুষ্টিজনিত রোগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	১৯৪
পাঠ-২২	পুষ্টি বিষয়ক রেফারেল ও ফলো-আপ	২০০

অধ্যায় ৩ ঃ আইএমসিআই

পিডিএফ ফরমেট-এ আলাদাভাবে আছে

অধ্যায় ৪ ঃ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রতিবন্ধিতা

পাঠ- ১	শিশু, শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও তার গুরুত্ব	২০৮
পাঠ-২	শারীরিক বৃদ্ধির ধারণা	২১০
পাঠ-৩	শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা	২১২
পাঠ-৪	মানসিক বিকাশে মস্তিষ্কের ভূমিকা	২১৩
পাঠ-৫	মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নের গুরুত্ব	২১৪
পাঠ-৬	শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা	২১৭
পাঠ-৭	শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে শরীর, মন ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক	২১৯
পাঠ-৮	শিশুর জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ এবং ক্ষতিকারক পরিবেশ ও বিপদজনক বিষয়	২২০
পাঠ-৯	শিশুর শেখার প্রক্রিয়া	২২২
পাঠ-১০	শিশু বিকাশের জন্য খেলার গুরুত্ব	২২৩
পাঠ-১১	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু যত্নকারীদের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাব্য মাধ্যম	২৩৩
পাঠ-১২	প্রতিবন্ধিতা ও এর গুরুত্ব এবং কমিউনিটি প্যারামেডিকের ভূমিকা	২৩৪
পাঠ-১৩	প্রতিবন্ধিতার ধরন ও কারণ	২৩৭
পাঠ-১৪	প্রতিবন্ধি শিশুদের সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা	২৪১
পাঠ-১৫	প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উপায় ও সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব	২৫০

অধ্যায় ৫ : বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসুচী

পাঠ-১	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী	২৫৪

Abbreviations

AD	-	Auto Disabled
AFP	-	Acute Flaccid Paralysis
BCC	-	Behavioral Change Communication
BCA	-	Bacillus Cullman Guerin
DPT	-	Diphtheria Pertussis Tetanus
EFPI	-	Expanded Program on Immunization
FWV	-	Family Welfare Visitor
HPSP	-	Health and Population Sector Program
HIB	-	Haemophilus Influenza-B
IMCI	-	Integrated Management of Childhood Illness
I.V	-	Intra Venous
IU	-	International Unit
LBW	-	Low Birth Weight
NGO	-	Non Government Organization
NT	-	Neonatal Tetanus
OPV	-	Oral Polio Vaccine
ORS	-	Oral Rehydration Salt
ORT	-	Oral Rehydration Therapy

ORI	-	Outbreak Response Immunization
PEM	-	Protein-Energy Malnutrition
RBC	-	Red Blood Cell
TB	-	Tuberculosis
TT	-	Tetanus Toxoid
VVM	-	Vaccine Vial Monitor
WBC	-	White Blood Cell

অধ্যায় ১ : ইপিআই

পাঠ-১
বাংলাদেশে ইপিআই (EPI) কর্মসূচী

ভুমিকা ঃ

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে বর্তমান আওতাধীন ৮টি সংক্রামক রোগের পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে সারা দেশে ১ বছরের কম বয়সী সকল শিশুদের এমআর (হাম ও রুবেলা) এবং ১৫ মাস বয়সী সকল শিশুদের হমের দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সাল থেকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে উল্লেখিত ৯টি সংক্রামক রোগের পাশাপাশি সারা দেশে এক বছরের কম বয়সী সকল শিশুদের নিউমোকক্কাল জনিত নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন সংযোজন করেছে।

বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ঃ

- শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার এবং শিশুর পঙ্গুত্বের হার কমানো

টিকাদান কর্মসূচির উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

- ০-১১ মাস বয়সী সকল শিশু
- ১৫-১৮ মাস বয়সী সকল শিশু
- ১৫ বছর বয়সী সকল কিশোরী
- ১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তান ধারণক্ষম সকল মহিলা

প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ ঃ

১। শিশুদের যক্ষ্মা

২। পোলিও মাইলাইটিস

৩। ডিফথেরিয়া

৪। হুপিং কাশি

৫। মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার

৬। হেপাটইটিস-বি

৭। হিমোফোইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগসমূহ

৮। হাম

৯। রুবেলা

১০। নিউমোকক্কাল জনিত নিউমোনিয়া

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহ

(ক) টিকাদান অর্জন লক্ষ্যমাত্র

- ২০১৬ সালের মধ্যে নিয়মিত টিকাদানের আওতায় সকল শিশুর প্রতিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগ এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগে উন্নীত করা এবং তা অব্যাহত রাখা।
- ২০১৬ সালের মধ্যে নিয়মিত টিকাদানের আওতায় ৫ ডোজ টিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়েকমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত করা এবং তা অব্যাহতরাখা।

(খ) রোগ হ্রাস লক্ষ্যমাত্র

- পোলিও রোগ নিমূল অবস্থা বজায় রাখা
- নবজাতকের ধনুষ্টংকার দূরীকরণ অবস্থা বজায় রাখা অর্থাৎ প্রতি জেলায় প্রতি বছর ১০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত ১ এর নিচে রাখা
- ২০১৬ সালের মধ্যে হামের টিকার হার ৯৫ ভাগে উন্নীত করে হাম দূরীকরণ অবস্থায় পৌঁছানো
- ২০১৬ সালের মধ্যে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের হেপাটাইটিস-বি এর দীর্ঘ মেয়াদী সংক্রমণের (HBsAg) হার টিকাদান পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শতকরা ৯০ ভাগ হ্রাস করা (টিকাদান পূর্ববর্তী সময়ের অর্থাৎ ২০০৩ সালের পূর্বে দীর্ঘ মেয়াদি সংক্রমণের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার)
- ২০১৬ সালের মধ্যে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি (Hib) সংক্রমণ জনিত মৃত্যুর হার ২০০৭ সালের সংক্রমণের হারের চেয়ে শতকরা ৯০ ভাগ হ্রাস করা (২০০৭ সালে হিব সংক্রমণ জনিত মৃত্যুর হার প্রায় ২৫ হাজার)।
- ২০১৬ সালের মধ্যে রুবেলা টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে ৯৫ ভাগে উন্নীত করে রুবেলা রোগের হার ২০১০ সালের তুলনায় ৯০ ভাগ কমানো (২০১০ সালে হামের রোগ প্রার্দুভাব এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী রুবেলাতে আক্রান্তের সংখ্যা বছরে ১২,৭২৭ জন)
- ২০১৬ সালের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রম (সিআরএস) প্রতিরোধকল্পে ১৫ বছরের কিশোরীদের 'এমাআর' টিকার হার ৯৫ ভাগে উন্নীত করা।
- ২০১৬ সালের মধ্যে নিউমেকক্কাল জনিত নিউমোনিয়া রোগের হার ৯০ ভাগ হ্রাস করা (প্রতি বছরে ১০ লক্ষ শিশু আক্রান্ত হয়)।

ইপিআই কর্মসূচীতে কমিউনিটি প্যারামেডিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর গুরুত্ব ব্যাখা:

- বাংলাদেশে মা ও শিশুর মৃত্যু হার অনেক বেশী। টিকা দিয়ে মা এবং শিশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। বিশেষ করে হামের টিকা, হামের জটিলতা (ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়া) প্রতিরোধ করে।
- বাংলাদেশের মা ও শিশুরা সেবা পাওয়ার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এসে থাকেন। সুতরাং এই কেন্দ্রগুলিই হল মূল কেন্দ্র যেখানে খুব সহজেই মা ও শিশুদের প্রতিষেধক টিকা দেয়অ সম্ভব। ইপিআই কেন্দ্র ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক সাধারণত: মার্জ করা থাকে।
- এই কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের জন্মের হিসাব ও গর্ভবতী মায়েদের হিসাব রাখা হয়। সুতরাং কোন নবজাত শিশু বা গর্ভবতী মা ও অন্য শিশুরা যদি প্রতিষেধক না পেয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করে টিকা দেয়া সম্ভব হবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।
- মা এবং শিশুরা ইপিআই কেন্দ্রে টিকা নিতে আসবেন। ইপিআই কেন্দ্র ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক মার্জ হওয়ার কারণে কমিউনিটি প্যারামেডিক হিসাবে এই সুযোগ নিয়ে মাদের গর্ভকালীন সেবাদান, পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শদান এবং মা ও শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষা দান করতে পারে।

২। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিককে কি কি কাজ করতে হবে

- ইপিআই সম্বন্ধে স্বাস্থ্য শিক্ষা (বিসিসি) দেয়া
- টিকাদান কেন্দ্র সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
- টিকা বীজ সংরক্ষণ
- টিকাবীজের সংমিশ্রণ ও টিকাদান
- কোল্ড চেইন রক্ষণাবেক্ষণ
- ইপিআই ফর্ম পূরণ ও রিপোর্ট তৈরী করা
- টিকাদান ক্লায়েন্টদের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনুসরণ করা।

পাঠ-২
টিকা কিভাবে দেহকে রক্ষা করে এবংকি কি টিকা প্রদান করা হয়

রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে কি বুঝায়?

- রোগ জীবাণু (এন্টিজেন) শরীর আক্রমণ করে।
- সাধারণত জীবাণু শরীরে ঢোকার পর শরীরে এ্যান্টিবডি তৈরী হয়।

- এন্টিবডি এ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে।
- টিকার মাধ্যমে মৃত বা দুর্বল রোগ জীবাণু বা জীবাণু উৎপাদিত বীজ ইনজেকশন বা মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রয়োগ করা হয়।
- ফলে শরীরে যথেষ্ট এ্যান্টিবডি বা প্রতিষেধক তৈরী হয়। তাই রোগ হয় না।
- আসল রোগ জীবাণু যখন শরীরে ঢুকে তখন এ্যান্টিবডি প্রস্তুত থাকে। এ্যান্টিবডিগুলো সঙ্গে সঙ্গে রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে শুরু করে। তাছাড়া একবার তৈরী হবার পর যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত এ্যান্টিবডি আরও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। ফলে রোগ জীবানু তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- টিকা দেহকে এ্যান্টিবডি উৎপাদনে উত্তেজিত করে।

টিকাগুলো কি কি রোগ প্রতিরোধ করে

পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা-

- টিটেনাস (ধনুষ্টংকার)
- ডিপথেরিয়া
- পারটুসিস (হুপিং কাশি)
- হেপাটাইটিস-বি
- হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি

বিসিজি টিকা-

- যক্ষ্মা

এমআর টিকা

- হাম ও রুবেলা

ওপিভিটিকা

- পোলিও মাইলাইটিস

আইপিভি টিকা (IPV-Inactivated Polio Vaccine)

- পোলিও মাইলাইটিস

পিসিভি টিকা

- নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া

মিজল্‌স টিকা

- হাম

ইপিআই কর্মসূচীর প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ

১৮ মাসের কম বয়সের শিশুরা এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সের সকল সন্তান ধারণক্ষম মহিলারাই হচ্ছে টিকাদানের প্রধান লক্ষ্য বা টার্গেট গ্রুপ বা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী।

১. ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৮ মাসের কম বয়সের শিশুদের টিকা দিয়ে যে ১০ টি রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো হলো-

- ধনুষ্টংকার
- যক্ষ্মা
- ডিপথেরিয়া
- পোলিও
- হুপিংকাশি
- হেপাটাইটিস-বি
- হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি
- হাম
- রুবেলা
- নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া

এই সবকটি রোগই সংক্রামক এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান। ১৮ মাসের কম বয়সের শিশুদের এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এ সবকটি রোগই টিকাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

২. ই পি আই কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্তান ধারণক্ষম (১৫-৪৯ বৎসর) মহিলাদের ধনুষ্টংকারের টিকা দিয়ে ধনুষ্টংকার রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠ-৩

প্রতিরোধযোগ্য ৪টি রোগ (ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও যক্ষ্মা), এর জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও প্রতিরোধ

নবজাতকের ও মায়ের ধনুষ্টংকার

কারণ ঃ শিশুর মলের মাধ্যমে নির্গত এই রোগের জীবাণু মাটির সাথে মিশে থাকে। এই রোগের জীবাণু কাটা স্থান দিয়ে শরীরে ঢোকে। শিশুর জন্মের পর অপরিষ্কার (জীবাণুযুক্ত) ছুরি, কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে নাড়ী কাটলে অথবা কাঁচা নাড়ীতে গোবর বা ময়লা কাপড় ব্যবহার করলে নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকার রোগ

হয়ে থাকে। ধনুষ্টংকার রোগের জীবাণুর নাম ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটেনী (Clostridium Tetany) ব্যাকটেরিয়া।

লক্ষণ ঃ জন্মের ১ম ও ২য় দিন শিশু স্বাভাবিকভাবে কাঁদতে পারে এবং বুকের দুধ টেনে খেতে পারে। জন্মের ৩-২৮ দিনের মধ্যে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শিশু বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, শিশুর মুখ ও চোয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং জোরে কাঁদতে পারে না। শিশুর খিঁচুনী হয় এবং শরীর শক্ত হয়ে যায় মায়ের ক্ষেত্রে, গর্ভকালীন ও প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে ধনুষ্টংকার হতে পারে। চোয়াল, ঘাড় ও শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়,। গিলে খেতে অসুবিধা ও খিঁচুনী হয়। পেছনের দিকে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়।

চিত্র ঃ ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত শিশু

ভয়াবহতা ঃ নবজাতকের ধনুষ্টংকার শিশু মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। এই রোগের চিকিৎসা করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই রোগে আক্রান্ত নবজাতক প্রায়ই মারা যায়।

প্রতিরোধ ঃ ১৫-৪৯ বছরের সন্তান ধারণক্ষম সকল মহিলাকে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব ৫ ডোজ টিটি টিকা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দিয়ে নবজাতকের ধনুষ্টংকার-এ মৃত্যু রোধ করা যায়। এছাড়া নিরাপদ প্রসব পদ্ধতি (Safe Delivery Practice) অভ্যাস করা ও নাভী কাটার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্লেড ব্যবহার করতে হবে।

ডিপথেরিয়া

কারণ ঃ ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু ডিপথেরিয়া রোগাক্রান্ত শিশুর হাঁচি কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এ জীবাণু যদি সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে তখন এই রোগ দেখা যায়। জীবাণুর নামকরনীব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া (Corynebacterium Diptheriae) ব্যাকটেরিয়া।

লক্ষণ ঃ শিশু খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঠিকমতো খায় না এবং খেলাধুলা করে না। ৩ দিন জ্বর, সর্দি ওকাশি দেখা দেয়। গলা ফুলে যায় এবং কণ্ঠনালী ভিতরে সরের মত সাদা আস্তরণ পড়ে।

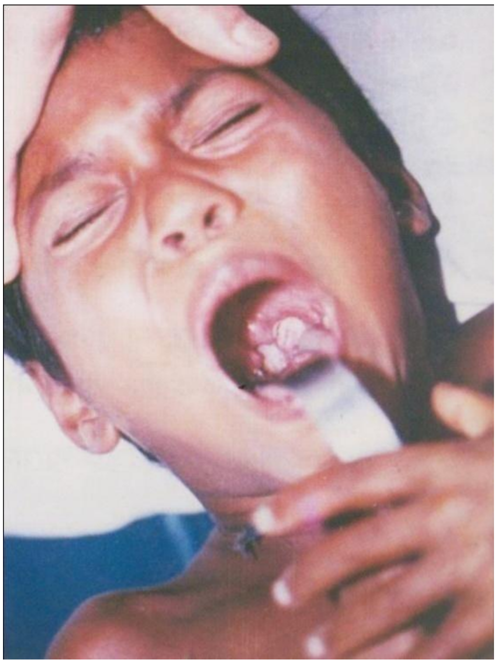

চিত্র ঃ ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত শিশু

৪-৬ দিন ঃ শিশু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, কণ্ঠনালীর গ্রন্থিগুলি খুব বেশী ফুলে যায়। কণ্ঠনালীতে ধূসর রং-এর সুস্পষ্ট আস্তরণ পড়ে। এটা শ্বাসনালীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে।

ভয়াবহতা ঃ এ রোগ হৃৎপিন্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে এবং শিশুর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ শিশুর জন্মের এক বৎসরের মধ্যে ২৮ দিন বা এক মাস পর পর তিন ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দিলে তা শিশুকে ডিপথেরিয়া থেকে রক্ষা করে। প্রথম ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হল শিশুর ছয় সপ্তাহ বয়স।

হুপিং কাশি (পারটুসিস)

কারণ ঃ হুপিং কাশিতে আক্রান্ত শিশু হাঁচি কাশি দেয়ার সময় বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় এবং আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শেও এই রোগ ছড়ায়। জীবাণুর নাম বড়ডেটেলা পারটুসিস ব্যাকটেরিয়া।

লক্ষণ ঃ **১ম সপ্তাহ ঃ** শিশুর জ্বর হয়, নাক দিয়ে পানি পড়ে, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, কাশি দেখা দেয়।

২য় সপ্তাহ ঃ কাশি মারাত্মক আকার ধারণ করে। শিশু যখন কাশে তখন তার খুব কষ্ট হয় এবং চোখ স্ফীত ও লাল হয়ে যায়। কাশির পর শিশু "হুপ" শব্দ করে শ্বাস নেয়। অনেক সময় বমিও

হয়। ছয় মাসের কম বয়স্ক শিশু “হুপ” শব্দ ছাড়াও কাশতে পারে এবং বমি করতে পারে। যদি কাশি তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে চলে তাহলে হুপিং কাশি বলে অনুমান করা যেতে পারে।

চিত্র ঃ হুপিং কাশিতে আক্রান্ত শিশু

১-৬ সপ্তাহ ঃ কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

ভয়াবহতা ঃ হুপিং কাশির ফলে শিশু দুর্বল হয়েযায় এবং অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুর নিউমোনিয়া হতে পারে। শিশুর চোখে রক্ত জমাট বেঁধে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যে ২৮ দিন বা একমাস অন্তর অন্তর তিন ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা শিশুকে হুপিং কাশি থেকে রক্ষা করে। প্রথম ডোজ দেয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো শিশুর ছয় সপ্তাহ বয়সে। ৬ মাস বয়সের মধ্যেই শিশু মারাত্মক ভাবে হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, সে কারনে ৬ সপ্তাহ বয়স থেকেই পেন্টাভ্যালেন্ট দেয়া শুরু করা অত্যন্ত জরুরী।

শিশুদের যক্ষ্মা

কারণঃ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত লোকের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে, আক্রান্ত লোক যখন কাশে তখন তার থুথুর মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। জীবাণুর নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস।

লক্ষণ ঃ তিন সপ্তাহের বেশী অল্প অল্প জ্বর ও কাশি, ক্ষুধা কমে যায়, দুর্বলতা, গ্রন্থি ফুলে যায়, পরে পেকে যেয়ে গ্রন্থি-বগল বা ঘাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে ওজন কমে যায়।

চিত্র ঃ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত শিশু

- **হাড়-এর যক্ষ্মা ঃ**যে কোন হাড়ের জোড়া ফুলে যায় এবং অচল হয়ে যায়। মেরুদন্ড যক্ষ্মার ফলে বাঁকা হয়ে যায়, ব্যথা হয়।
- **মস্তিষ্ক-এর যক্ষ্মা (টিবি মেনিনজাইটিস) ঃ** এর ফলে মারাত্মক মাথা ব্যথা, অচেতনতা, ঘাড় শক্ত ও খিঁচুনী হয়।

ভয়াবহতা ঃসময়মত সঠিক চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু হতে পারে এবং রোগ ছড়াতে পারে।

প্রতিরোধ ঃজন্মের পরপরই যত শীঘ্র সম্ভব বিসিজি টিকা দিলে তা শিশুর দেহে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জন্মের পরপর বিসিজি দেয়া না হলে, ৬ সপ্তাহ বয়সে শিশুকে অবশ্যই বিসিজি টিকা দিতে হবে।

পাঠ-৪
পোলিওমাইলাইটিস, হাম, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, রুবেলা এবং নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়ারোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ, চিহ্ন ও প্রতিরোধ

পোলিও মাইলাইটিস

কারণ ঃ আক্রান্ত শিশুর মল দ্বারা দূষিত পানি খেলে বা আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এই রোগ হতে পারে। জীবাণুর নাম পোলিও ভাইরাস।

লক্ষণ ঃ ১-৩ দিন- শিশুর সর্দি, কাশি এবং সামান্য জ্বর হয়।

৩-৫ দিন- মাথা ব্যথা করে, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, জ্বর থাকে, শিশুর হাত অথবা পা অবশ হয়ে যায়, শিশু দাঁড়াতে চায় না। উঁচু করে ধরলে আক্রান্ত পায়ের পাতা ঝুলে পড়ে। দাঁড় করাতে চাইলে শিশু কান্নাকাটি করে। শিশুর আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমশ দুর্বল হয় এবং পরে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

চিত্র ঃ পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু

ভয়াবহতা ঃ শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ফলে আক্রান্ত অংগ দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। আক্রান্ত অঙ্গের মাংসপেশী চিকন হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশী অবশ হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশুর মারাও যেতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ এক মাস পর পর তিন ডোজ পোলিও টিকা শিশুর এক বছর বয়সের ভিতরে খাওয়ানো হলে তা শিশুর দেহে পোলিও রোগ প্রতিরোধ করে। প্রথম ডোজ দেয়ার সবচেয়ে ভালো সময় শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স।

হাম

কারণ ঃ হামে আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং হাম রোগ সৃষ্টি করে। জীবাণুর নাম হাম ভাইরাস (Measles Virus)।

লক্ষণ ঃ ১-৩ দিন : বেশী জ্বর, সর্দি, কাশি, চোখ লাল হয়ে যায় এবং পানিতে টল টল করে।

চতুর্থ দিন: জ্বর কমে আসে, মুখে এবং শরীরে লালচে দানা দেখা দেয়।

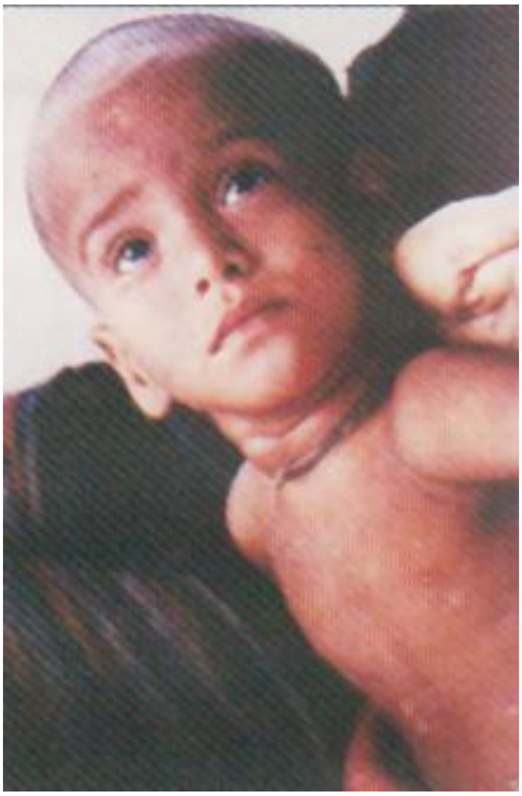

চিত্র ঃ হামে আক্রান্ত শিশু

হামের দানা উঠার ৩/৪ দিন পর ঃ দানা কালচে হয়ে এক সময় খুসকির মতো হয়ে ঝরে যায়।

ভয়াবহতা ঃ হামের ফলে শিশু নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। কান পাকা রোগ হতে পারে। শিশুর রাতকানা রোগ দেখা দিতে পারে, এমনকি চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পার। হামের নানা জটিলতার কারণে অনেক শিশু মারাও যায়।

প্রতিরোধ ঃ শিশুর ৯ মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাকে এক ডোজ এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা দিলে ও ১৫ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকা দিলে সে হাম রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে। হামে আক্রান্ত হওয়ার পরে শিশুকে ২ ডোজ ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

হেপাটাইটিস-বি

কারণ ঃ হেপাটাইটিস-বি নামক ভাইরাস দ্বারা শিশুর লিভার-এ প্রদাহের সৃস্টি করে হয়।

কিভাবে ছড়ায় ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে।
- যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- হেপাটাইটিস-বি এ আক্রান্ত মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে।

- খেলায় আঘাত পেলে আক্রান্ত শিশু থেকে সুস্থ্য শিশুর শরীরে সংক্রমণ হতে পারে।
- সংক্রমিত ইনজেকশনের সূঁচ, সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে।

লক্ষণ ঃ জন্ডিস (চোখ ও প্রস্রাব হলুদ হয়), পেট ব্যথা, বমি বা বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দা, মাংসপেশী ও পিঠে ব্যথা, অস্বস্তি।

চিত্র ঃ হেপাটাইটিস-বি আক্রান্ত শিশু

ভয়াবহতা ঃ লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, এমন কি মৃত্যু হতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ

- জন্মের ৬ সপ্তাহ থেকে ১ মাস পর পর ৩ ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন দিতে হবে।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি বিশোধনের মাধ্যমে।
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে।
- নিরাপদ ইনজেকশন ব্যবহারের মাধ্যমে।
- কনডম ব্যবহারের মাধ্যমে।
- শিশুর জন্মের পর পরই হেপাটাইটিস ইমিউনো গ্লোবিউলিন ব্যবহারের মাধ্যমে।

হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি

হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যা শিশুদের দেহে মারাত্মক ধরনের সংক্রমণ তৈরী করে। এ সংক্রমণের মধ্যে অন্যতম হল ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস (ব্যাকটেরিয়াজনিত মস্তিষ্কের সংক্রামণ) এবং মারাত্মক নিউমোনিয়া এছাড়াও এই ব্যাকটেরিয়া রক্ত, অস্থি, হাড়, গলা, কান এবং হৃদপিন্ডের আবরণে সংক্রমণ ঘটায়।

হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা "এ, বি, সি, ডি, ই, এফ" এই ৬ ধরনের হয়ে থাকে। তবে শিশুদের ৯০ ভাগের বেশি মারাত্মক সংক্রমণের জন্য হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি দায়ী। হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি সাধারণত ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের হয়ে থাকলেও ৪ মাস থেকে ১৮ মাসের শিশুরাই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

কিভাবে ছড়ায়

এই রোগের জীবাণু রোগাক্রান্ত শিশু হাঁচি কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সুস্থ শিশু আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এমনকি আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত সামগ্রীর (তোয়ালে, খেলনা ইত্যাদি) মাধ্যমে এ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

চিত্র ঃ হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি

লক্ষণ

ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস ঃ

- মাথা ব্যথা, জ্বর, বমি ও ঘাড় শক্ত হয়ে যায়।
- উজ্জ্বল আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়।
- গিটে ব্যথা হয়।
- ঘুম ঘুম ভাব হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়
- অচেতন হয়ে যায়

মারাত্মক নিউমোনিয়া

- যে কোনো একটি সাধারণ বিপলজ্জনক লক্ষণ থাকে, যেমন- পান করতে বা বুকের দুধ খেতে পারে না, অথবা সব খাবার বমি করে ফেলে অথবা খিঁচুনী হয়।

- শ্বাস নেয়ার সময় বুকের নিচের অংশ ভিতরে ডেবে যায়।
- দ্রুত শ্বাস নেয়া

ভয়াবহতা

সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত শিশু পঙ্গু হতে পারে এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। কোনোকোনো ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার পরেও শিশুর মৃত্যুর হতে পারে।

রুবেলা

রুবেলা একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগের জীবাণু প্রধানত বাতাসের সাহায্যে শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে এবং রুবেলা রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। গর্ভবর্তী মায়েরা গর্ভের প্রথম ৩ মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে গর্ভের শিশু আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে গর্ভের শিশুর মৃত্যু হতে পারে অথবা জন্মগত বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা কন্জেনিটাল রুবেলা সিনড্রম (সিআরএস) নামে পরিচিত।

কিভাবে ছড়ায়

রুবেলা আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসের সাহায্যে শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে।

লক্ষসমূহঃ

- গোলাপি রং-এর হালকা দানা দেখা যায়। প্রথমে দানা মুখমন্ডলে বের হয়, যা পরবর্তী ৫-৭ দিনের মধ্যে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়।
- ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- অল্প জ্বর, সর্দি ও কাশি, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা
- চোখ লাল হওয়া
- ক্ষুধা মন্দা, বমি বমি ভাব
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্থি সন্ধি ব্যথা হতে পারে
- অস্বস্থি বোধ করা

ভয়াবহতা

- কন্জেনিটাল রুবেলা সিনড্রম
- নাক দিয়ে রক্ত পড়া
- প্রসাবের সাথে রক্ত যাওয়া
- অস্থি সন্ধিতে ব্যথা
- মস্তিষ্কের ঝিল্লির প্রদাহ
- অন্তে রক্তক্ষরণ

এই রোগের জটিলতা শিশুদের তুলনায় বড়দের বেশি দেখা যায়। জটিলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "কন্‌হেনটাল রুবেলা সিনড্রম" (সিআরএস) গর্ভবর্তী মায়েরা যদি রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে গর্ভের

শিশু মারাত্মক জটিলতা বা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে যেমনঃ বধির, চোখের ছানি, হৃদপিন্ডের জটিলতা এবং মানসিক প্রতিবন্ধিকতা ইত্যাদি, যাকে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রম (সিআরএস) বলে।

প্রতিরোধ ঃ

শিশুদের ঃ ৯ মাস বা ২৭০ দিন বয়স পূর্ণ হলে এক ডোজ এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা দিয়ে শিশুকে রুবেলা রোগ থেকে প্রতিরোধ করা যায়।

কিশোরদের ঃ ১৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হলেই সকল কিশোরীদের ১ ডোজ এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা, ১ ডোজ টিটি টিকার সাথে দিতে হবে। পরবর্তীতে টিটি টিকার সময়সূচি অনুযায়ী ৫ডোজ টিটি টিকা দেয়া শেষ করতে হবে।

নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া

নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া এক ধরনের নিউমোনিয়া যা স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি জীবাণু দ্বারা শিশুদের দেহে মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়। এই নিউমোকক্কাস সংক্রমণ সাধারণত শ্বাসতন্ত্রে বেশি হয়। এই জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত মারাত্মক রোগসমূহের মধ্যে নিউমোনিয়া এবং মেনিনজাইটিস অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য রোগসমূহ যেমনঃ রক্তপ্রদাহ, কানের প্রদাহ, সাইনাস প্রদাহ এবং শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস) হতে পারে।

কিভাবে ছড়ায়

এই রোগের জীবাণু প্রধানতঃ আক্রান্ত রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সুস্থ শিশু আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এমনকি আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত সামগ্রীর (তোয়ালে, খেলনা ইত্যাদি) মাধ্যমে এ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়াও রোগের জীবাণু সুস্থ মানুষের নাক, সাইনাস ও মুখে থাকতে পারে যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে ছড়িয়ে এ রোগ ঘটাতে পারে।

লক্ষণ

নিউমোনিয়া:

- কাশি অথবা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত শিশুর বয়স অনুযায়ী দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়ার লক্ষণ
- শ্বাস নেয়ার সময় বুকের নিচের অংশ ভিতরে ডেবে যাওয়া মারাত্মক নিউমোনিয়া লক্ষণ

ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস:

- মাথা ব্যথা, জ্বর, বমি ও ঘাড় শক্ত হয়ে যায়
- উজ্জ্বল আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়
- ঘুম ঘুম ভাব হয়
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়
- অচেতন হয়ে যায়

ভয়াবহতা

- মারাত্মক শ্বাসকষ্ট
- শরীরের তাপমাত্র কমে যায় এবং অচেতন হয়ে যায়

- সময়মত সঠিক চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত শিশু পঙ্গু হতে পারে এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার পরেও শিশুর মৃত্যু হতে পারে।

কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ

- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, বিশেষ করে ২ বছরের কম বয়সী শিশু
- ৬৫ বছরের বেশি বয়সী বৃদ্ধ ব্যক্তি
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি, সিকল সেল এ্যানিমিয়া এবং ক্রনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি
- ৬ মাসের কম বয়সী যারা মায়ের দুধ খায়না এবং যে সকল শিশু বাড়ির ভিতর ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকে।

নিউমোকক্কাল রোগের চিকিৎসা

- নিউমোকক্কাল রোগ এ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়। নিউমোকক্কাল আক্রান্ত রোগীর দ্রুত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কিভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়

শিশুদের জন্মের প্রথম বছরে নিউমোকক্কাল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তবে শিশুর ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। নিউমোকক্কাল রোগের বিরুদ্ধে টিকা দিয়ে শিশুকে রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

তিন ডোজ নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পিসিভি) দিয়ে শিশুকে এ রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

নিউমোকক্কাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করার জন্য সেরোটাইপের (Serotype) উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পিসিভি) তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পিসিভি-৭, পিসিভি-১০ ও পিসভি-১৩। বাংলাদেশে নিউমোকক্কাল রোগের প্রাদুর্ভাবের উপর নির্ভর করে সরকার পিসিভি-১০ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাঠ-৫

বংলাদেশের প্রচলিত টিকাদান কর্মসূচি ও সিডিউল

০-১১ মাস এবং ১৫মাস বয়সের শিশুদের টিকাদান সময়সূচী

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার ডোজ	ডোজের সংখ্যা	ডোজের মধ্যে বিরতি	টিকা দেওয়ার সঠিক সময়	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
যক্ষ্মা	বিসিজি	০.০৫ এম এল	১	-	জন্মের পর পর	বাম বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার মধ্যে
ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস- বি, হিমোফাইলাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা -বি	পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা (ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব)	০.৫ এম এল	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ	বাম উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে (১ম- বাম, ২য়-ডান ৩য়- বাম উরুতে)	মাংসপেশী
নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া	পিসিভি টিকা	০.৫ এম এল	৩	৪/৮সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৮ সপ্তাহ	ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে (১ম- ডান, ২য়- বাম ৩য়- ডান উরুতে)	মাংসপেশী
পোলিওমাইলাইটিস	ওপিভি টিকা	২ ফোঁটা	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ	মুখে	মুখে
	আইপিভি টিকা	০.৫ এম এল	১	-	১৪ সপ্তাহ	ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	মাংসপেশী
হাম ও রুবেলা	এমআর টিকা	০.৫ এম এল	১	-	৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে	ডান উরুর মধ্যভাগের	চামড়ার নীচে

						বহিরাংশে	
হাম	হামের টিকা	০.৫ এম এল	১	-	১৫ মাস পূর্ণ হলে	বাম উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে।	চামড়ার নীচে

১৫ বছর বয়সী কিশোরী ও ১৫-৪৫ বছর বয়সের মহিলাদের টিকাদান সময়সূচি

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার ডোজ	ডোজের সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক সময়	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
হাম রুবেলা	এমআর	০.৫ এম এল	১	১৫ বছর বয়সী কিশোরী ১ম ডোজ টিটি টিকা পাওয়ার সময়	বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার নীচে
ধনুষ্টংকার	টিটি (টিটিনাস টক্সয়েড)	০.৫ এম এল	৫	টিটি-১ : ১৫ বছর বয়সে	বাহুর উপরের অংশে	মাংসপেশী
				টিটি-২ : টিটি-১ পাওয়ার কমক্ষে ২৮ দিন পর		
				টিটি-৩ : টিটি-২ পাওয়ার কমক্ষে ৬ মাস পর		
				টিটি-৪ : টিটি-৩ পাওয়ার কমক্ষে ১ বৎসর পর		
				টিটি-৫ : টিটি-৪ পাওয়ার কমক্ষে ১ বৎসর পর		

মন্তব্য

- প্রথম ডোজে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না।
- গর্ভবতী মহিলাকে টি টি-২ বাচ্চা প্রসবের অন্তত ১ মাস আগে দিতে হবে।
- টিটি-২ ব্যবহারের ৩ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।
- টিটি-৩ গ্রহণের পর ৫ বছররের পর্যন্ত নিরোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।
- টিটি-৪ গ্রহণের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।
- টিটি-৫ গ্রহণের পর মহিলাদের গর্ভধারণে সক্ষম বয়স পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

মহিলাদের টিটি টিকা দেয়ার কিছু সতর্কবাণী

১. সর্বনিম্ন বিরতির আগে টিকা দিলে তা কার্যকরী হবে না এবং এই ডোজটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. মাত্রার মধ্যে বিরতির কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই।

৩. যত দেরী করেই পরবর্তী নির্ধারিত টিকা নিতে আসুক না কেন তাকে ৫ ডোজ টিটি টিকা সিডিউল মত নির্ধারিত টিকা দিন।

৪. ডোজের অধিক টিকা দেয়ার প্রয়োজন নেই

৫. টিটি টিকার সিডিউল মেনে টিকা দেয়া হলে গর্ভাবস্থায় কোন অতিরিক্ত টিটি টিকা দেয়ার দরকার নেই।

পাঠ-৬
টিকা প্রদানের জন্য অনুসরণীয়

- উদ্দিষ্ট শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের সবগুলো টিকা সময়সূচি অনুযায়ী শেষ করতে হবে।
- ন্যূনতম বিরতির আগে টিকা দিলে তা কার্যকরী হবে না এবং এই ডোজটি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ওপিভি, পেন্টাভ্যালেন্ট, পিসিভি ও টিটি টিকার ডোজের বিরতির কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। অর্থাৎ প্রথম ডোজ দেয়ার ২৮ দিনের পরিবর্তে ২/৩ মাসের পরে আসলেও তাকে দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে। আবার প্রথম থেকে টিকা দেয়া শুরু করা যাবে না। তবে হামের ২য় ডোজ ছাড়া টিকার সকল ডোজ এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।
- কোনো টিকার প্রাপ্য ডোজ নিশ্চিত না হয়ে দেয়া যাবে না।
- শিশু, কিশোরী ও মহিলার টিকার কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন বইয়ে অবশ্যই টিকা প্রাপ্তির তারিখ লিখতে হবে।
- টিকার স্থানে ফোঁড়া হলেও টিকা কার্যকর হবে এবং পরবর্তী টিকার ডোজ সময়সূচি অনুযায়ী দিতে হবে।
- বিসিজি দেয়ার পরবর্তী সময়সূচি অনুযায়ী অন্য টিকা নিতে আসলে শিশুর বাম বাহু পরীক্ষা করে দেখতে হবে কেনো শক্ত দানা/ক্ষত চিহ্ন/দাগ (scar) আছে কি না। শক্ত দানা/ক্ষত চিহ্ন/দাগ (scar) থাকলে বুঝতে হবে বিসিজি টিকা সফলভাবে কাজ করেছে। যদি কোনো শক্ত দানা/ক্ষত চিহ্ন/দাগ (scar) না হয় তাহলে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকার ৩য় ডোজ দেয়ার সময় পুনরায় বিসিজি টিকা দিতে হবে।
- জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে শিশুকে এক ডোজ পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে। তবে এই ডোজ '০'(জিরো) ডোজ হিসেবে গণ্য করতে হবে। ১৪ দিনের পর আর '০' ডোজ দেয়া যাবে না। পরবর্তীতে জন্মের ৬ সপ্তাহ বা ৪২ দিন বয়স থেকে নিয়ম মতো আরো ৩ ডোজ ওপিভি টিকা খাওয়াতে হবে।
- শিশুর ১৪ সপ্তাহ বয়সে ওপিভি ৩য় ডোজ টিকার সাথে ১ ডোজ আইপিভি টিকা দিতে হবে। আইপিভি টিকা ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে মাংসপেশীতে দিতে হবে।

- পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন দেওয়ার পর সাধারণত কোনো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে কদাচিৎ পারটুসিস উপাদানের কারণে খিঁচুনি হতে পারে। যদি খিঁচুনি হয় তবে তাকে পুনরায় পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন দেয়া যাবে না এবং অবশ্যই এইএফআই হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে ২৮ দিন পর ১ ডোজ টিটি টিকা দিতে হবে।
- পিসিভি ভ্যাকসিন ১ম ডোজ শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়সে, ২য় ডোজ ১০ সপ্তাহ বয়সে এবং ৩য় ডোজ ১৮ সপ্তাহ বয়সে দিতে হবে। এই টিকা দেয়ার পর সাধারণত কোনো মারত্মক প্রতিক্রিয়া হয় না।
- নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের সকল ডোজ বাম উরুতে এবং পিসিভি ভ্যাকসিনের সকল ডোজ ডান উরুতে দিতে হবে।
- শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে ১ ডোজ এমআর টিকা এবং ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে ১ডোজ হামের টিকা (২য় ডোজ) দিতে হবে। পূর্বে শরীরে কোনো দানা উঠে থাকলে অথবা অতীতে কোনো সময়ে হাম/রুবেলা হয়ে থাকলেও এই টিকা দিতে হবে। ১৮ মাস বয়সের মধ্যে অবশ্যই হামের টিকা দেয়া শেষ করতে হবে।
- ১৫ বছর বয়সের সকল কিশোরীদের ১ ডোজ এমআর টিকা টিটি টিকার প্রাপ্য ডোজের সাথে বাহুর উপরের বহিরাংশে চামড়ার নিচে দিতে হবে।
- ১৫ বছর বয়সের বেশি কোনো কিশোরী/মহিলাকে কোনোক্রমেই এমআর টিকা দেয়া যাবে না। পরবর্তীতে ঐ কিশোরীকে টিটি টিকার সময়সূচি অনুযী ৫ ডোজ টিটি টিকা শেষ করতে হবে।
- এমআর টিকার উদ্দিষ্ট শিশু টিকাদান কেন্দ্রে আসার পরেই শুধুমাত্র এমআর ভায়াল খুলতে হবে। ১৫ বছরের কিশোরীর জন্য এমআর ভায়াল খোলা যাবে না। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমেই উদ্দিষ্ট শিশুদের এমআর টিকা দিতে হবে এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র অবশিষ্ট এমআর টিকা ১৫ বছর বয়সের কিশোরীদের দিতে হবে।
- ইম্যুনো ডেভিসিয়েন্সি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে), এইডস, ক্যান্সার, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত শিশু ও কিশোরদের, এমআর টিকা দেয়া যাবে না। গর্ভাবস্থায় এমআর টিকা দেয়া যাবে না। গর্ভাবস্থায় এমআর টিকা দিলে গর্ভের শিশুর ক্ষতি হতে পারে। এমআর টিকা দেয়ার কমপক্ষে ১মাসের মধ্যে গর্ভধারণ করা যাবে না।
- বিসিজি, এমআর এবং হামের টিকা শুকনো পাউডার অবস্থায় থাকে। টিকা দেয়ার সময় নির্দিষ্ট টিকার জন্য নির্দিষ্ট ডাইলুয়েন্ট মিশিয়ে তরল করে নিতে হবে। সংমিশ্রণের পর দ্রুত টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হয় বিধায় সংমিশ্রণের পর ৬ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে শিশুর মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হবে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। সংমিশ্রণের পর সাথে সাথে ডায়ালের গায়ে সময় ও তারিখ লিখতে হবে। আংশিক ব্যবহৃত ভায়াল কোনো অবস্থাতেই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে না।

- পিসিভি তরল টিকায় দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উপাদান (Preservative) থাকে না বিধায় এই টিকা সহজে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই ভায়াল খোলার ৬ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তা না হলে শিশুর মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হবে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। ভায়াল খোলার পর অবশ্যই ভায়ালের গায়ে সময় ও তারিখ লিখতে হবে। সেশন শেষ হবার সাথে সাথে বা ভায়াল খোলার ৬ ঘন্টার পর (যেটি আগে আসে) ভ্যাকসিনটি কখনই ব্যবহার করা যাবে না। আংশিক ব্যবহৃত ভায়াল কোনো অবস্থাতেই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে না।
- আইপিভি তরল টিকায় দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উপাদান (Preservative) থাকে না বিধায় এই টিকা সহজে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই ভায়াল খোলার ৬ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তা না হলে শিশুর মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হবে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। ভায়াল খোলার পর অবশ্যই ভায়ালের গায়ে সময় ও তারিখ লিখতে হবে। সেশন শেষ হবার সাথে সাথে বা ভায়াল খোলার ৬ ঘন্টার পর (যেটি আগে আসে) ভ্যাকসিনটি কখনই ব্যবহার করা যাবে না। আংশিক ব্যবহৃত ভায়াল কোনো অবস্থাতেই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে না।
- কোন টিকাদান কেন্দ্রের আংশিক ব্যবহৃত বিসিজি, এমআর, হাম, পিসিভি ও আইপিভি ভায়াল অন্য কোনো টিকাদান কেন্দ্রে ব্যবহার করা যাবে না।
- ফোম প্যাডসহ (সরবরাহ সাপেক্ষে) ঢাকনা লাগানো ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার টেবিলের উপর রাখতে হবে। ঢাকনা এবং ফোম প্যাড খুলে সংখ্যা অনুযায়ী ভ্যাকসিন বের করতে হবে। এরপর বিসিজি, এমআর ও হামের ভায়াল সংমিশ্রণের পর এবং ওপিভি, টিটি, আইপিভি এবং পিসিভি ভায়াল (প্রয়োজন অনুযায়ী) ফোম প্যাডের ছিদ্রের মধ্যে রাখতে হবে। এবার ভ্যাকসিন ভায়ালসহ ফোম প্যাড ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের উপর পূর্বের মতো স্থাপন করে টিকা দিতে হবে। দীর্ঘক্ষণ ধরে শিশু/মহিলা সেশনে উপস্থিত না হলে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা লাগিয়ে রাখতে হবে।
- ফোম প্যাড সরবরাহ না থাকলে বিসিজি, এমআর ও হাম সংমিশ্রণের পর এবং ওপিভি ভায়াল টেবিলের আইসপ্যাকের উপর রাখতে হবে এবং টিটি, পিসিভি ও আইপিভি ভায়াল টেবিলের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন আইসপ্যাকের সংস্পর্শে না আসে।
- সকল টিকা একই সাথে দেয়া যায়। এতে টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে কোনো অসুবিধা হয় না এবং কোনো প্রতিক্রিয়াও হয় না। তবে প্রতিটি টিকা অবশ্যই শরীরের আলাদা আলাদা স্থানে দিতে হবে। প্রয়োজনে একই পায়ে একই সময়ে ১-২ ইঞ্চি (২.৫ সেমি থেকে ৫ সেমি) ব্যবধানে অন্য আরেকটি টিকা দেয়া যেতে পারে।
- যে সকল মেয়ে শিশু ইপিআই টিকাদান কর্মসূচি অনুযায়ী ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট টিকার ৩ ডোজ সম্পন্ন করেছে তাদের ক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা প্রাপ্তির সঠিক তথ্য (টিকার কার্ড বা সঠিক প্রমাণাদি সাপেক্ষে) জেনে টিটি টিকার সময়সূচি অনুযায়ী টিটি

টিকা দিতে হবে। ডিপিটি/পেন্টভ্যালেন্ট টিকার ৩টি ডোজকে টিটি টিকা হিসেবে গণ্য করতে হবে। যেমন: শিশু ও ডোজ ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা সঠিক বয়স এবং বিবতি অনুযায়ী নিয়ে থাকলে ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট এর ৩য় ডোজটি অকার্যকর (৫ ডোজ টিটি টিকার সময়সূচি অনুযায়ী) বিবেচনা করে ১৫ বছর বয়সে ঐ কিশোরী/মহিলাকে টিটি টিকার ৩য় ডোজ দিতে হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী টিটি টিকার ডোজগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

- ইপিআই নিয়ম অনুযায়ী ১৫-৪৯ বৎসরের কিশোরী/মহিলা ছাড়া অন্য কোন কিশোরী/মহিলা, পুরুষ বা শিশুকে টিটি টিকা দেয়া যাবে না। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, যে শিশুর পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেওয়ার পর খিঁচুনি হয়েছে তাকে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা না দিয়ে পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে ১ ডোজ টিটি টিকা দিতে হবে।
- ননটাচ টেকনিক অনুসরণ করে টিকা দেয়া না হলে টিকা দেয়ার ৪-১০ দিন পর টিকার স্থানটি গরম হয়ে ফুলে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে টিকার স্থানটিতে ফোঁড়া হতে পারে।
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে অব্যবহৃত ভায়াল থাকলে ব্যবহৃত আইসপ্যাক, ভায়াল ও ডাইলুয়েন্ট টিকাদান শেষে আলাদা ব্যাগে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

কখন টিকা দেয়া যাবে

প্রায় সকল অবস্থায়ই টিকা দেয়া যায় এবং টিকাদানের যোগ্য সকল মহিলা ও শিশুদের টিকা গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া উচিত। রোগাক্রান্ত হওয়ার চেয়ে টিকা দিয়ে যে সামান্য জটিলতা হতে পারে তার ঝুঁকি অনেক কম। সুতরাং একটি শিশুকে টিকা না দিলে শিশুর এবং জনগণের কি ক্ষতি হতে পারে তা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাদের টিকা দেয়া যাবে না।

অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুকে টিকা দিতে হবে। এই সকল শিশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে। সুতরাং তার ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করার জন্যই টিকা দেয়া বেশী জরুরী। সামান্য জ্বর, শ্বাসনালীর মৃদু প্রদাহ (সর্দি, কাশি), পাতলা পায়খানা অথবা সামান্য দুর্বলতায় টিকাদান বন্ধ করা উচিত নয়। পূর্বে শরীরে কোন দানা উঠে থাকলেও সকল যোগ্য শিশুকে হামের টিকা দিতে হবে। অতীতে হাম বা রুবেলা/এমআরও হয়ে থাকলেও সেই শিশুকে হামের টিকা দিতে হবে।

কখন টিকা দেয়া যাবে না

একমাত্র নিম্নলিখিত কারণগুলোতেই শিশুকে দেয়া যাবে না-

- খুব বেশী জ্বর থাকলে (১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা ৩৮.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর বেশী)।
- শিশু এত অসুস্থ যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।
- এইডস্ আছে এমন শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়া যাবে না।

- পূর্ববর্তী পেন্টাভ্যালেন্ট টিকায় যদি ৩ দিনের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে, অর্থাৎ টিকা দেয়ার পর খিঁচুনী বা অজ্ঞান হলে পরবর্তী পেন্টাভ্যালেটের ডোজ দেয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকার বদলে টিটি টিকা দিতে হবে এবং এর সাথে শিশুকে অন্যান্য সকল টিকা (ওপিভি, এমআর, হাম) নিয়ম অনুযায়ী দিতে হবে। এই ধরনের সকল শিশুকেই তালিকাভূক্ত করতে হবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। বার বার খিচুনী বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এর সক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত শিশুকে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দিবেন না।
- মা যদি বাধা দেন তবে অসুস্থ শিশুকে টিকা দেবেন না। এক্ষেত্রে বরং মাকে সাহস দিন, কিন্তু জোর করবেন না। যদি তা করেন তবে পরবর্তীতে মা শিশুকে নিয়ে টিকাদান কেন্দ্রে নাও আসতে পারেন।

পাঠ-৭
টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ব্যবস্থাপনা

টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ব্যবস্থাপনা

মাঝে মাঝে টিকার সামান্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তা খুব কম ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন টিকার সম্ভাব্য কি কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং সেজন্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা দেখানো হলো-

টিকা	সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	ব্যবস্থাপনা
বিসিজি টিকা	- টিকা দেয়ার ২ সপ্তাহ পরে টিকার স্থান লাল হয়ে যায় - ২-৩ সপ্তাহ পরে শক্ত দানা, ক্ষত বা ঘা হয়	- কোন ওষুধ বা তেল ক্ষতে দেয়া যাবে না। টিকার স্থান খোলা রাখতে হবে।নিজ থেকেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে।

	- ছোট দাগ (Scar)থেকে যায়।	
পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা	- ২-৩ দিন সামান্য জ্বর - টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা এবং ব্যথা হতে পারে	- ১-৩ দিনের মধ্যে ভালে হয়ে যাবে। শিশুকে বার বার মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
পিসিভি টিকা	- ২-৩ দিন সামান্য জ্বর - টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা ও ব্যথা হতে পারে।	- ১-৩ দিনের মধ্যে ভালে হয়ে যাবে। শিশুকে বার বার মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
ওপিভি টিকা	- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নাই	-
আইপিভি টিকা	- ২-৩ দিন সামান্য জ্বর - টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা ও ব্যথা হতে পারে।	- ১-৩ দিনের মধ্যে ভালে হয়ে যাবে। শিশুকে বার বার মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
এমআর টিকা	- টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা ও ব্যথা হতে পারে। - টিকা দেওয়ার পর সামান্য জ্বর, অস্থিরতা ও সামান্য দানা দেখা দিতে পারে। - লিম্ফ গ্রন্থি ফুলে ব্যথা হতে পারে - এ ছাড়াও কিশোরী এবং মহিলাদের অস্থি সন্ধিতে ব্যথা হতে পারে।	- কোনো চিকিৎসা দরকার নেই। ব্যথা এমনিতেই সেরে যাবে। শিশুকে বার বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমান তরল খাদ্য দিতে হবে।
হামের টিকা	- টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা ও ব্যথা হতে পারে। - টিকা দেওয়ার পর সামান্য জ্বর, ও সামান্য দানা দেখা দিতে পারে।	- কোনো চিকিৎসা দরকার নেই। ব্যথা এমনিতেই সেরে যাবে। শিশুকে বার বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমান তরল খাদ্য দিতে হবে।
টিটি টিকা	- টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা ও ব্যথা হতে পারে।	- কোনো চিকিৎসা দরকার নেই। ব্যথা এমনিতেই সেরে যাবে।

নিম্নে বিভিন্ন টিকার সম্ভাব্য কি কি জটিলতা হতে পারে এবং সেজন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা দেখানো হলো ঃ

টিকা	সম্ভাব্য টিকার জটিলতা	ব্যবস্থাপনা
পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা	- পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেওয়ার পর কোন কোন শিশুর খিঁচুনী হতে পারে।	- শিশুর পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেয়ার ফলে যদি খিঁচুনি/ এনাফাইলেক্সিস হলে তাকে পরবর্তীতে পেন্টাভ্যালেন্টের পরিবর্তে ১ ডোজ টিটি টিকা দিতে হবে। এমন শিশুকে আর কখনো

	- এনাফাইলেক্সিস হতে পারে - অনবরত ক্রন্দন (৩ ঘন্টার অধিক সময় ধরে)	পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেওয়া যাবে না তা অভিবাবককে বুঝিয়ে বলতে হবে। - অনবরত ক্রন্দনরত শিশু সাধারনত: ১ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। টিকার পরবর্তী ডোজ দিতে হবে।
এমআর টিকা	- জ্বরের সাথে খিঁচুনী হতে পারে - এনাফাইলেক্সিস হতে পারে।	- চিকিৎসার জন্য শীঘ্র ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন।
সকল টিকার ক্ষেত্রে	- যদি টিকাদান প্রয়োগ কৌশল ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে টিকা দেয়ার ফলে টিকার স্থানে ফোঁড়া হতে পারে অথবা চামড়া লাল ও ফুলে যেতে পারে।	-

পুর্ববর্তী টিকা দেয়ার পর কোনো মারাত্মক পাশ্ব-প্রতিক্রিয়া হলে পরবর্তী টিকা দেয়ার পুর্বে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পাঠ-৮
কোল্ড চেইন

কোল্ড চেইন

- টিকা প্রস্তুতকারী হতে টিকা গ্রহণকারী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে টিকার গুণাগুন রক্ষা করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহন করার ব্যবস্থাকে কোল্ড চেইন বলা হয়।
- বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচীতে যে সকল টিকা ব্যবহার করা হয় তার প্রায় সবই বিদেশে প্রস্তুত হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে তাপ কুপরিবাহী শিপিং কার্টুনে বিমানে করে এই টিকা বাংলাদেশে আনা হয়। এই টিকাগুলি ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়।

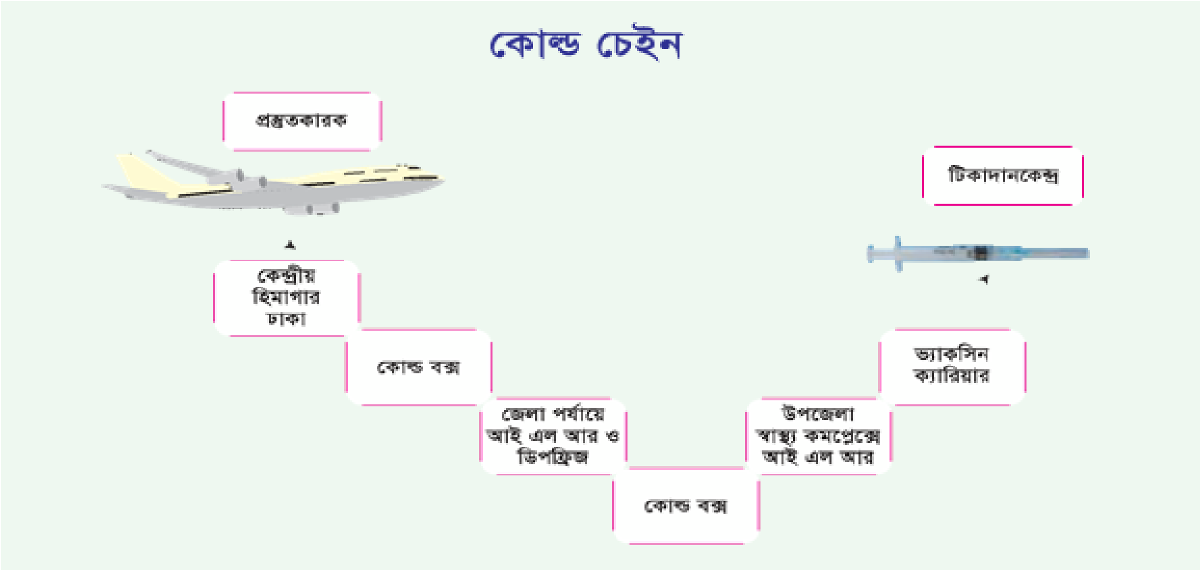

চিত্রঃ কোল্ড চেইন

"কোল্ড বক্সে" করে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার থেকে এই টিকাগুলি জেলায় এবং জেলা থেকে উপজেলায় পাঠানো হয়। টিকাদানের দিনে "ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে" করে এই টিকাগুলি টিকাদান কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

কোল্ড চেইনের গুরুত্ব

- টিকা অবশ্যই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ঠান্ডা অবস্থায় সংরক্ষণ ও পরিবহণ করতে হবে। তা না হলে এর গুণাগুন নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণতঃ +২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে +৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টিকা সংরক্ষণ করা হয়, যা মেনে চলতে হবে।
- যদি আমরা এমন টিকা ব্যবহার করি যার গুণগত মান নষ্ট হয়ে গেছে তবে কি হবে?
  - টিকা দেয়ার পরও রোগ হতে পারে।
  - এ ধরনের টিকা ব্যবহারে ইপিআই এর সুনাম ক্ষুন্ন হবে এবং সম্পদ ও সময়ের অপচয় করা হবে।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।

বিভিন্ন স্তরে ভ্যাকসিন সংরক্ষণের সঠিক তাপমাত্রা

কোন টিকা বেশি তাপ সংবেদনশীল

- ওপিভি — সবেচেয়ে বেশি তাপ সংবেদনশীল
- এমআর, হাম
- পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন
- পিসিভি
- বিসিজি
- টিটি/টিডি — সবেচেয়ে কম তাপ সংবেদনশীল

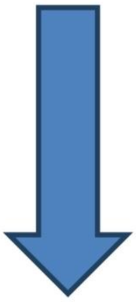

বেশি ঠান্ডা সংবেদনশীল

* পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন — সবেচেয়ে বেশি ঠান্ডা সংবেদনশীল

* পিসিভি

* টিটি/টিডি — কম ঠান্ডা সংবেদনশীল

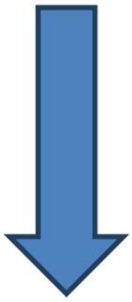

ভ্যাকসিন অবশ্যই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে হবে। তা না হলে এর গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

ইপিআই কার্যক্রমে বিভিন্ন স্তরে ভ্যাকসিন সংরক্ষণের সময় ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিম্নরুপ

স্থান	সংরক্ষণের দীর্ঘতম সময়	তাপমাত্রা	
		ওপিভি	বিসিজি, পেন্টাভ্যালেন্ট, এমআর, হাম, পিসিভি, আইপিভি এবং টিটি
ইপিআই সদর দপ্তর (কেন্দ্রীয়)	৬মাস	-১৫ ডিগ্রী সেঃ থেকে -২৫ ডিগ্রী সেঃ	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ
জেলা	৩ মাস	-১৫ ডিগ্রী সেঃ থেকে -২৫ ডিগ্রী সেঃ	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ
উপজেলা/সিটি করপোরেশন/ জোন/পৌর স্টোর	১ মাস	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ
পরিবহণের সময়	৪ দিন (কোল্ড বক্স) ১ দিন (ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে)	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ	+২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ

- প্রয়োজনে এমআর ও হামের টিকা -১৫ ডিগ্রী সেঃ থেকে -২৫ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে।

- ব্যবহারের কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে এমআর, হাম ও বিসিজি টিকার ডাইলুয়েন্ট +২ ডিগ্রী সেঃ থেকে +৮ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হবে।

কি কি অবস্থায় টিকা কার্যক্ষমতা হারায়

- +৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর বেশি তাপে রাখলে সব ধরনের টিকার কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
- সরাসরি সূর্যের আলোয় রাখলে। বিসিজি ও হামের টিকা সূর্যের আলোয় দ্রুত কার্যক্ষমতা হারায়। তাই এগুলি বাদামী রঙের এ্যাম্পুলে বা ভালেলে রাখা হয়।
- মিশ্রণের পর টিকা জমে গেলে অথবা সেই দিনের মধ্যে ব্যবহার না করে রেখে দিলে।
- পেন্টাভ্যালেন্ট, পিসিভি ও টিটি টিকা ঠান্ডায় জমে গেলে।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে।
- ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর গ্রহণযোগ্য না হলে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও পরিবহন না করলে।
- বিসিজি, এমআর ও হামের টিকা মিশানোর ৬ ঘন্টা পর ব্যবহার করা যাবে না।
- পিসিভি টিকা খোলার ৬ ঘণ্টার পর ব্যবহার করা যাবে না।

কোন টিকা বেশী তাপ সংবেদনশীল

- পোলিও/ওপিভি
- হাম, এমআর
- পেন্টাভ্যালেন্ট
- পিসিভি
- বিসিজি
- টিটি

টিকা কত দিন সংরক্ষণ করা উচিত

- যত কম সময় সম্ভব। উপজেলা পর্যায়ে ১ মাসের বেশী সময় টিকা সংরক্ষণ করবেন না।
- কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার থেকে গ্রহণকারী পর্যন্ত কোন টিকা ১ বৎসরের বেশী রাখা যাবে না।

টিকা অধিক দিন মজুদ না রাখা আপনি কিভাবে নিশ্চিত করবেন

- সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন। সরবরাহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পূর্বে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন।
- টিকা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করুন। যে টিকার মেয়াদ আগে উত্তীর্ণ হবে তা আগে ব্যবহার করুন।

আলো থেকে কিভাবে টিকা রক্ষা করবেন

- টিকা সব সময় ছায়ায় রাখবেন।

পূর্বে কখনো পেন্টাভ্যালেন্ট, পিসিভি বা টিটির ভায়াল জমে গিয়েছিল কিনা কিভাবে বুঝবেন

ঠান্ডায় জমে গিয়ে পেন্টাভ্যালেন্ট, পিসিভি ও টিটি টিকা নষ্ট হলে "শেক টেষ্ট" এর মাধ্যমে তা বোঝা যাবে।

কিভাবে শেক টেষ্ট করতে হয়

- একটি জমে যাওয়া ভ্যাকসিনের ভায়াল ডিপ ফ্রিজে রেখে সম্পূর্ণ জমিয়ে সেটিকে মানদন্ড (কন্ট্রোল) হিসাবে ব্যবহার করুন। তারপর যে ভায়ালটি পরীক্ষা করবেন তা উপরোক্ত কন্ট্রোল ভায়ালের সঙ্গে তুলনা করুন। এক্ষেত্রে অবশ্যই একই প্রস্তুতকারকের ভায়াল ব্যবহার করুন।
- ভায়াল দুইটি ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন- ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড।
- স্বাভাবিক তাপমাত্রায় গলার জন্য ভায়াল দুইটি টেবিলে এমনভাবে রাখুন যাতে পেছনে আলো থাকে।
- দশ মিনিট পর তলানী পড়েছে কি না দেখুন।
- টিকা ভাল করে দেখুন। ভায়ালের তলায় দানা দানা দেখা যাচ্ছে কিনা দেখুন। প্রয়োজনে ১ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
- যে ভায়ালের টিকা পূর্বে জমে গিয়েছিল তার দানা দ্রুত তলায় জমে যায়, উপরে শুধু পরিস্কার পানি থাকে এবং যে ভায়ালের টিকা ঠান্ডায় কখনও জমেনি তাতে অতি ধীরে তলানী পড়ে এবং পুরোটাই ঘোলা থাকে।

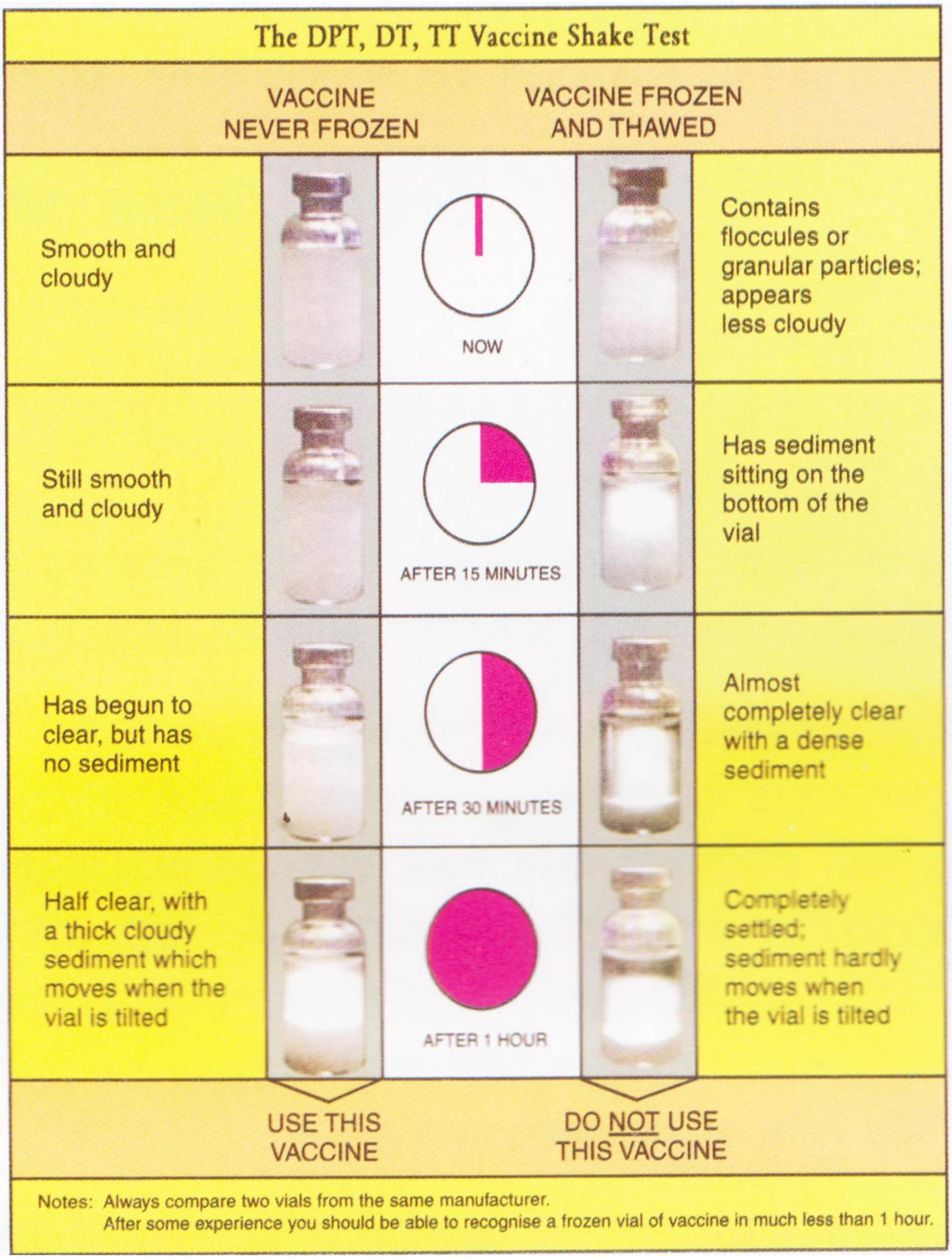
The DPT, DT, TT Vaccine Shake Test
VACCINE NEVER FROZEN
VACCINE FROZEN AND THAWED
Smooth and cloudy
NOW
Contains floccules or granular particles; appears less cloudy
Still smooth and cloudy
AFTER 15 MINUTES
Has sediment sitting on the bottom of the vial
Has begun to clear, but has no sediment
AFTER 30 MINUTES
Almost completely clear with a dense sediment
Half clear, with a thick cloudy sediment which moves when the vial is tilted
AFTER 1 HOUR
Completely settled; sediment hardly moves when the vial is tilted
USE THIS VACCINE
DO NOT USE THIS VACCINE
Notes: Always compare two vials from the same manufacturer.
After some experience you should be able to recognise a frozen vial of vaccine in much less than 1 hour.

পাঠ-৯
টিকা সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও নীতিমালা

টিকা সংরক্ষণের তাপমাত্রা

উপজেলা ষ্টোরে, পরিবহণের সময় এবং টিকাদান কার্যক্রম চলাকালে সকল টিকা +২ ডিগ্রী হতে +৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হয়। একটি থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হয়। আউটরীচ টিকাদান কেন্দ্রগুলিতে যখন ভ্যাকসিন পাঠানো হয় তখন ভ্যাকসিনের সাথে একটি ডায়াল থার্মোমিটার দেয়া হয়। এটা দেখে ভ্যাকসিন পরিবহন এবং টিকাদান সময়ের তাপমাত্রা বলা হয়।

ডায়াল থার্মোমিটার

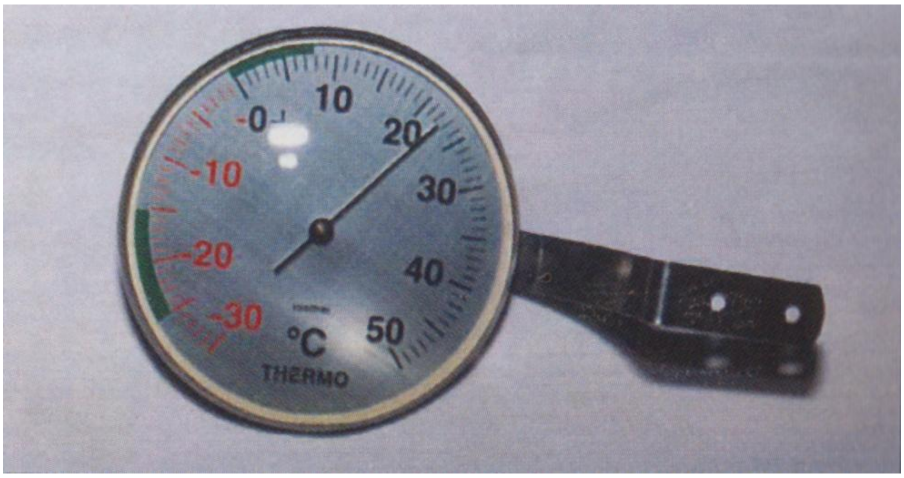

চিত্র ঃ ডায়াল থার্মোমিটার

ডায়াল থার্মোমিটার একটি গোলাকৃতি যন্ত্র বিশেষ যার সাহায্যে ডিপ ফ্রিজ, আইস লাইনিং রেফ্রিজারেটর, কোল্ড বক্স, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, ইত্যাদির ভেতরের তাপমাত্রা মাপা যায়। ডায়াল থার্মোমিটারটির ব্যাস আড়াই ইঞ্চি। এর মধ্যে গোলাকার একটি স্কেল রয়েছে যার অর্ধেকটা লাল এবং বাকী অর্ধেকটা কালো বা নীল। প্রতি ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস অন্তর অন্তর এতে দাগ কাটা আছে। এ ধরনের থার্মোমিটার দিয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা +৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত (নীল রং এর স্কেল) এবং ০ ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত মাপা যায়। স্কেলের মাঝখানে গোলাকার একটি স্প্রিং (দুই রকমের ধাতু দিয়ে তৈরী) আছে যার এক প্রান্তে একটি কাঁটা লাগানো আছে। তাপের তারতম্য অনুসারে স্প্রিং সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে তাপমাত্রা নির্দেশ করে থাকে।

ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর

ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর হচ্ছে এমনই এক ধরনের তাপ-সংবেদনশীল দ্রব্যের তৈরী চিহ্ন, যেটি ক্রমাগতই তাপের কারণে রং পরিবর্তন করতে থাকে। অর্থাৎ যত বেশী তাপ, তত দ্রুত এর রং পরিবর্তন হবে। এবং যত বেশী সময় ধরে তাপে উন্মোচিত থাকবে তত তাড়াতাড়িই রং পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ একটি ভায়াল যত বেশি সময় এবং যত বেশি তাপের সম্মুখীন হবে, মনিটারের রং ততই দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গাঢ় থেকে গাঢ়তর রং ধারণ করবে। বাইরের 'বৃত্তের' রং এর তুলনায় ভায়াল ভেতরের 'বর্গের' রং এর পরিবর্তনটাই হচ্ছে আসল লক্ষণীয় ব্যাপার। বর্তমানে কেবলমাত্র পোলিও শিশির লেবেলের সঙ্গেই "ভায়াল মনিটর" স্থাপন করা থাকে।

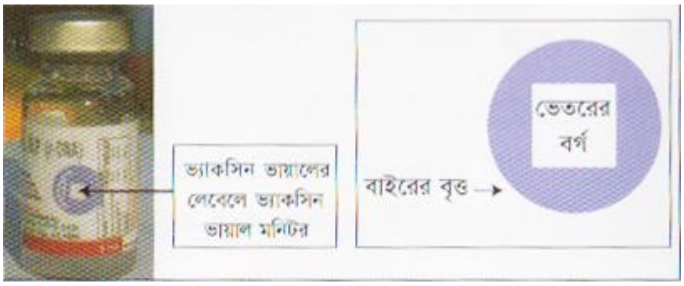

চিত্র ঃ ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর

ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটরের ব্যবহারের সুবিধা ঃ

তাপের কারণে ভ্যাকসিন নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, তা ভায়াল-মনিটরের সাহায্যে সহজেই বলে দেয়া সম্ভব।

ভায়াল মনিটরের ভিতরের বর্গক্ষেত্রের রং পরিবর্তিত হলে কি বুঝতে হবে

ভিতরের "বর্গের" রং যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের "বৃত্তের" রং এর চেয়ে সামান্য হালকা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যাকসিনটি ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যাকসিন ভাল আছে অর্থাৎ তাপের কারণে ভ্যাকসিন নষ্ট হয়নি। এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে। ভিতরের "বর্গের" রংটি বাইরের "বৃত্তের" রং এর চেয়েও গাঢ় হয়ে গেলে ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কবাণী

ভ্যাকসিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, মনিটরের রং গ্রহণযোগ্য হলেও, ভ্যাকসিন ব্যবহারযোগ্য নয়, কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন ভ্যাকসিন কখনই ব্যবহারযোগ্য নয়।

ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার প্যাকিং

- আপনার টিকাদান কেন্দ্রের জন্য একটি ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার বরাদ্দ থাকবে।
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার পরীক্ষা করুন।
- লক্ষ্য করে দেখুন এটা দুমড়ানো বা ভাংগা কি না।

চিত্র ঃ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার

- নিশ্চিত হোন ক্যারিয়ারের হাতল ঢিলা নয়।
- নিশ্চিত হোন যে ক্যারিয়ার পরিস্কার এবং শুকনো।
- ভাংগা ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ভ্যাকসিন ঠান্ডা থাকবে না। সেজন্যে তা মেরামত বা পরিবর্তন করুন।
- সম্পূর্ণভাবে বরফ জমানো চারটি ছোট আইস প্যাক ক্যারিয়ারের খাজকাটা ঘরে থাকবে।
- হাম, ওপিভি এবং বিসিজি টিকা ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের নিচে রাখতে হবে।

ওপিভি, বিসিজি, পিসিভি, হাম, এমআর, টিটি ও পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, হাম, এমআর ও বিসিজি ভ্যাকসিনের ডাইলুয়েন্ট এবং ওপিভির ড্রপার ও কাটার জিপলক ব্যাগ বা মোটা কাগজে মুড়ে ভ্যাকসিনের উপরে রাখুন। খেয়াল রাখবেন পিসিভি, টিটি এবং পেন্টাভ্যালেন্ট যেন আইস প্যাকের গায়ে লেগে ঠান্ডায় জমে না যায় তাহলে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। পোলিও ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য যথেষ্ট ড্রপার, ডাইলুয়েন্টের এম্পুল কাটার জন্য "ফাইল" রাখুন। ক্যারিয়ারের ভিতর একটি ডায়াল থার্মোমিটার এমন ভাবে রাখুন যাতে আইসপ্যাক স্পর্শ না করে- এখন ভালো করে ঢাকনা বন্ধ করে দিন।

টিকা সংরক্ষণের নীতিমালা

১। উপজেলায় একসঙ্গে ১ মাসের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশী টিকা সংরক্ষণ করা সমীচীন নয়।

২। যে টিকার এক্সপেয়ার ডেট আগে অতিক্রান্ত হবে, সে টিকা আগে ব্যবহার করতে হবে।

৩। রেফ্রিজারেটরে টিকা নিচে বর্ণিত পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখতে হবে-

- এভাপোরেটরের গা ঘেঁষে পোলিও এবং হামের টিকা রাখতে হবে।
- তারপর বিসিজি টিকা রাখতে হবে।
- পেন্টাভ্যালেন্ট, টিটি টিকা যাতে এভাপোরেটরের সংস্পর্শে না আসে, খেয়াল রাখতে হবে।
- স্মরণ রাখা দরকার যে সব টিকাই তাপে নষ্ট হয়: কোনটা খুব তাড়াতাড়ি, কোনটা ধীরে ধীরে।
- পোলিও অল্প তাপেই নষ্ট হয়, টিটি অপেক্ষাকৃত বেশী তাপে নষ্ট হয়।
- পেন্টাভ্যালেন্ট এবং টিটি ঠান্ডায় জমে গেলে নষ্ট হয়ে যায়।
- রেফ্রিজারেটরের সবচেয়ে ঠান্ড অংশ হল এভাপোরেটর, তাই পেন্টাভ্যালেন্ট এবং টিটি এভাপোরেটরের সংস্পর্শে রাখা উচিত নয়।
- টিকা কখনো প্যাকেটহীন রাখা উচিত নয়।

এডি (অটো ডিজেবল) সিরিঞ্জ কি?

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ নিরাপদ ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে অটো ডিজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করেছে।
- এডি সিরিঞ্জে শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়। একবার ব্যবহারের পর সিরিঞ্জটি আপনা আপনি অকেজো হয়ে যায়।
- এডি সিরিঞ্জ শুধুমাত্র একবার পিছনের দিকে টানা ও একবার সামনের দিকে ঠেলা যায়। ব্যবহারের পর এটি স্থানীয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্লাঞ্জারটিকে দ্বিতীয়বার পিছনের দিকে টানার আর কোনো সুযোগ থাকে না।
- অটো ডিজেবল সিরিঞ্জ গুলি পূর্ব হতেই জীবাণুমুক্ত করা থাকে। তাই জীবাণুমুক্তকরণের প্রয়োজন হয় না।

ইপিআই এ ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জ

- ০.০৫ এম এল সিরিঞ্জ বিসিজি টিকার জন্য
- ০.৫ এম এল সিরিঞ্জ ইপিআই এর অন্যান্য টিকার জন্য
- ৫ এম এল মিক্সিং সিরিঞ্জ এম আর ও হামের টিকা সংমিশ্রনের জন্য

* ২/৩ এমএল মিক্সিং সিরিঞ্জ সংমিশ্রনের জন্য।

চিত্র ঃ এডি (অটো ডিজেবল) সিরিঞ্জ

এডি সিরিঞ্জ ব্যবহারের নিয়মাবলী

১. ব্যবহারের পূর্বে সিরিঞ্জটি জীবাণুমুক্ত আছে কি না তা নিশ্চিত হতে সিরিঞ্জের সিল/ সিরিঞ্জের প্যাকেটটি পরীক্ষা করে সীল ঠিক আছে কি না দেখে নিন।

২. সূচের ঢাকনাটি খুলুন এবং ঢাকনাটি সেফটি বাক্সে ফেলুন। মনে রাখবেন ভায়াল থেকে ভ্যাকসিন সিরিঞ্জে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই প্লাঞ্জারটিকে পিছনের দিকে টানা যাবে না।

৩. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য ভ্যাকসিন উপুড় করে খাড়াভাবে ধরুন এবং সিরিঞ্জের সুচটি ভায়অলের মধ্যে ঢোকান, খেয়াল রাখবেন ভ্যাকসিন নেয়ার ক্ষেত্রে সূচের অগ্রভাগ যেন সব সময়ই ভ্যাকসিনের মধ্যে ডুবে থাকে।

৪. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য প্লাঞ্জারটি ধীরে ধীরে পিছনের দিকে নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত টানতে থাকুন। এরপর প্লাঞ্জারটি আর পিছনের দিকে টানা যাবে না।

৫. সাবধানে প্লাঞ্জারটি সামনের দিকে ঠেলে বাতাস (যদি থাকে) বের করুন যাতে করে ভ্যাকসিন অবশ্যই সঠিক দাগ পর্যন্ত থাকে।

৬. ইনজেকশন দেয়অর পর প্লাঞ্জারটি লক হয়ে যাবে এবং সিরিঞ্জটি আর ব্যবহার করা যাবে না।

৭. সবশেষে ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জটি সেফটি বাক্সে ফেলতে হবে।

বর্তমানে ইপিআই এ ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জ ব্যবহারের নিয়মাবলী

০.৫ এম এল এডি সিরিঞ্জ

১. ব্যবহারের পূর্বে সিরিঞ্জটি জীবাণুমুক্ত আছে কি না তা নিশ্চিত হতে সিরিঞ্জের প্যাকেটটি পরীক্ষা করে সীল ঠিক আছে কি না দেখে নিন।

২. প্রথমে এটি সিরিঞ্জের প্যাকেটটি খুলুন তারপর সূঁচের ঢাকনাটি খুলুন এবং ঢাকনাটি সেফটি বক্সে ফেলুন। মনে রাখবেন ভায়াল থেকে ভ্যাকসিন সিরিঞ্জে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই প্লাঞ্জারটিকে পিছনের দিকে টানা যাবে না।

৩. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য ভ্যাকসিন ভায়ালটি উপুড় করে খাড়াভাবে ধরুন এবং সিরিঞ্জের সূচটি ভায়ালের মধ্যে ঢোকান, খেয়াল রাখবেন ভ্যাকসিন নেয়ার ক্ষেত্রে সূচের অগ্রভাগ যেন সব সময়ই ভ্যাকসিনের মধ্যে ডুবে থাকে।

৪. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য প্লাঞ্জারটি ধীরে ধীরে পিছনের দিকে টানতে থাকুন যতক্ষন পর্যন্ত প্লাঞ্জারটি আর পিছনের দিকে টানা না যায়।

৫. সাবধানে প্লাঞ্জারটি সামনের দিকে ঠেলে বাতাস বের করুন। বাতাস ভ্যাকসিন ভায়ালের মধ্যেই বের করতে হবে।

৬. বাতাস বের করার পরে দেখুন ভ্যাকসিনের পরিমান সিরিঞ্জের নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত আছে কি না। যদি না থাকে তবে প্লাঞ্জারটি পুনরায় পিছনের দিকে টেনে নির্দিষ্ট পরিমান ভ্যাকসিন তুলুন।

৭. তারপর সিরিঞ্জটির সূচ ভ্যাকসিনের ভায়াল থেকে বের করুন। সূচ বের করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে সিরিঞ্জে কোন বাতাস নেই এবং ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে।

৮. নির্দিষ্ট স্থানে ইনজেকশন দিন। ইনজেকশন দেয়ার পর প্লাঞ্জারটি লক হয়ে যাবে এবং সিরিঞ্জ আর ব্যবহার করা যাবে না।

৯. সবশেষে ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জটি সেফটি বক্সে ফেলুন।

০.০৫ এম এল (বিসিজি) এডি সিরিঞ্জ

১. ব্যবহারের পূর্বে সিরিঞ্জটি জীবাণুমুক্ত আছে কি না তা নিশ্চিত হতে সিরিঞ্জের প্যাকেটটি পরীক্ষা করে সীল ঠিক আছে কি না দেখে নিন।

২. প্রথমে এডি সিরিঞ্জের প্যাকেটটি খুলুন তারপর সূচের ঢাকনাটি খুলুন এবং ঢাকনাটি সেফটি বক্সে ফেলুন। মনে রাখবেন ভায়াল থেকে ভ্যাকসিন সিরিঞ্জে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই প্লাঞ্জারটিকে পিছনের দিকে টানা যাবে না।

৩. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য বিসিজি ভ্যাকসিনের এম্পুলটি কাত করে ধরুন এবং সিরিঞ্জের সূচটি এ্যাম্পুলের মধ্যে ঢোকান, খেয়াল রাখবেন ভ্যাকসিন নেয়ার ক্ষেত্রে সূচের অগ্রভাগ যেন সব সময়ই ভ্যাকসিনের মধ্যে ডুবে থাকে।

৪. সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য প্লাঞ্জারটি ধীরে ধীরে পিছনের দিকে নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত টানুন।

৫. যদি সিরিঞ্জে বাতাস ঢুকে যায় তবে সাবধানে প্লাঞ্জারটি সামনের দিকে ঠেলে বাতাস বের করুন।

৬. বাতাস বের করার পরে দেখুন ভ্যাকসিনের পরিমাণ সিরিঞ্জের নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত আছে কি না । যদি না থাকে তবে পুনরায় প্লাঞ্জারটি পিছনের দিকে টেনে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাকসিন তুলুন।

৭. নির্দিষ্ট স্থানে ইনজেকশন দিন। ইনজেকশন দেয়ার পর প্লাঞ্জারটি লক হয়ে যাবে এবং সিরিঞ্জটি আর ব্যবহার করা যাবে না।

৮. সবশেষে ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জটি সেফটি বক্সে ফেলুন।

৫ এম এল এবং ২/৩ এম এল মিক্সিং এডি সিরিঞ্জ

১. ব্যবহারের পূর্বে সিরিঞ্জটি জীবাণুমুক্ত আছে কি না তা নিশ্চিত হতে সিরিঞ্জের প্যাকেটটি পরীক্ষা করে সীল ঠিক আছে কি না দেখে নিন।

২. প্রথমে এটি সিরিঞ্জের প্যাকেটটি খুলুন তারপর সূঁচের ঢাকনাটি খুলুন এবং ঢাকনাটি সেফটি বক্সে ফেলুন। মনে রাখবেন ভায়াল থেকে ভ্যাকসিন সিরিঞ্জে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই প্লাঞ্জারটিকে পিছনের দিকে টানা যাবে না।

৩. তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এম্পুল ধরতে হবে। এম্পুলের মাথায় মৃদু টোকা দিতে হবে, এতে উপরের ডাইলুয়েন্ট নীচে নেমে আসবে।

৪. এবার মিক্সিং সিরিঞ্জে ডাইলুয়েন্ট নেয়ার জন্য বিসিজি ডাইলুয়েন্টের ভায়ালটি খাড়াভাবে উপুড় করুন।

৫. সিরিঞ্জের সূচটি ভায়ালের মধ্যে ঢোকান। ডাইলুয়েন্টে নেয়ার সময় সূচের অগ্রভাগ যেন ডাইলয়েন্টের মধ্যে ডুবে থাকে এবং ভায়াল একটু কাত করে সবটুকু ডাইলুয়েন্ট সিরিঞ্জে ঠেলে নিতে হবে।

৬. ভায়ালের ভিতর সূচ সোজাসুজি ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার মিক্সিং সিরিঞ্জটি খাড়া করে ধরতে হবে।

৭. ডাইলুয়েন্টের সূচ যাতে অন্য কিছুতে না লাগে তা দেখতে হবে। এতে টিকা জীবাণুযুক্ত হতে পারে।

৮. বিসিজি/এমআর/হামের ভায়ালের ছিপির মধ্য দিয়ে সংমিশ্রণ সূচ ঢুকিয়ে সবটুকু ডাইলুয়েন্ট দিতে হবে। এবার টিকার ভায়ালের গলা ধরে কয়েকবার মৃদু ঝাঁকুনী দিয়ে টেবিলে আইস প্যাকের গর্তে রাখতে হবে।

৯. ব্যবহৃত মিক্সিং সিরিঞ্জটি সেফটি বক্সে ফেলতে হবে।

১০. প্রতিবার মিশানোর সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের জন্য নির্দিষ্ট মিক্সিং সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

১১. সংমিশ্রনের জন্য ভায়াল ২ হাতের তালু দিয়ে ধরে ঘষা যাবে না, তাতে হাতের তাপে টিকা নষ্ট হতে পারে।

পাঠ-১০
টিকা সংমিশ্রণ ৪৫

টিকা সংমিশ্রণ

ইপিআই কর্মসূচীতে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনগুলির মধ্যে বিসিজি, এমআর এবং হামের টিকা হিম শুষ্ক বা ফ্রিজ ড্রাইং প্রক্রিয়ায় পাউডার আকারে তৈরী করা হয়। এতে সংরক্ষণ কাল বেশী হয়ে থাকে। ব্যবহার করার জন্য এই টিকা অবশ্যই তরল করতে হবে। বিসিজি, এমআর এবং হামের টিকা একবার তরল করে নেবার পর তা ৬ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। নতুবা এর গুণাগুন নষ্ট হয়ে যাবে এবং মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। ব্যবহারের জন্য টিকা পাউডারের সাথে ডাইলুয়েন্ট মেশানো হয় এবং একেই টিকা সংমিশ্রণ বলে।

চিত্র ঃ টিকা সংমিশ্রণ

টিকা সংমিশ্রণ করার সময় কি কি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি মনে রাখতে হবে

- প্রয়োজন না হলে অর্থাৎ শিশু না আসলে টিকা সংমিশ্রণ করবেন না।
- মাত্র একটি শিশুকেও যদি টিকা দিতে হয় তবুও টিকা সংমিশ্রণ করতে হবে, কারণ এক্ষেত্রে অপচয় গ্রহণযোগ্য।
- সংমিশ্রিত টিকা ৬ ঘন্টার বেশী রাখবেন না। টিকাদান অধিবেশন চলাকালে টেবিলের উপর রাখা জমানো আইস প্যাকেটের উপর টিকা রাখুন। সকল সংমিশ্রিত টিকা অবশ্যই একই টিকাদান অধিবেশনের জন্য ব্যবহার করবেন।
- ডাইলুয়েন্ট এবং টিকার লেবেল পরীক্ষা করুন। ডাইলুয়েন্ট অবশ্যই ঠান্ডা থাকতে হবে (+২ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে +৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা)।
- প্রতিবার মেশানোর সময় নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের জন্য নির্দিষ্ট মিক্সিং সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- ১টি নির্দিষ্ট মিক্সিং সিরিঞ্জ দিয়ে একটি মাত্র ভ্যাকসিন ভায়াল সংমিশ্রন করতে হবে।
- ইনজেকশন দেয়ার প্রস্তুতি না নিয়ে টিকা মেশাবেন না।
- অব্যবহৃত সংমিশ্রিত টিকা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফেরত আসার পর নষ্ট করে ফেলতে হবে।

এমআর ও হামের টিকা সংমিশ্রণের নিয়ম

ডাইলুয়েন্টের এ্যাম্পুল খোলা

- তর্জুনী এবং বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এ্যাম্পুল ধরুন
- এ্যাম্পুলের মাথার দিক তর্জনীর সাথে চেপে ধরুন এবং ফাইল এ্যাম্পুল কাটার দিয়ে এ্যাম্পুলের গলায় জোরে আঁচড় দিন।
- তুলা দিয়ে কাঁচের গুড়া পরিস্কার করে নিন।

- এ্যাম্পুলের মাথায় মৃদু টোকা দিন, তাতে উপরে ডাইলুয়েন্ট নিচে নেমে আসবে।
- পরিষ্কার তুলা দিয়ে এ্যাম্পুলের উপরিভাগ মুড়িয়ে নিন এবং আস্তে দাগ কাটা স্থানে চাপ দিয়ে তা ভেঙ্গে নিন।

টিকার ভায়াল খুলুন

- এ্যাম্পুল কাটার দিয়ে ছিপির মাঝখানটা উঁচু করে পেছনের দিকে টেনে বাঁকা করুন। আপনার আঙ্গুলের নখ ব্যবহার করবেন না।
- বাঁকা অংশের প্রান্ত ধরে গোল চাকতিটা পুরো ছিঁড়ে ফেলুন।

এ্যাম্পুলের ভিতর থেকে সকল ডাইলুয়েন্ট সংমিশ্রণ সিরিঞ্জে তুলে নিন

- এ্যাম্পুলের ভিতরে সূঁচ সোজাসুজি ঢুকিয়ে দিন।
- ডাইলুয়েন্ট বের করার আগে এ্যাম্পুলটি একটু কাত করুন যাতে সবটুকু ডাইলুয়েন্ট সিরিঞ্জে টেনে নেয়া যায়।
- এবার সিরিঞ্জটি খাড়া করে ধরুন এবং ৫ এম এল ডাইলুয়েন্ট রেখে বাকীটুকু ফেলে দিন।
- ডাইলুয়েন্ট ভর্তি সিরিঞ্জটি র‌্যাকের ঢাকনার উপর রাখুন।

ভায়ালের ছিপির মধ্যে দিয়ে সংমিশ্রণ সূঁচ ঢোকান এবং সবটুকু ডাইলুয়েন্ট ভায়ালে নিন

- ডাইলুয়েন্ট সূচ যাতে অন্য কিছুতে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কারণ তাতে টিকা জীবাণুমুক্ত হতে পারে।
- এবার টিকার ভায়ালের গলা ধরে মৃদু ঝাঁকুনী দিয়ে পাউডার, ভাইলয়েন্টের সাথে মিশে যাবে। তারপর ভায়ালটি আইসপ্যাকের গর্তে রাখতে হবে।

বিসিজি টিকা সংমিশ্রণের নিয়ম

- বিসিজি টিকা সংমিশ্রণের নিয়মগুলি ঠিক এমআর বা হামের টিকা সংমিশ্রণের মতই।
- পাউডার আকারের টিকার ভায়াল অথবা এ্যাম্পুল খোলার আগে তার গায়ে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু টোকা দিন যাতে সব পাউডার তলায় গিয়ে পড়ে। ডাইলুয়েন্ট এর এ্যাম্পুল পূর্ববর্তী নির্দেশ মত খুলুন।
- জীবাণু মুক্ত একটি ৫.০ এম এল সিরিঞ্জ দিয়ে সবটুকু ডাইলুয়েন্ট সিরিঞ্জে টেনে সংমিশ্রণের জন্য ব্যবহার করুন। সংমিশ্রণের পর বিসিজি টিকার এ্যাম্পুল ভায়াল আইসপ্যাকের উপর রাখতে হবে।

পাঠ-১১
টিকা (ইনজেকশন) প্রয়োগ

টিকা প্রয়োগের নিয়ম

- টিকার সঠিক ডোজ
- সঠিক প্রয়োগ পথ (রুট)
- সঠিক এডি সিরিঞ্জ
- সঠিক স্থান
- নন টাচ টেকনিক

প্রয়োগ পথ (রুট)

ইনজেকশন দেয়ার ক্ষেত্রে ৩টি প্রয়োগ পথ (রুট) ব্যবহার করা হয়।

১. পেন্টাভ্যালেন্ট, পিসিভি, আইপিভি এবং টিটি মাংসের ভিতর (ইন্ট্রামাস্কুলার) দেয়া হয়।

২. এমআর ও হাম চামড়ার নিচে (সাবকিউটেনাস) দেয়া হয়।

৩. বিসিজি চামড়ার ভিতর (ইন্ট্রাডারমাল) দেয়া হয়।

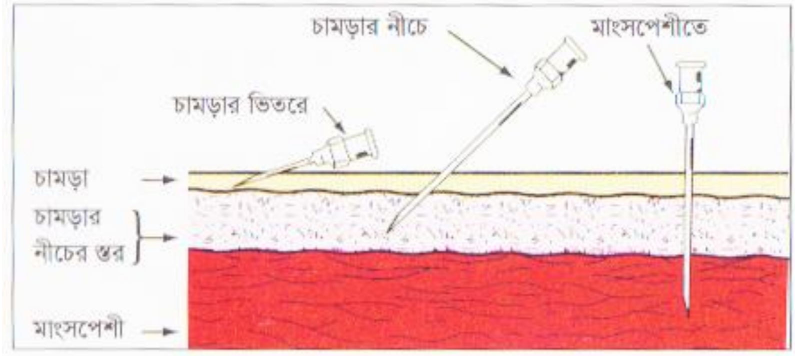

চিত্র ঃ ইনজেকশন এর প্রয়োগ পথ (রুট)

বিভিন্ন প্রয়োগ পথে ইনজেকশন দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

মাংসের মধ্যে- সূঁচ খাড়া ভাবে, চামড়ার সাথে ৯০ ডিগ্রী কোণে ধরা হয় এবং মাংসের ভেতর ঢোকান হয়।

চামড়ার নিচে- সূঁচ চামড়ার সাথে প্রা ৪৫ ডিগ্রী কোণে ধরা হয় এবং চামড়ার ঠিক নিচে ঢোকান হয়।

চামড়ার ভিতর- সূঁচ চামড়ার সাথে সমান্তরালভাবে ঢোকান হয়।

সঠিক প্রয়োগ পথ ও পদ্ধতিতে ইনজেকশন দেয়ার প্রয়োজনীয়তা

১। সঠিক প্রয়োগপথে টিকা না দিলে টিকাদানের পর জটিলতা দেখা দিতে পারে।

২। বিসিজি টিকার ক্ষেত্রে চামড়ার মধ্যে টিকা না দিয়ে চামড়ার নীচে বা মাংসপেশীতে দিলে টিকার স্থানে ঘা নাও হতে পারে অথবা ঘা বড় হতে পারে।

৩। উরুর মাংসপেশীতে টিকা দেয়ার সময় সূঁচ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ না করলে হাড়ে আঘাত লাগতে পারে।

৪। টিকাদানের সময় সূঁচ স্পর্শ করলে পরবর্তীতে টিকার স্থানে ফোঁড়া হতে পারে।

ইনজেকশন দেয়ার সাধারণ নিয়ম

ক) শিশুকে সঠিকভাবে বসানোর নিয়ম ঃ

ইনজেকশন দেয়ার সময় শিশু নড়াচড়া করতে পারে এবং এর ফলে আঘাত পেতে পারে। শিশুর নড়াচড়া দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্য মা তার শিশুকে এমনভাবে ধরবেন যাতে করে ইনজেকশন দেয়ার জন্য টিকাদানকারীর উভয় হাত মুক্ত থাকে। কিভাবে শিশুকে শক্ত করে ধরে রাখবেন তা মাকে বুঝিয়ে বলুন।

- নিশ্চিত হোন যে মা'র বসার জন্য একটি চেয়ার বা টুল রয়েছে।
- শিশুর বাহু বা উরু, যেখানে ইনজেকশন দেয়া হবে, মা'কে সেখান থেকে কাপড় সরিয়ে দিতে বলুন।
- শিশুকে মায়ের কোলে পাশাপাশি বসাতে হবে।

- এমনভাবে বসাতে হবে যেন যে উরুতে বা বাহুতে টিকা দেয়া হবে তা বাহিরে থাকে। মায়ের এক বাহু দিয়ে শিশুকে বেষ্টন করতে হবে। শিশুর ভেতরের বাহুর সাথে ঠেসে ধরা থাকবে মায়ের অন্য বাহু ও হাত শিশুর শরীর/উরু ধরবে।

খ) ভায়াল থেকে টিকা বের করার নিয়ম ঃ

১. হাত ধুয়ে নিন।

২. জীবাণু মুক্ত সঠিক সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করে আপনি যে পরিমাণ টিকা ব্যবহার করবেন সেই পরিমাণ বাতাস সিরিঞ্জে টেনে নিন।

৩. বাম হাতে ভায়াল এবং ডান হাতে সিরিঞ্জ ধরুন। রাবারের ছিপির ভেতরে সূঁচ ঢোকান।

৪. ভায়ালে বাতাস ঢুকিয়ে দিন।

৫. ধীরে ধীরে প্লাঞ্জার টেনে সিরিঞ্জে টিকা ঢোকান। টিকা প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে একটু বেশী নিতে হয় এবং এর জন্য প্লাঞ্জার ততক্ষণ টানতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পিষ্টনের মাথা সিরিঞ্জের গায়ে স্কেলের যে দাগটি সঠিক পরিমাণ নির্দেশ করতে তা সামান্য অতিক্রম করছে।

৬. ভায়াল থেকে সূঁচ বের করুন। সিরিঞ্জকে এমনভাবে ধরুন যাতে সূঁচ উপরের দিকে থাকে। সিরিঞ্জের ভেতর যদি বাতাসের বুদবুদ থেকে যায় তাহলে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু টোকা দিতে থাকুন যতক্ষণ পযৃন্ত না বুদবুদ উপরে উঠে এডাপটার পর্যন্ত পৌঁছে।

৭. ধীরে ধীরে পিষ্টনে চাপ দিয়ে বাতাস বের করে ফেলুন এবং লক্ষ্য রাখুন টিকার পরিমাণ ঠিক আছে কি না অর্থাৎ পিষ্টনের মাথা স্কেলের সঠিক জায়গায় আছে কি না। ভ্যাকসিনপূর্ণ সিরিঞ্জ র‍্যাকের ঢাকনার উপর রাখুন, নিশ্চিত হোন সূঁচ যেন কোন কিছুতে না লাগে।

গ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে চামড়া মুছে নিন

ছোট এক টুকরা তুলা পাত্রে রাখা বিশুদ্ধ পানিতে ভিজিয়ে ইনজেকশন দেয়ার জায়গা মুছে নিন। একবার জায়গাটি পরিস্কার করার পর তুলার অপর দিকে দিয়ে ২য় বার পরিস্কার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই স্পিরিট, ডেটল বা স্যাভলন জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহৃত তুলা যথাস্থানে ফেলুন। ইনজেকশনের স্থান বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর সাহায্যে ধরুন। (অথবা ডান হাতে যদি আপনি বাম হাতি হোন)

ঘ) ইনজেকশন দিন

- সঠিক প্রয়োগ পথ ও পদ্ধতি ব্যবহার করুন
- স্পর্শ না করে ইনজেকশন দেবার পথ অনুসরণ করুন। এই প্রক্রিয়ায় ইনজেকশন দেবার জন্য জীবাণু মুক্তকরণের পথ থেকে ইনজেকশন দেয়া পর্যন্ত সূঁচ-হাত অথবা কোন বস্তুর সাথে স্পর্শ করবে না তা নিশ্চিত করা হয়।
- ডান হাত দিয়ে সিরিঞ্জ ধরুন, দ্রুত সূঁচ ইনজেকশনের স্থানে ঢোকান। হাত নরম রাখুন।

- কখনও সূঁচ পুরাপুরি ঢোকাবেন না। সব সময় সূঁচ এর কিছুটা বাহিরে রাখুন যাতে দুর্ঘটনা ক্রমে সূঁচ ভেঙ্গে গেলে সহজে বের করে আনা হয়।
- সূঁচ প্রবেশ করার পর প্লাঞ্জার পেছনের দিকে একটু টেনে নিন; দেখুন সিরিঞ্জে রক্ত ঢুকছে কি না। যদি রক্ত আসে। তবে সূঁচ শিরায় প্রবেশ করেছে। সূঁচ শিরায় ঢুকে থাকলে সূঁচটি বের করে এনে নুতনভাবে ইনজেকশন দিতে হবে এবং শিরায় যাচ্ছে কিনা তা পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- যদি সিরিঞ্জে রক্ত না ঢুকে, তবে ধীরে ধীরে আঙ্গুল দিয়ে পিষ্টনে চাপ দিয়ে টিকা ঢুকান। ডোজ সম্পূর্ণ ঢুকে গেলে সূঁচ বের করে নিন।
- সূঁচ বের করার পর রক্তের ফোঁটা বের হলে তা আস্তে পরিস্কার তুলা দিয়ে মুছে দিন। অবশ্য বিসিজি ইনজেকশনের পর ঐ স্থান স্পর্শ করা যাবে না।
- পেন্টাভ্যালেন্ট ও হামের ইনজেকশন একই সময় দেয়া যায় তবে ভিন্ন স্থানে দিতে হয় অর্থাৎ ভিন্ন উরুতে।

ধারালো বর্জ্য অপসারণ

সেশনে ব্যবহৃত এডি সিরিঞ্জ ও মিক্সিং সিরিঞ্জ নিরাপদে সংরক্ষণ ও অপসারণ করার জন্য সেপটি বক্স ব্যবহার করা হয়।

সেফটি বক্স কী?

সেফটি বক্স কার্ডবোর্ডের তৈরী একটি ছিদ্র প্রতিরোধযোগ্য বক্স। সেপটি বক্স তৈরী করা অবস্থায় থাকে না । ব্যবহারের পূর্বে সেপটি বক্স নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরী করে নিতে হয়।

সেফটি বক্স কী ব্যবহারের নিয়মাবলী

১. প্রতিটি টিকাদান সেশনে সেফটি বক্সের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
২. প্রতিটি ইনজেকশন প্রদান করার সাথে সাথে ব্যবহিত সিরিঞ্জসেফটি বক্সে রাখতে হবে।

৩. প্রতিটি টিকাদান সেশনে ব্যবহিত সিরিঞ্জ-এর সংখ্যা সেফটি বক্সের উপরের অংশে তারিখসহ লিখে রাখতে হবে।

৪. মাঠকর্মী টিকা সেশনের পর আংশিক পূর্ণ সেফটি বক্স তার নিজ দায়িত্বে নিরাপদ স্থানে রাখবেন। সেশন শেষ হবার পর সেফটি বক্সের মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

৫. সেফটি বক্সের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত ভরে গেলে সেফটি বক্সের মুখ বন্ধ করে অত্যান্ত সাবধানতার সাথে তা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং নতুন আরেকটি সেফটি বক্স নিতে হবে।

৬. সেফটি বক্স অপসারণের পূর্বে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।

৭. শুধু মাত্র ব্যবহিত সিরিঞ্জ ও সিরিঞ্জ-এর আনুসাঙ্গিক অংশ রাখার জন্য সেফটি বক্স ব্যবহার করতে হবে।

৮. ব্যবহিত সিরিঞ্জ এক সেফটি বক্স হতে আরেক সেফটি বক্সে স্থানান্তর করা যাবেনা।

৯. পূর্ণ বা আংশিক পূর্ণ সেফটি বক্স খালি করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

পাঠ-১২
এএফপি ও ইপিআই রোগ নিরীক্ষণ

এএফপি ও ইপিআই রোগ নিরীক্ষণ

- ১৯৭৯ সাল থেকে আমাদের দেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) আওতায় শিশুদের পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য রোগ প্রতিরোধক টিকা দেয়া হচ্ছে, যা প্রকৃত পক্ষে ১৯৮৫-১৯৯০ সালে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে হেপাটাইটিস-বি, হোমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া, রুবেলা রোগের টিকাও দেয়া হচ্ছে।
- বর্তমানে ইপিআই এর লক্ষ্য হচ্ছে-
  - পোলিও রোগের নির্মূল অবস্থা বজায় রাখা
  - ধনুষ্টংকার (নবজাতকের) দুরীকরণ অবস্থা বজায় রাখা
  - হাম দূরীকরণ অবস্থার পৌঁছানো
  - হেপাটাইটিস বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, রুবেলা, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া রোগসমূহ হ্রাস করা।

টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করে বাংলাদেশের লাখ লাখ শিশুর জীবন রক্ষায় সেবা প্রদানকারীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন। তথাপি শুধুমাত্র নিয়মিত টিকাদানের মাধ্যমে দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল বা নবজাতকের ধনুষ্টংকার দূরীকরণ করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে আপনাদের এলাকায় একটি কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য রোগ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। রাগ নিরীক্ষণের উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কোন রোগ সম্পর্কে সময়মত তথ্য সংগ্রহ করা। অন্য কথায় বলা যায়, 'ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহই রোগ নিরীক্ষণ'। এ বিষয়ে সেবাদানকারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ইপিআই কর্মসূচীর লক্ষসমূহ অর্জন সম্ভব।

রোগ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে রোগের সংজ্ঞা জানা গুরুত্বপূর্ণ। রোগের সংজ্ঞা বলতে বুঝায়, সেই রোগের কয়েকটি প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য যা সকলেই বুঝতে পারবেন এবং যার মাধ্যমে কারো সেই রোগ হয়েছে কি না তার শ্রেণী বিন্যাস করা যায়।

ইপিআই রোগ নিরীক্ষণের অন্তঃর্ভুক্ত রোগসমূহ

- Acute Flaccid Paralysis (এএফপি)- ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু
- Neonatal Tetanus (এনটি)- জন্ম থেকে ২৮ দিন বয়সী শিশু
- Measles (হাম)- সকল বয়সের
- যক্ষ্মা- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু
- ডিফথেরিয়া- সকল বয়সী
- হুপিং কাশি- সকল বয়সী
- ধনুষ্টংকার- নবজাতকের পর থেকে সকল বয়সী
- কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম

কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

রোগ নিরীক্ষণ ঃ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কোন রোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

নির্মূল/উচ্ছেদ ঃ যখন কোন রোগের জীবাণু স্থায়ীভাবে মানবদেহে এবং পরিবেশ থেকে মুক্ত করা হয়।

দূরীকরণ ঃ যখন মানবদেহে রোগের বিস্তার বন্ধ করা হয়, অথচ পরিবেশে সেই রোগের জীবাণু অবস্থান করে।

নিয়ন্ত্রণ ঃ যখন কোন রোগ নির্মূল বা দূরীকরণ করা সম্ভব হয় না তবে রোগের সংক্রমণ ও বিস্তারকে নিম্নতম পর্যায়ে আনা যায়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হবে না।

নবজাতকের ধুনষ্টংকার (এনটি) সংজ্ঞা

কোন নবজাতক শিশু যখন ঃ

- জন্মের প্রথম দুইদিন স্বাভাবিক ভাবে কাঁদতে ও দুধ চুষে খেতে পারার পরে ৩-২৮ দিন বয়সের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চুষে খেতে পারে না।
- সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যায়।

এএফপি'র সংজ্ঞা

যদি ১৫ বৎসরের কম বয়সের কোন ছেলে-মেয়ে হঠাৎ এক বা একাধিক হাত-পা নাড়াচাড়া করতে না পারে এবং আক্রান্ত অঙ্গটি থলথলে হয়ে যায়।

এ্যাকিউট ঃ হঠাৎ দুর্বলতার শুরু থেকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া।

ফ্লাসিড ঃ থলথলে।

প্যারালাইসিস ঃ আক্রান্ত অঙ্গ নাড়ানোর অক্ষমতা বা অবশ হয়ে যাওয়া।

এএফপি নিরীক্ষণ

তাৎক্ষণিকভাবে এএফপি রোগীর সংবাদ "রোগ নিরীক্ষণ ফোকাল পারসনকে" (সিভিল সার্জন বা উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) জানাতে হবে; যাতে করে "স্থানীয় সার্ভেইল্যান্স অফিসার" (মেডিকেল অফিসার- রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সার্ভেইলান্স) ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর তদন্ত করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য শিশুদের মাঝে পোলিও রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করতে পারেন।

এএফপি রোগী তদন্তের ধাপসমূহ

খবর পাওয়ার পর এএফপি রোগী তদন্তের জন্য নিম্নের ধাপসমূহ অনুসরণ করা হবে-

১. ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগ নিরীক্ষণ ফোকাল পারসন, স্থানীয় সার্ভেইল্যান্স অফিসারকে রোগীর তদন্ত করতে পাঠাবেন এবং এএফপি তদন্ত ফরম পূরণ করবেন।

২. প্যারালাইসিস শুরুর ১৪ দিনের মধ্যে ২৪-৪৮ ঘন্টার বিরতিতে রোগীর মলের দু'টি নমুনা সংগ্রহ করবেন।

৩. দু'টি কারণে স্থানীয় সার্ভেইল্যান্স অফিসার আক্রান্ত শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসতে পারেন। প্রথমতঃ এখনে স হজে মলের নমুনা ঠান্ডা অবস্থায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর পঙ্গুত্বের মাত্রা কমানো যায়, যদি তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এসে শিশুর পিতা-মাতা/অভিভাবককে শিখিয়ে দেয়া যায় কিভাবে শিশুর আক্রান্ত অঙ্গকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করাতে হয়।

৪. পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহে গত ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ আরও এএফপি রোগী আক্রান্ত হয়েছে কি না খুঁজে বের করতে হবে। "রোগ প্রাদুর্ভাব উত্তর টিকাদান" বা Outbreak Response Immunization (ORI) এর অংশ হিসেবে আক্রান্ত এএফপি রোগীর বাড়ির চারিদিকে ২০০ জন পঁচ বছরের নিচের শিশুকে এক ডোজ পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে। পূর্বে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়ে থাকলেও পুনরায় খাওয়াতে হবে।

৫. উপরোল্লিখিত ধাপসমূহ সম্পন্ন করতে আপনার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র আপনার গুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিত্তিতে এএফপি রোগী তদন্ত করে আপনার এলাকা থেকে পোলিও ে রাগের জীবাণু নির্মূলের জন্য টিকাদান অভিযান গ্রহণ করা যাবে। আপনি সময়মত এএফপি রোগীর খবর দিলেই কেবল উপরোক্ত ব্যবস্থার সুফল আমরা পেতে পারি। তাই আপনার এলাকা থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করতে আপনার অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নবজাতকের ধনুষ্টংকার নিরীক্ষণ

বাংলাদেশ থেকে নবজাতকের ধুনষ্টংকার দূরীকরণের জন্য জন্মের ৩-২৮ দিনের মধ্যে কোন জীবিত শিশু ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে তার তদন্ত করতে হবে এবং হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। উপরন্ত

জন্মের ৩-২৮ দিন বয়সের কোন শিশুর মৃত্যু হলে, শিশুটির মৃত্যু ধনুষ্টংকার হয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে।

নিম্নে নবজাতকের ধনুষ্টংকার রোগী/ নবজাতকের মৃত্যু তদন্তের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. যদি কোন শিশু ৩-২৮ দিনের ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয় তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সুপারভাইজারকে অবহিত করবেন এবং রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠাবেন।

২. যদি কোন শিশু ৩-২৮ দিন বয়সের মধ্যে মারা যায় তবে এবং সপ্তাহের মধ্যে তার মৃত্যুর সংবাদ সুপারভাইজারকে অবহিত করবেন।

৩. প্রাথমিক অবস্থায় একজন সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা অন্য কোন পরিদর্শক নবজাতকের ধনুষ্টংকার/মৃত্যুর খবর পেলে রোগীকে দ্রুত পরীক্ষা করবেন এবং তিনি যদি সন্দেহ করেন যে শিশুটি ধনুষ্টংকার আক্রান্ত হয়েছিল তবে সাথে সাথে তা রোগ নিরীক্ষণ ফোকাল পারসনকে অবহিত করবেন। সংবাদ পাওয়ার পর স্থানীয় সার্ভেইল্যান্স অফিসার রোগী/মৃত্যুর তদন্ত করবেন।

৪. পার্শ্বপর্তী বাড়িসমূহে গত ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ আরও নবজাতকের ধুনষ্টংকার রোগী আক্রান্ত/ মৃত্যু হয়েছে কি না খুঁজে বের করতে হবে।

৫. জীবিত/মৃত শিশুর মাকে টিটি টিকা প্রদান করবেন।

৬. পার্শ্ববর্তী এলাকায় টিকা পাওয়ার যোগ্য অন্যান্য ২০ জন মহিলাকে টিটি টিকা প্রদান করবেন। (Case Response Immunization-CRI) পরবর্তীতে এ সকল মহিলাদের ৫ ডোজ টিটি টিকা শেষ করতে হবে।

হাম রোগ

সংজ্ঞা ঃ শিশু/বড়দের প্রচন্ড জ্বর এবং শরীরে কমপক্ষে তিন দিন লালদানার সাথে নীচের এক বা একাধিক লক্ষণ থাকে- সর্দি, কাশি ও চোখ লাল হওয়া।

- এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। শরীরে লাল দানা, প্রচন্ড জ্বর, সর্দি, কাশি, চোখ লাল হয়। লাল দানা প্রথমে মুখ-মন্ডলে এবং পরে শরীরের নীচের দিকে হাত ও পায়ে ছড়ায়। দানা ওঠার ৫ দিন পর এ রোগ আর ছোঁয়াচে থাকে না।
- প্রায় ৩০% হামের রোগীর এক বা অধিক জটিলতা, যেমন- নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, অন্ধত্ব ও কানপাকা দেখা দিতে পারে। হামে আক্রান্ত শিশুদের ভিটামিন এ খাওয়ালে নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার ভয়াবহতা কমানো যায় ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যায়।
- ৬ মাসের নীচে শিশুকে ৫০,০০০ আই ইউ পরপর ২ দিন, ৬-১১ মাসের শিশুকে ১ লক্ষ আই ইউ পরপর ২ দিন এবং ১ বছরের উপরে শিশুকে ২ লক্ষ আই ইউ ভিটামিন এ খাওয়াতে হবে।
- চোখে জটিলতা হলে ১৪ দিন পর বয়স অনুযায়ী আরো ১ ডোজ ভিটামিন এ দিতে হবে।

হামের প্রকোপ

সংজ্ঞা ঃ যদি কোন ওয়ার্ডে (শহর বা পৌরসভা) বা মহল্লায় বা ১০ হাজারের মধ্যে এক মাসের মধ্যে ৩ বা ততোধিক হামের রোগী পাওয়া যায়।

হাম নিরীক্ষণ

প্রচলিত ইপিআই রিপোটিং ব্যবস্থার মত আপনি যে কোন বয়সের হাম রোগী সাপ্তাহিকভাবে রিপোর্ট করবেন। একমাত্র হামের প্রকোপোর ক্ষেত্রে আপনি দ্রুত আপনার সুপারভাইজার বা রোগ নিরীক্ষণ ফোকাল পারসনকে অবহিত করবেন। আপনার রিপোর্টের ভিত্তিতে রোগ নিরীক্ষণ ফোকাল পারসন, স্থানীয় সার্ভেইল্যান্স অফিসারকে হামের প্রকোপের তদন্তের জন্য পাঠাবেন। তিনি হামে আক্রান্ত শিশুদের বয়স, টিকা প্রাপ্তির তথ্য ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং হামের রোগীদের ভিটামিন-এ খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা চাইবেন।

হাম রোগের ভাইরাস একজন থেকে আরেক জনের মধ্যে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তাই হামের প্রকোপের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ "রোগ উত্তর টিকাদান" করা হয় না, তবে হাম রোগে আক্রান্ত শিশুদের অতিরিক্ত দুই ডোজ ভিটামিন-এ প্রদান করে হাম রোগের মারাত্মক জটিলতা থেকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়াও হাম রোগে আক্রান্ত কোন শিশু যদি নিউমোনিয়া, মারাত্মক ডায়রিয়া এবং অপুষ্টি থাকে তবে শিশুকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য তার পিতা-মাতাকে পরামর্শ দিতে হবে।

পাঠ-১৩
শিশুদের অভিভাবক ও মায়েদের জন্য ইপিআই মূল বার্তা

- শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ বা ৪২ দিন পূর্ণ হলেই টিকা দেয়া শুরু করুন এবং শিশুকে সবগুলো টিকা দিতে কমপক্ষে ৬ বার টিকাদান কেন্দ্রে আনুন।
- ১৮ সপ্তাহ বয়সে পিসিভির ৩য় ডোজ টিকা নেয়ার জন্য শিশুকে আরো একবার টিকাদান কেন্দ্রে আনুন
- শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে ১ ডোজ এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা এবং ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলেই শিশুকে হামের ২য় ডোজ টিকা দিন।
- টিকা দিলে স্বাভাবিকভাবে সামান্য জ্বর ও টিকার স্থানে ব্যথা হতে পারে, এতে ভয়ের কিছু নেই।

- অসুস্থ শিশুকে টিকা দেয়া যাবে না। তবে শিশু সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্য টিকা দিন এবং সময়সূচি অনুযায়ী সকল টিকা শেষ করুন।
- টিকার কার্ডটি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করুন।
- ১৫ বছর বয়সের সকল কিশোরীদের টিটি টিকার প্রাপ্য ডোজের সাথে ১ ডোজ এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা নিন।
- ১৫ বছর বয়স হলেই টিটি টিকা দেয়া শুরু করুন এবং সিডিউল অনুযায়ী ৫ ডোজ টিটি টাকা নেয়া শেষ করুন।
- আপনার এলাকায় ১৫ বছরের কমবয়সী কোন ছেলে বা মেয়ে যদি হঠাৎ হাত-পা নাড়াচাড়া করতে না পারে এবং আক্রান্ড় অঙ্গটি থলথলে প্যারালাইজড হলে দেরি না করে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খবর দিন।
- আপনার এলাকায় কোনো শিশু গত ২৮ দিনের মধ্যে মারা গেলে বা যে কোনো বয়সের কেউ হামে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্যে কেন্দ্রে খবর দিন।

তথ্য সূত্র :

- ইপিআই সহায়িকা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১২

অধ্যায় ২ ঃ শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ও পুষ্টি

পাঠ-১
শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সংজ্ঞা এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি

মায়ের গর্ভধারণের পর থেকেই একটি পরিবারে অনাগত শিশু সম্পর্কে কৌতুহল, আশা ও আনন্দের সূত্রপাত হয়। আর তাই শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পুষ্ট একটি শিশুর জন্মলাভ আমাদের সকলেই কাম্য হয়ে উঠে। জন্মের পর থেকেই শিশুটি এই বিশ্বে তার অপরিচিত এবং প্রতিকুল পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে শিশুটির বড় হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই বড় হওয়া বা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে "শিশুর ক্রমবৃদ্ধি" বলা যায়। শিশুর আকার ও ওজন বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

শিশুদের জন্মের স্বাভাবিক ওজন সাধারণত: ২.৫ কিলোগ্রাম (কেজি) থেকে ৩.২ কিলোগ্রাম হওয়া উচিত। শিশুদের জন্ম ওজন ২.৫ কেজির কম হলে কম ওজন সম্পন্ন শিশু বা LBW (Low Birth Weight Baby) শিশু বলা হয়।

প্রায় সকল শিশুরই জন্মের প্রথম ৩ থেকে ৪ দিনে ওজন অল্প কিছু কমে যায়, কিন্তু শিশুর দুগ্ধ পান ঠিকভাবে হলে পরবর্তী ৭ থেকে ১০ দিনে আবার ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম হিসেবে ওজন তিন মাস পর্যন্ত বাড়তে থাকে। সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে একটি শিশুর জন্ম ওজন স্বাভাবিক

প্রক্রিয়ায় ছয় মাসে প্রায় দ্বিগুণ, এক বছরে প্রায় তিনগুণ এবং দুই বছরে প্রায় চারগুণ হয়ে থাকে। ওজনের পাশাপাশি শিশুর উচ্চতা, মধ্যবাহুর মাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন বয়সে শিশুর ওজন, উচ্চতা ও মধ্য বাহুর মাপ দেয়া হলো-

শিশুর ক্রমবৃদ্ধির তথ্য

বয়স	ওজন	উচ্চতা	মধ্যবাহুর পরিধি
জন্মের সময়	৩.২ কেজি	৫০.২ সেন্টিমিটার	১০.৪ সেন্টিমিটার
৬ মাস	৭.৫ কেজি	৬৬.৯ সেন্টিমিটার	১৪.৭ সেন্টিমিটার
১ বছর	৯.৮ কেজি	৭৫.২ সেন্টিমিটার	১৬.০ সেন্টিমিটার
২ বছর	১২.১ কেজি	৮৫.০ সেন্টিমিটার	১৬.৩ সেন্টিমিটার
৩ বছর	১৪.৪ কেজি	৯৪.৪ সেন্টিমিটার	১৬.৬ সেন্টিমিটার
৪ বছর	১৬.৩ কেজি	১০০.২ সেন্টিমিটার	১৬.৯ সেন্টিমিটার
৫ বছর	১৮.২ কেজি	১০৯.২ সেন্টিমিটার	১৭.২ সেন্টিমিটার

সূত্র ঃ জনগোষ্ঠির পুষ্টি অবস্থা নির্ধারণ, ডি.বি. জেলিফ এবং ই.এফ.পি, জেলিফ, অক্সফোর্ড মেডিক্যাল পাবলিকেশনস, ১৯৮৯।

পাঠ-২
শিশুর বিকাশের মাইলষ্টোন বা মাইলফলক ও শিশুর মানসিক বিকাশের ধাপসমূহ

প্রকৃতির নিয়মেই ছোট একটি শিশু সুস্থ অবস্থায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। তবে এটা একদিনে সম্পন্ন হয় না। শারীরিক বৃদ্ধির সংগে সংগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপনের প্রবণতাও শিশুর মধ্যে বিকাশ লাভ করে। শিশুর এই শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের ধারাকে ইংরেজীতে "মাইলষ্টোন" অর্থাৎ শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাপকাঠি বা স্তর বলা যেতে পারে। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে সকল শিশুরই শারীরিক ও মানসিক বিকাশ একই গতিতে সম্পন্ন হয় না। আর তাই শিশুর ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ কালে মায়েদের এই সকল "মাইলষ্টোন" সম্পর্কে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

শিশুর বয়স	শিশুর শারীরিক উন্নয়নের মাইলষ্টোন বা মাপকাঠি
৩ মাস	- ঘাড় তুলে সোজা করতে পারে - মানুষকে দেখে হাসতে পারে
৩ থেকে ৬ মাস	- ঘাড় শক্ত করে রাখতে পারে - কোনকিছু নড়াচড়া করলে সাথে সাথে চোখ ঘোরাতে পারে - জিনিসপত্র হাত দিয়ে ধরতে পারে।
৬ থেকে ৯ মাস	- কোন সাহায্য ছাড়াই বসতে পারে - হামাগুড়ি দিতে পারে

	- আঙ্গুল দিয়ে জিনিসপত্র তুলতে পারে - জোরে শব্দ করতে পারে
৯ থেকে ১২ মাস	- দাঁড়াতে ও সাহায্য নিয়ে হাঁটতে পারে - কিছু কিছু শব্দ বুঝতে শেখে এবং তা ব্যবহার করার চেষ্টা করে
১২ থেকে ১৮ মাস	- একা হাঁটতে পারে - আদেশ বুঝতে পারে - খুব বেশী কৌতুহলী হয়
২ বছর	- চারদিকে ছোটাছুটি করতে পারে - বাক্য তৈরি করতে পারে - প্রশ্রাব পায়খানা ধরে রাখতে পারে
৩ বছর	- কৌতুহলী ও অনুসন্ধান প্রিয় হয়
৪-৫ বছর	- লেখাপড়ায় আগ্রহী হয় - ছবি আঁকতে পছন্দ করে

তবে এই "মাইলষ্টোন" হচ্ছে বিভিন্ন সময়কালে সহজভাবে শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝার পর্যায়ক্রমিক লক্ষণীয় মাপকাঠিসমূহ। তাই এটি অনেকটা গুণগতমান নির্ণয়ের ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ সময়ে শিশুর প্রকৃত পুষ্টি অবস্থা জানার জন্য তাই শিশুর নিয়মিত ওজন ও উচ্চতাসহ অন্যান্য পরিমাপ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

শিশুর ওজন নেয়া শিশুর পুষ্টি অবস্থা জানার একটি সহজতম পদ্ধতি, যা কিনা জন্মের সাথে সাথেই প্রয়োগ করা সম্ভবপর। ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। প্রতিটি সুস্থ শিশুর একটি স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্য ওজন বা আদর্শ ওজন রয়েছে যা কি না বিভিন্ন বয়সে ভিন্নতর হয়ে থাকে। এই ওজন আদর্শ মানের ওজনের সঙ্গে তুলনা করে প্রতিমাসেই মাকে তার শিশুর পুষ্টি অবস্থা জানানো যায়। তবে প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে শিশুর ওজন নেয়া উচিত। শিশুর ওজন নেয়ার পর স্বাস্থ্যকর্মী শিশুর মাকে শিশুর পুষ্টি অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন। যদি শিশুর ওজন আদর্শমানের গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে তাহলে মাকে উৎসাহিত করবেন। আবার যদি আদর্শ ওজন থেকে ঘাটতি থাকে তাহলে মায়ের সংগে আলাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী ওজনের ঘাটতির কারণ নির্ণয় করতে পারবেন এবং সংগে সংগেই মাকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

তাই জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত প্রতিমাসেই শিশুদের ওজন নেয়ার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিশুদের পুষ্টি অবস্থা নির্ধারণ এবং প্রতিকার সম্ভবপর বিধায় শিশুদের ওজন নেয়া অবশ্য প্রয়োজন।

শিশুর মানসিক বিকাশে করণীয়সমূহ

শিশুর শারীরিক ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক পরিপক্কতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি শিশু তার পরিবেশ, পরিচিত জন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তার অনুভূতির আদান প্রদান করতে থাকে। এই সময়ে তার ভাল লাগা, ভাল না লাগা, অন্যকে অনুকরণ করতে শেখা, খাওয়া দাওয়ার প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নানাবিধ বিষয়াদি সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। তাই এই সময়টিতে তার মস্তিষ্কের পরিপক্কতা সাধনের জন্য সুষম খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

শিশুর অনুভূতি বিকাশে করণীয়সমূহ

শিশুর অনুভূতি বিকাশে নিম্নোক্ত বিষয়াদি প্রভাবিত করে থাকে ঃ

ক) পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক তার ভাল কাজকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দান করা।

খ) পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক সময়মত সঠিক নির্দেশনা দিয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সুঅভ্যাস গড়ে তোলা।

গ) অন্যান্য শিশুদের সাথে মিশে খেলাধুলার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে সাহায্য করা।

ঘ) সর্বোপরি পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও ভালবাসা দিয়ে শিশুকে একজন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর শারীরিক ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার পাশপাশি তার মানসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় একটি শিশুর সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

পাঠ-৩
শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ব্যহত হওয়ার কারণসমূহ

একটি শিশুর ক্রমবৃদ্ধি বিভিন্ন শারীরিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে ব্যহত হয়ে থাকে। মূলত: অনেক সময় দেখা যায় যে একটি কারণ অন্যটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

শিশুর বৃদ্ধি ব্যহত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

১) সঠিক সময়ে সঠিক খাদ্য না পাওয়া/সঠিক খাদ্যাভাসের অভাব ঃ নিম্নলিখিত খাদ্য সঠিক সময়ে না পেলে শিশুর বৃদ্ধি ব্যহত হতে পারে-

- জন্মের পর থেকে শালদুধসহ মায়ের দুধ
- ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ
- ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার এবং মিশ্র খাবার
- ২ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো
- প্রচুর পরিমাণে আমিষ, ক্যালোরী এবং রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান যুক্ত খাবার।

২) মায়ের পুষ্টির অভাব

- গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সময়ে মায়ের অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কারণে নবজাত শিশুর জন্ম ওজন স্বাভাবিক ওজনের কম হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হতে পারে।
- খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার
- গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের অবহেলা।

৩) শৈশবকালীন রোগসমূহ

- ডায়রিয়া জনিত রোগ
- কৃমি
- হাম, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি-টিকা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪) গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ

- খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হলে শিশুর বুদ্ধি বা বিকাশ ঠিকমত হয় না।

৫) বংশগতভাবে

৬) পরিবারে শিশুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং দুইটি শিশুর জন্মলাভের মধ্যেকার কম ব্যবধান জনিত (ব্যবধান ২ বছরের কম হলে) সময়ের কারণেও শিশুর ক্রমবৃদ্ধি যথেষ্ট ব্যাহত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের অভাবে শিশুর বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

৭) অন্যান্য কারণ যেমন- সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কু-সংস্কার ইত্যাদির জন্য শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অনেকে মনে করে যে দুধে বাতাস লাগে। সে জন্য বুকের দুধ শিশুদের খেতে দেয় না। আবার শিশু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে অনেক মায়েরা শিশুকে খাবার বন্ধ করে দেয়।

জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে অবশ্যই শাল দুধসহ মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। একই সঙ্গে ছয় মাসের পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি খাবার বিশেষ করে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর "মিশ্রণ খাবার" অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের খাবার সহযোগে শিশুকে খেতে দেয়া উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিশুর খাবার যেন সুষম হয় অর্থাৎ গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণকারী খাবার, তাপ ও শক্তিদায়ক খাবার এবং রোগ প্রতিরোধকারী খাবারের সমন্বয়ে আনুপাতিক হারে খাওয়ানো হয়।

শিশু সহজেই সংক্রমণের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং আস্তে আস্তে এই অবস্থা জটিলতার দিকে অগ্রগতি হয়। প্রতিরোধযোগ্য এই সকল সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ব্যহত হওয়াসহ তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো হচ্ছে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, হেপাটাইটিস-বি এবং নিউমোনিয়া। তাই নির্দিষ্ট সময়ে এই ৮টি রোগের প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত টিকাসমূহ শিশুকে দিতে হবে।

মায়ের অপুষ্টি হওয়ার কারণসমূহ

- মায়ের অপুষ্টি হওয়ার কারণগুলো শিশুর অপুষ্টির কারণগুলোর মত। অভাবগ্রস্থ পরিবারগুলিতে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ছোটবেলায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম পরিমাণ খাবার দেয়া হয়।
- মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় মহিলারা পরিবারের সবার শেষে খায়।
- যে পরিবারে খাবারের অভাব সেখানে মহিলারা তাদের প্রয়োজন মত খেতে পায় না।
- গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলা কম খায়, কারণ তাদের একটা ভুল ধারণা যে বেশী খেলে বাচ্চা বড় হবে এবং প্রসবের সময় কষ্ট পাবে ও স্বাভাবিক প্রসব ব্যহত হবে।
- অপুষ্টির মূল কারণগুলো ধৈর্য্য সহকারে মায়েদের এবং গ্রাম্য নেতৃবৃন্দদের বুঝিয়ে দেওয়া পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের একটি বিরাট দায়িত্ব। গ্রাম পর্যায়ে খাবারের অভাব আছে বটে তবুও অনেক সমস্যা স্থানীয়য়ভাবে পুষ্টিশিক্ষার মাধ্যমে দূর করা যায়।
- কুসংস্কার এর কারণে কিছু কিছু পুষ্টিকর খাবার গর্ভবতী মায়েদের দেওয়া হয় না।

পাঠ-৪

শিশুর ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিসমূহ

শিশুর ক্রমবৃদ্ধি পরিমাপ করা বা দীর্ঘদিন ব্যাপি পর্যবেক্ষণের অন্যতম প্রধান দৈহিক পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ হচ্ছেঃ

ক) ওজন নেয়া

খ) উচ্চতা মাপা

গ) মধ্যবাহুর পরিধি মাপা

এই পদ্ধতিসমূহ সাধারণভাবে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভবপর।

ক) ওজন নেয়া

শিশুর ক্রমবৃদ্ধি বোঝার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিমাসে তার ওজন নেয়া। ওজন না বাড়া অথবা ওজন কমে যাওয়া শিশুর স্বাস্থ্যহানীর লক্ষণ। যদি শিশুটির ওজন প্রতিমাসেই স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা বাড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শিশুটি সঠিকভাবে বাড়ছে। শিশুর জন্মের প্রথম সপ্তাহেই, সম্ভব হলে প্রথম দিনেই ওজন নিলে ভাল হয় এবং এই ওজন পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত নেয়া উচিত। প্রাপ্ত ওজন গ্রোথ চার্টে লিপিবদ্ধ করে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি হচ্ছে কি না বোঝা যায়। (চিত্রে সল্টার ঝুলন্ত ওজন মাপার যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর ওজন নেয়া দেখানো হলো)

চিত্রঃ সল্টার স্কেলে শিশুর ওজন পরিমাপ

নিম্নোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়

- প্রত্যেক মাসের প্রায় একটি নির্দিষ্ট তারিখে এবং সম্ভব হলে প্রায় একই সময়ে শিশুর ওজন নিতে হবে।

- পর পর ২ মাস শিশুর ওজন একই রকম থাকলে শিশুর প্রয়োজনীয় পরিমাপ খাদ্যের অভাব অথবা অন্য কোন রোগ সংক্রমণ নির্দেশ করবে।

খ) উচ্চতা মাপা

জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন শিশুর উচ্চতা ক্রমাগতভাবে বাড়তে না থাকলে বুঝতে হবে শিশুটি অপুষ্টিতে ভুগছে। সাধারণভাবে শিশুর উচ্চতা এক বৎসরে জন্মকালীন উচ্চতার প্রায় দেড়গুণ হয়ে থাকে। তবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণরত অবস্থায় উচ্চতা মাপা ওজন নেয়ার তুলনায় শিশু স্বাস্থ্যের তাৎক্ষনিক পরিমাপক হিসাবে কিছুটা কম সংবেদনশীল। যে সকল শিশু দাঁড়াতে পারে তাদের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে-

লম্ব ও উচ্চতা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

স্থানীয়ভাবে তৈরী একটি কাঠের স্কেলের মাধ্যমে শারীরিক লম্বা ও উচ্চতা উভয় পরিমাপ করা হয়। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্কেলটিকে আনুভূমিকভাবে রেখে শিশুকে স্কেলের উপর চিৎ করে শুইয়ে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। দুই হতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্কেলটিকে দাঁড় করিয়ে তার উপর শিশুকে দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। পরিমাপক স্কেলের মধ্যে একটি Cursor (Head piece/Foot piece) রয়েছে যেটিকে স্কেলের নির্ধারিত অংশ দিয়ে সহজেই উঠা-নামা/ যাওয়া-আসা করানো যায়। এ স্কেলের সর্বোচ্চ ১২০ সে.মি পর্যন্ত শিশুর উচ্চতা পরিমাপ করা যায় এবং পরিমাপক ফিতাটির সর্বনিম্ন পরিমাপ সংখ্যা ০.১ সে.মি।

লম্বা ও উচ্চতা পরিমাপ ঃ

দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা পরিমাপ করা হয় শিশুদের বয়স অনুযায়ী। স্কেলটিকে মাটিতে আনুভূমিক অবস্থায় রেখে শিশুকে বোর্ডের উপর চিৎ করে শুইয়ে দৈর্ঘ্য এবং স্কেলে দাঁড়ানো অবস্থায় শিশুদের উচ্চতা পরিমাপ করা হয়।

- দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়।
- দু'বছরের বেশী বয়সী শিশুদের উচ্চতা পরিমাপ করা হয়।

শিশুর উচ্চতা যেভাবে পরিমাপ করবেন ঃ

দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা পরিমাপ করার পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :

- শিশুর উচ্চতা পরিমাপের স্কেলটিকে শক্ত ও সমতল মাটিতে বসান বা কোনো শক্ত খুঁটি, দেয়াল, চেয়ার, টেবিল বা যে কোনো সুবিধাজনক স্থানে ঠেস দিয়ে রাখুন।
- স্কেলটি যাতে নড়াচড়া করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

- পরিমাপের পূর্বে শিশুর মা/অভিভাবককে অনুরোধ করুন- শিশুর জুতা/স্যান্ডেল, টুপি, চুলের বেণী, ফিতা, ব্যান্ড, কাঁটা, ক্লিপ ইত্যাদি খুলে নিশ্চিত হোন।
- শিশুকে স্কেলের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে দাঁড় করানোর সময় অভিভাবককে সাহায্য করতে অনুরোধ করুন, যাতে শিশুর পেছনের অংশ স্কেলের সাথে লাগানো থাকে (প্রয়োজনে দেখিয়ে দিন কিভাবে দাঁড়াতে হয়)
- সহকারী পরিমাপকারী শিশুর ডান দিকে হাঁটু গেঁড়ে বসে বাম হাতে শিশুর হাঁটু এবং ডান হাতে পায়ের গোড়ালী ধরে বোর্ডের সাথে এমনভাবে লাগান যাতে শিশুর পায়ের পাতা দু'টি 'ভি' আকৃতি হয়।
- সহকারী পরিমাপকারী শিশুর পায়ের গোড়ালী এবং হাঁটু এমনভাবে ধরুন যাতে পা দুটি সোজা এবং সমান থাকে।
- পরিমাপকারী শিশুর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসুন
- নিশ্চিত হন যাতে শিশুর মাথার পেছনের দিক, কাঁধ/পিঠ, পশ্চাৎভাগ, কাফ মাসল, পায়ের গোড়ালী স্কেলের সাথে লেগে থাকে ও পা দুটি সোজাসুজি এবং হাত দুটি দু'পার্শ্বে স্বাভাবিকভাবে ঝুলানো থাকে।
- শিশুর মা/অভিভাবককে অুনরোধ করুন শিশুর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসতে এবং শিশুকে বলুন তার মায়ের দিকে সোজাসুজি তাকাতে। পরিমাপকারী শিশুর মাথাকে এমনভাবে রাখুন যাতে তার দৃষ্টি সোজাসুজি সামনের দিকে থাকে।
- বাম হাতে এমনভাবে শিশুর চিবুক ধরুন যাতে শিশুর মুখ বা কান বন্ধ হয়ে না যায়
- শিশুর পেটে হালকা চাপ দিয়ে সঠিক উচ্চতায় দাঁড় করান এবং পুনরায় নিশ্চিত হোন
- Cursor টি ডান হাত দিয়ে ধরে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিয়ে মাথার তালুর উপর স্থাপন করুন এবং ফিতার সঠিক উচ্চতার পরিমাপ সংখ্যাটি দেখুন।
- উচ্চতা পরিমাপকৃত সঠিক সংখ্যাটি সতর্কতার সাথে পড়ুন এবং উক্ত সংখ্যাটি (নিকটবর্তী ০.১ সে.মি.) উচ্চস্বরে বলুন, যাতে সহকারী পরিমাপকারী ভালোভাবে শুনতে পায়
- দশমিকসহ পরিমাপকৃত সংখ্যাটি লিখুন এবং সহকারী পরিমাপকারীও লিখিত সংখ্যাটি সঠিকভাবে কোড করা হয়েছে কি না নিশ্চিত হোন

চিত্র ঃ দু'বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর উচ্চতা পরিমাপ

শোয়ানো অবস্থায় দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ ঃ

- পরিমাপ বোর্ডটি মাটিতে থাকবে
- শিশুটি বোর্ডের মধ্যখানে শোয়ানো অবস্থায় থাকবে
- সহযোগি শিশুটিকে মাথার দু'পাশে খুব আলতোভাবে এবং সঠিকভাবে ধরে চুল সংকুচিত করে হেডবোর্ডে সোজাসুজি বসিয়ে দিবেন।
- পরিমাপকারী তার হাত দিয়ে আলতোভাবে নড়াচড়া প্রতিরোধ করবে
- উচ্চতা পরিমাপ করে সঠিকভাবে লিখে নিতে হবে (দশমিক এর পর ১ ডিজিট)
- সহযোগিতার জন্য একজন লোককে অবশ্যই বোর্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটু গেড়ে বসতে হবে
- বাচ্চাটি বোর্ডের উপর শায়িত থাকবে, একজন লোক বাচ্চাটির মাথা দুই হাত দিয়ে ধরে বোর্ডে বসিয়ে দিতে সাহায্য করবে
- চুল সংকুচিত করে মাথার উপরিভাগ হেড বোর্ডের সাথে লাগাবে
- মাথা দুই হাত দিয়ে এমনভাবে ধরতে হবে, যাতে দৃষ্টি উচ্চতা মাপার বোর্ডের উপর লম্বভাবে এবং সোজা থাকে
- পরীক্ষা করতে হবে যাতে শিশুটি বোর্ডের মাঝে অবস্থান করে এবং অবস্থান পরিবর্তন না করে
- অন্য ব্যক্তি বোর্ডের পাশে অবস্থান করবে
- শিশুর শরীর বোর্ডের পাশে অবস্থান করবে
- শিশুর শরীর বোর্ডের সঠিক অবস্থানে থাকতে সাহায্য করবে

- এক হাত উরু এবং হাঁটুতে রাখবে এবং আস্তে চাপ দিয়ে সোজা করবে
- শিশুর ক্ষতি না করে হাটু যতটা সম্ভব সোজা করতে হবে
- অন্য হাত দিয়ে ফুট পিস পায়ের সাথে লাগাতে হবে। পায়ের তালু ফুট পিসের লেপ্টে থাকবে এবং আঙ্গুল বাঁকা করে এবং পায়ের তালু ফুট পিসের সাথে না লাগায় তাহলে আঙ্গুল সোজা করতে হবে এবং পায়ের তালুর সাথে হালকা করে ফুট পিস লাগাতে হবে।

চিত্র ঃ দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়।

গ) মধ্যবাহুর পরিধি পরিমাপ

কম সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের পুষ্টি অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভে এই পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর। চিত্রে নির্দেশিতভাবে শিশুর মধ্যবাহুর (বাম) পরিধি মাপা হয়ে থাকে।

চিত্র ঃ মধ্যবাহুর পরিধি মাপন

সহজে লম্বা হয় না এ ধরনের একটি গজ ফিতা অথবা চিত্রে নির্দেশিত বিশেষ ফিতাটি সহজভাবে ব্যবহার করা যায়।

একটি স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর বেলায় ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিধির মাপ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই বিশেষ ফিতাটিতে সবুজ, হলুদ ও লাল রং এর ৩টি চিহ্নিত অংশ থাকে। নিচে বিভিন্ন রংয়ের অবস্থানভেদে শিশুর পুষ্টি অবস্থা একটি ছকে প্রদান করা হলো।

মধ্যবাহুর পরিমাপ অনুযায়ী পুষ্টির অবস্থা (৬-৫৯ মাস শিশুর)

রং	মাপ	পুষ্টি অবস্থার বিবরণ
সবুজ	১২.৫ সেন্টিমিটারের উপরে	স্বাভাবিক
হলুদ	১১.৫-১২.৫ সেন্টিমিটারের মধ্যে	মাঝারী তীব্র অপুষ্টি
লাল	১১.৫ সেন্টিমিটারের নীচে	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি

মধ্যবাহুর পরিধি মাপার এই বিশেষ ফিতাটি পর্যায়ক্রমিক নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঃ

ক) প্রথমে বিশেষ ফিতাটির এক প্রান্ত বাহুর উপর প্রান্তে এবং ফিতার অপর প্রান্ত বাহুর কনুইয়ের শেষ ভাগে ধরতে হবে। এরপর বাহুর থেকে কনুইয়ের মোট মাপের অর্ধেক যেখানে আসবে, সেই পয়েন্ট ধরে ফিতা দিয়ে বাহুর মাপ নিতে হবে।

খ) মাপ নেয়ার পূর্বে ফিতার কাটা অংশ বা জানালা বাধামুক্ত করতে হবে।

গ) তারপর ফিতার অন্যপ্রান্ত হাতের বাম বাহুর মধ্যভাগ ঘুরিয়ে কাটা অংশের ভিতর দিয়ে ঢোকাতে হবে।

ঘ) '০' (শূন্য) বরাবর ফিতার মাপটিই হচ্ছে মধ্যবাহুর পরিধি।

ওজন মাপার যন্ত্র এবং শিশুর ওজন পরিমাপ প্রক্রিয়া

১। ওজন মাপার যন্ত্রগুলি কি কি?

- সমতা তুলাদণ্ড ওজন মাপক যন্ত্র
- সল্টার ঝুলন্ত ওজন মাপক যন্ত্র

সাধারণতঃ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সল্টার ঝুলন্ত ওজন মাপক যন্ত্র এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সমতা তুলাদন্ড ওজন মাপক যন্ত্র ব্যবহার হয়।

২। শিশুর ওজন মাপন প্রক্রিয়া

শিশুর পুষ্টি অবস্থা নির্ধারণে ওজন মাপার প্রক্রিয়াটি যতই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, ততই সঠিকভাবে পুষ্টি অবস্থা জানা যায়। ছোট শিশুদের বেলায় (তুলাদণ্ড সমতা) ওজন মাপক যন্ত্র এবং কিছুটা বড় শিশুদের বেলায় সল্টার

ঝুলন্ত ওজন মাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একজন স্বাস্থ্যকর্মী অথবা একজন কমিউনিটি প্যারামেডিককে তাই সঠিকভাবে ওজন নেয়ার প্রক্রিয়াটি পুঙ্খানুপুংখভাবে আয়ত্তে আনতে হবে।

সল্টার ঝুলন্ত ওজন যন্ত্র বা স্কেলের ব্যবহার যন্ত্রটিতে একটি ঘড়ির মত ডায়াল থাকে এবং একটি হুকের সংগে বিশেষ ধরনের প্যান্ট বা গামলা ঝুলানো অবস্থায় ডায়ালের সংগে সংযুক্ত থাকে।

ওজন নেয়ার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপভাবে সম্পন্ন করতে হবে-

ক) প্রথমেই মায়ের সঙ্গে ওজন নেয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ সম্পন্ন করুন।

খ) সম্মতির ভিত্তিতে সল্টার ওজন মাপক যন্ত্রটিকে একটি দৃঢ় অবস্থানে স্থাপন পূর্বক ডায়ালের কাটাটিকে '০' (শূন্য) জায়গায় নিয়ে আসুন।

গ) শিশুর পরিধেয় কাপড় যথাসম্ভভ কম করে শিশুটিকে বিশেষ প্যান্টের ভেতরেবসান অথবা গামলায় শুইয়ে দেন এবং শিশুর নড়াচড়া বন্ধ অবস্থায় ওজন লিপিবদ্ধ করুন। প্রতিমাসে সম্ভব হলে একইভাবে শিশুর ওজন নেয়া উচিত।

সমতা তুলাদণ্ড, ওজন মাপক যন্ত্র ব্যবহার পদ্ধতি ঃ মা বা অভিভাবকের সম্মতির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে ওজন নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়-

ক) ওজন মাপক যন্ত্রটিকে একটি দৃঢ় অবস্থানে স্থাপন করা।

খ) প্রথমেই স্কেলের “০” (শূন্য) ঘরে ডানদিকের ভারী মাপ নিয়ে এসে এবং প্রয়োজনবোধে স্কেলের বাম দিকের পেঁচানো ভারী মাপকে ঘুরিয়ে পাল্লার ভারসাম্য বা ব্যালেন্স করা।

গ) এবার শিশুটিকে যথাসম্ভব কম পরিধেয় কাপড়সহ পাল্লায় শুইয়ে বা বসিয়ে দেয়া।

ঘ) কান্নাকাটি অথবা অযথা নড়াচড়া থেকে শিশুকে বিরত রাখা।

ঙ) যন্ত্রপাতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবার ডানদিকের ভারী মাপটি স্কেলের অপর প্রান্তের দিকে আস্তে আস্তে সরানো এবং ভারসাম্য অর্জন করা।

চ) এবারে শিশুটিকে সরিয়ে নিয়ে ভারসাম্যকৃত ওজনটি লিপিবদ্ধ করা

উল্লেখ্য, তুলাদণ্ড সমতা ওজন মাপক যন্ত্রের বড় ভাগগুলো এক কেজি বা ১০০০ গ্রামের এবং ছোট ভাগগুলো ১০০ গ্রামের। ডানদিকের ভারী মাপটির মাঝখানে “০-১০০” গ্রাম পর্যন্ত পাঁচভাগে ভাগ করা পাঁচটি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ভাগের ওজন ২০ গ্রাম। ভারসাম্য অবস্থায় এই দুই ধরনের ওজনের সমন্বিত ফলাফল বা ওজনই হচ্ছে শিশুটির প্রকৃত ওজন।

বিঃ দ্রঃ অনেক মায়ের ভ্রান্ত ধারণা আছে, শিশুর ওজন নিলে শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই মাকে ভালভাবে বুঝিয়ে শিশুর ওজন নিতে হবে।

পাঠ-৫
শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড পূরণ ও ব্যবহার

যে কার্ডে শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুর স্বাভাবিক ওজন প্লট করা থাকে লেইন ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে এবং যে কোন শিশুর ওজন নেবার পর প্লট করা ওজন থেকে তুলনা করে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না তা দেখা যায় তাকে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড বলে।

এই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডকে সাধারণভাবে গ্রোথ চার্ট বলা হয় যা হচ্ছে বয়সের তুলনায় শিশুর ওজন বিশ্লেষণ করার একটি ছক। জন্ম থেকে আরম্ভ করে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই বৃদ্ধির চার্ট ব্যবহৃত হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড ব্যবহার করে পুষ্টি অবস্থা নির্ণয় ঃ

শিশুর ওজন নিয়ে মাস অনুযায়ী স্বাস্থ্য কার্ডে বসিয়ে তার কোন রঙের ব্যান্ডের মধ্যে পড়েছে সেটা দেখে পুষ্টি অবস্থা নির্ণয় করা যায়। এই কার্ডে লাল ব্যান্ডে শিশুর ওজন থাকলে মারাত্মক অপুষ্টি বোঝায়।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডে ওজন বসানো ঃ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ড বা গ্রোথ কার্ড হল এক ধরণের ছক যাতে বিভিন্ন বয়সের শিশুর ওজন রেকর্ড করা হয় এবং পূরণ করা কার্ড দেখে শিশুর পুষ্টি অবস্থা বুঝা যায়। এই কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ণীত শিশুর পুষ্টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যায়। নমুনা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। এর প্রথম প্রচ্ছদের পৃষ্ঠায় মা ও শিশুর ছবির নিচে একটি ঘর আছে। এটি তথ্যের ঘর। এখানে শিশুর নাম, শিশুর বাবা ও মায়ের নাম, জন্ম তারিখ, ছেলে না মেয়ে, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, খানা নম্বর, গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা লেখা আছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডে বুদ-বুদ দিয়ে তৈরী দুই ধরনের রেখা আছে। এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত সমতল রেখা এবং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত খাড়া রেখা। খাড়া রেখা দিয়ে শিশুর বয়স এবং সমতল রেখা দিয়ে শিশুর ওজন বুঝানো হয়। এই কার্ডের তলদেশে মাস এবং বছর অনুযায়ী দুই বছর পর্যন্ত শিশুর বয়সের ধাপ দেখানো আছে। সর্ববামে প্রথম ঘর শিশুর জন্মের তারিখ লেখার জন্য। বারো এবং চব্বিশ মাসের ঘরে জন্ম মাসের নাম এবং হিসাব অনুযায়ী বছর লিখতে হবে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডের সর্ব বামে খাড়া রেখা বা রেখাংশগুলো লক্ষ করতে হবে ভালভাবে। এই রেখা বা রেখাংশগুলো বরাবর কিলোগ্রামে ওজনের অংক যেমন- ১.৫, ২, ২.৫, ৩, ... ১৭.৫ কিলোগ্রাম লেখা আছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডে বিভিন্ন রঙের ব্যান্ড আছে, যা শিশুর পুষ্টির অবস্থা স্থির করা যায়। স্বাভাবিক শিশুর ওজন রেখা সবচেয়ে উপরের ব্যান্ড থেকেও পড়তে পারে।

সংশ্লিষ্ট নমুনা কার্ড ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তাতে ফোঁটা বা বিন্দু বসিয়ে শিশুর ওজন রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রতিটি ফোঁটাকে সরল রেখা দিয়ে যোগ করা হয়েছে। এই রেখাকে শিশুর ওজন রেখা বলা হয়। গ্রোথ মনিটরিং এর জন্য শিশুর ওজন যে রঙের ব্যান্ডেই থাকুক, তার ওজন রেখার গতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ওজন রেখা থেকে বুঝা যায় শিশুটির ওজন এবং প্রতি মাসে সঠিক হারে বাড়ছে কি না। অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ছে এবং তার সঠিক বৃদ্ধি ঘটছে কি না।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড পূরণ করার ধাপসমূহ ঃ

১। সূচিপত্র পূরণ করা-

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ড রেজিষ্টারের সূচিপত্র অংশে শিশুর নাম এবং অন্যান্য তথ্য লিখতে হবে। এখন একটি নতুন স্বাস্থ্য কার্ড নিয়ে অনুশীলন করতে হবে।

২। তথ্যের ঘর পূরণ করা-

তথ্যের ঘরে শিশুর নাম বাবা ও মায়ের নাম, জন্মের তারিখ, ছেলে না মেয়ে, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, খানা নম্বর, গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা লিখতে হবে।

৩। মাস এবং বছরের কলাম পূরণ করা-

(ক) স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ডের বাম পাশে নিচের দিকে প্রথম ঘরে অর্থাৎ 'জন্ম তারিখ' লেখা ঘরে শিশুর সঠিক জন্ম তারিখ অথবা শিশুর জন্মের মাস এবং বছর লিখুন (দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুর জন্মের মাস এবং বছর নির্ধারণ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে)। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যদি ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে প্রথম ঘরে অক্টোবর, ২০১২ লিখুন। বারো মাসের ঘরে অক্টোবর ২০১৩ এবং তারপর চব্বিশ মাসের ঘরে অক্টোবর ২০১৪ লিখুন। আপনি চাইলে মাসের নাম না লিখে সংখ্যা লিখতে পারেন। যেমন- 'অক্টোবর ২০১১' লেখার বদলে আপনি '১০/১১' লিখতে পারেন।

(খ) যে ঘরে 'অক্টোবর ২০১১' লেখা হয়েছে তার পরের ঘরগুলোতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত নভেম্বর ২০১১, ডিসেম্বর ২০১১, জানুয়ারী ২০১২ ইত্যাদি লিখুন। মাসের নামগুলি বছরের শেষে যদি অক্টোবর পর্যন্ত না পৌছায়, তবে দেখে নিন যে কোন মাসের নাম লিখেননি অথবা বাদ পড়ে গেছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জানুয়ারীতে পৌঁছে বছর বদলাতে ভুলবেন না। এখন চব্বিশ মাস পর্যন্ত সবগুলো মাসের ঘর পূরণ করুন। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড পূরণ শুরু করার সময় বেশি সময় লাগবে বলে আপনি সবগুলো মাসের ঘর পূরণ করতে নাও চাইতে পারেন। তবে ঘরগুলি পূরণ করা থাকলে তাড়াতাড়ি এবং সহজে ওজন বসানো যাবে। এরপর ওজন নিয়ে তা কার্ডে বসানোর সময় শুধু মাসের নাম এবং বছর দেখলেই চলবে। এই কলামেই শিশুর ওজন রেকর্ড করা যায়।

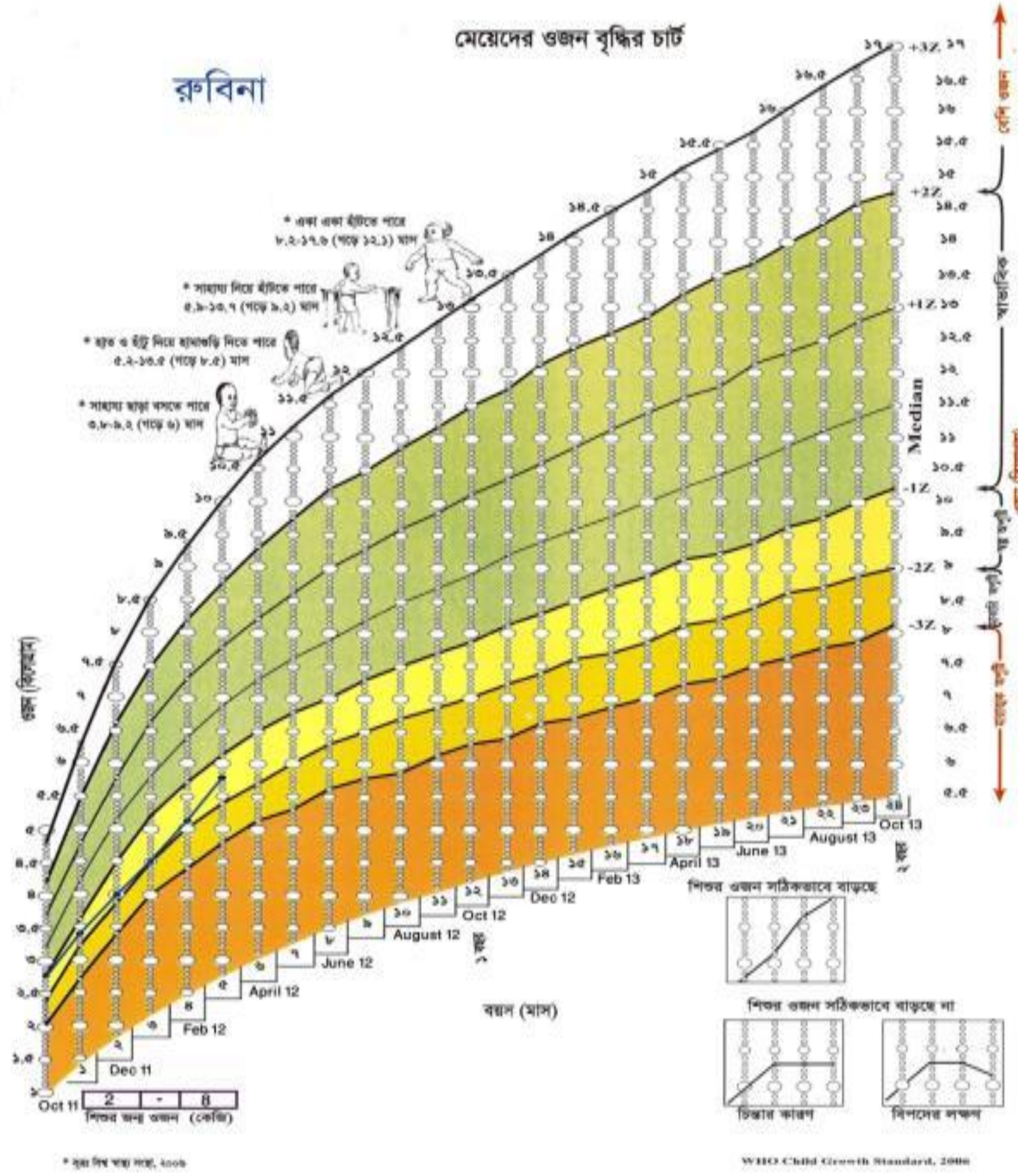

নমুনা-১ঃ রুবিনার ওজন রেখা

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ডে ওজন বসানো ঃ

সংশ্লিষ্ট নমুনা কার্ডে (নমুনা-১) রুবিনার পুষ্টির অবস্থা দেখানো হয়েছে। রুবিনার জন্ম ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে। জন্মের সময় তার ওজন ছিল ২.৮ কেজি। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে, অর্থাৎ দুই মাস বয়সে তার

ওজন ছিল ৪ কেজি। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ডে এই ওজন বসানোর জন্য ডিসেম্বর ২০১১ এর কলাম ধরে ৪ কিলোগ্রামের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এই স্থানে কলামের কেন্দ্র বিন্দুতে যে বুদবুদ আছে তা পেন্সিল দিয়ে ভরে ফেলতে হবে, যাতে করে ওজনের এই অবস্থানটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

জানুয়ারী ২০১২ রুবনার ওজন ছিল ৪.৫ কেজি। এই ওজন বসানোর জন্য জানুয়ারী ২০১২-এর কলাম বের করে এবং কলাম ধরে আঙ্গুল ৪.৫ কেজির ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে এবং ঐ বুদবুদে পেন্সিলের দাগ দিয়ে ভরে ফেলতে হবে। এখন আগের মাসে কার্ডে যে বুদবুদ ভরে ফেলা হয়েছিল তার সাথে রেখা একে এই বুদবুদ যোগ করতে হবে। এই রেখাকে শিশুর ওজন রেখা বলে।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রুবিনার ওজন ছিল ৫.১ কেজি। এখন তার ওজন ৫ কেজি এবং এর উপরে ৫০০ গ্রাম দাগের মাঝে। এই অংশ ৪টি ছোট বুদবুদ দিয়ে ভাগ করা আছে। এই প্রতিটি বুদবুদ ১০০ গ্রাম ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে ৫ কিলোগ্রামের পর প্রথম সমতল রেখার উপর যে বুদবুদ পাওয়া যাবে সেখানে ৫.১ কিলোগ্রাম ধরতে হবে। ফেব্রুয়ারী ২০১২ এর কলাম অনুসরণ করে আপনার আঙ্গুল এই বিন্দুতে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে বুদবুদটি পূরণ করতে হবে। এখন আগের মাসের পূরণ করা বুদবুদের সাথে এই বুদবুদ রেখা দিয়ে যোগ করতে হবে।

২০১২ সালের মার্চ মাসে রুবিনার ওজন ছির ৫.৮ কেজি। এখন শিশুর ওজন ৫.৫ কেজি এবং ৬ কেজির মধ্যে পড়বে। আপনার আঙ্গুল মার্চ ২০১২ এর কলাম বরাবর উপরে নিয়ে এবং ৫.৮ কেজির ঘরে বুদবুদে দাগ বসাতে হবে। এই ঘরের বুদবুদ পূরণ করতে হবে। আগের মাসের বুদবুদের সাথে রেখা দিয়ে এই বুদবুদ যোগ করতে হবে।

শিশুর ওজন রেখা গতি ব্যাখ্যা করা ঃ

মাসে মাসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ডে বসানো ওজনের ফোঁটা যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায়, সেটাই শিশুর ওজন রেখা। এই রেখাটি ঊর্ধ্বমুখি, সমতল বা নিম্নমুখি হতে পারে। প্রতি মাসে শিশুর ওজন বৃদ্ধির ধরণের উপর নির্ভর করে তার ওজন রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখি, সমতল অথবা নিম্নমুখি হবে। ওজন রেখা বলে দেবে শিশুটির শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক কি না।

রেখা ব্যাখ্যা করা ঃ

নমুনাতে রুবিনার স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ড দেখানো হয়েছে। রুবিনার ওজন রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখি। ঊর্ধ্বমুখি ওজনরেখা থেকে বুঝা যায় শিশুর ওজন বাড়ছে এবং তার শারীরিক বৃদ্ধি ঘটছে।

নমুনা-২-এ নকশায় মতিনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ড দেখানো হয়েছে। মতিনের জন্ম ২০১১ সালের মার্চ মাসে। জন্মের সময় তার ওজন ছিল ৩.৪ কেজি। এই কার্ডে দেখা যায় যে মার্চ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত মতিনের বৃদ্ধি ভালই ছিল। এ সময় তার ওজন রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখি। জুন ২০১১-এর পর থেকে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত তার

ওজন রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখি হলেও বৃদ্ধির হার কমে গেছে। অক্টোবর ২০১১-এর পর থেকে জানুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত ওজন রেখার গতি নিম্নমুখি। ওজন রেকার নিম্নমুখি গতি থেকে বুঝা যায় যে শিশুর ওজন কমে গেছে, যা মারাত্মক খারাপ অবস্থা।

ওজন রেখার গতির সাথে রঙের ব্যান্ডের সম্পর্ক ঃ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকার্ডে (নমুনা দেখুন) মোট চারটি রং-এর ব্যান্ড বা গোছা আছে। এগুলো হলো, লাল, কমলা, হলুদ ও সবুজ। এই রঙের ব্যান্ড পুষ্টির অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় বোঝায়। সাধারণভাবে স্বাভাবিক ও সুস্থ সবল শিশুর ওজন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডের উপরে ব্যান্ডের উপরেও থাকতে পারে।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ডে চারটি রংয়ের ব্যান্ডের মধ্যে তিনটি আড়াআড়ি রেখা আছে। সবুজ রঙের ব্যান্ডের মধ্যে পড়লে তাকে স্বল্প অপুষ্টি, কমলা রঙের ব্যান্ডের মধ্যে পড়লে মাঝারি অপুষ্টি এবং লাল রঙের ব্যান্ডের মধ্যে পড়লে তাকে মারাত্মক অপুষ্টি হিসেবে ধরা হয়।

শিশুর ওজনরেখা যদি একই রঙের উপরের দিকে উঠে অথবা নিজের রং ছেড়ে উপরের রঙে উঠে তখন বুঝা যায় যে শিশুর ওজন বাড়ছে। আবার শিশুর ওজনরেখা যদি নিজের রঙ ছেড়ে নিচের রঙে নামে তখন বুঝতে হবে যে শিশুর ওজন সঠিকভাবে বাড়ছে না। এরকম অবস্থা চিন্তার কারণ এবং বিপদের লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়।

শিশুর ওজন যদি স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে কোন অপুষ্টির স্তরে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, বয়সের তুলনায় অন্যান্য সুস্থ শিশুদের চেয়ে তার বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এবং শিশুর জীবনে বিভিন্ন সময়ে এই অপুষ্টি দেখা দিতে পারে। যেমন শিশুর হয়তো জন্মই হয়েছে কম ওজন নিয়ে, সে হয়তো বেশ কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগেছে, তাকে দেরী করে বাড়তি খাবার দেয়া হয়েছে অথবা সে হয়তো যথেষ্ট খাবারই পায় না। তবে এই শিশুর পুষ্টি স্বাভাবিক অবস্থার নিচে থেকেও যদি প্রতিমাসে তার পর্যাপ্ত ওজন বাড়ে এবং তার ওজন রেখা যদি উপরের দিকে যেতে থাকে, তবে বুঝা যাবে যে শিশুটি ভালভাবে বাড়ছে।

শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড দেখে বোঝা ঃ

১. **শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঃ**

- ওজন রেখা একই রঙের অর্থাৎ সবুজ ব্যান্ড বা তার উপরের ব্যান্ড অনুসরণ করে ঊর্ধ্বমুখীভাবে প্রতিমাসে বাড়তে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে।

২. **অসন্তোষজনক বৃদ্ধি ঃ**

- যদি ওজন বৃদ্ধি অল্প হয় এবং যদি ওজন রেখা নিচের রঙ এর ব্যান্ডে নেমে আসে
- যদি পরবর্তী মাসে কোন ওজন না বাড়ে এবং ওজন রেখা সমতল থাকে
- যদি গত মাসের থেকে বর্তমান মাসে ওজন কমে যায় এবং ওজনরেখার গতি নিম্নমুখি হয়
- ওজনরেখা যদি দ্রুত নিম্নমূখী হয়।

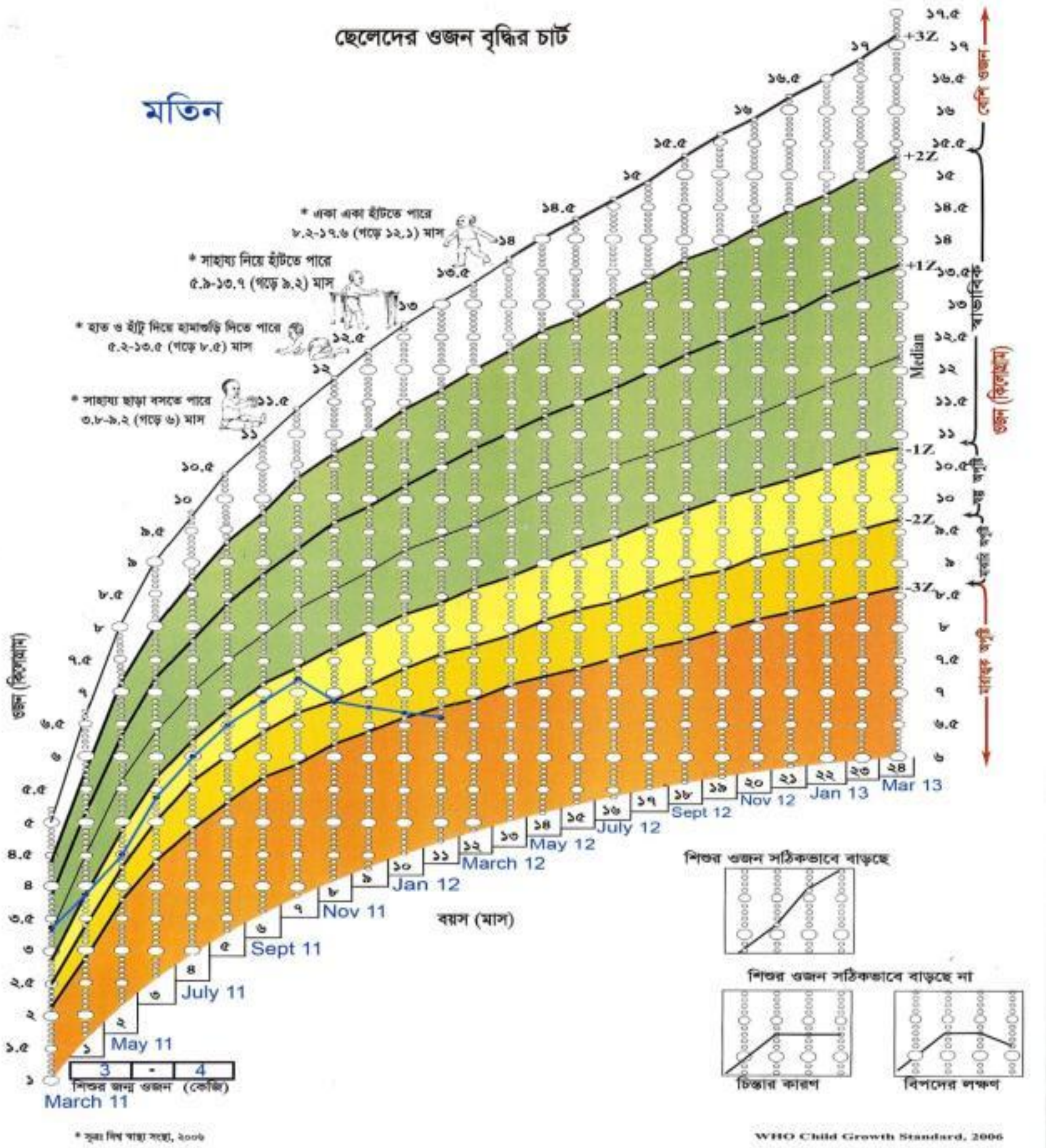

নমুনা -২ মতিনের ওজন রেখা

মায়ের সাথে শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা ঃ

ওজনরেখা বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্যকর্মী শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা বা উন্নতি করার জন্য কি করা উচিত সে বিষয়ে মাকে ধারণা দিতে পারবে। অপুষ্টির সমস্যা থাকলে সম্পূরক খাবার খাওয়ানো ও বাড়তি যত্নের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী মাকে পরামর্শ দেয়। যেমন ঃ

- পূর্ণ ৬ মাস পর্যন্ত শিশুতে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো
- ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে বয়স অনুযায়ী পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানো
- খাবার তৈরীর আগে, খাওয়ানোর আগে নিজের এবং শিশুর হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া
- শিশুর কোন অসুস্থতা থাকলে তাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে।

প্রতি মাসে শিশুর ওজন নেয়ার গুরুত্ব ঃ

- প্রতিমাসে শিশুর ওজন বাড়ে। এই ওজন বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না জানার জন্য প্রতিমাসে শিশুর ওজন নেয়া হয়
- চোখে দেখে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া বোঝার অনেক আগেই ওজন থেকে শিশুর অবস্থা জানতে পারা যায় এবং সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অপুষ্টি প্রতিরোধ করা যায়।
- নিয়মিত ওজন নেয়া হলে শিশুর ওজনে খুব সামান্য পরিবর্তনও ধরা সম্ভব। প্রতিমাসে ওজন মাপা হলে, শিশুকে অপুষ্ট মনে হবার আগেই ওজন কমার কারণ নির্ণয় করে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্ড সংরক্ষণ ঃ

কার্ডটি যথাযথভাবে পূরণ করে স্বাস্থ্যকর্মী কার্ডটি সম্বন্ধে মা'কে বিস্তারিত ধারণা দেবে, যাতে মা কার্ডটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, কার্ডটি শিশুর মায়ের নিকট সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিমাসে শিশুর ওজন নেয়ার সময় মাকে কার্ডটি সাথে আনার পরামর্শ দিতে হবে।

সংযুক্তি: চিত্র- ১

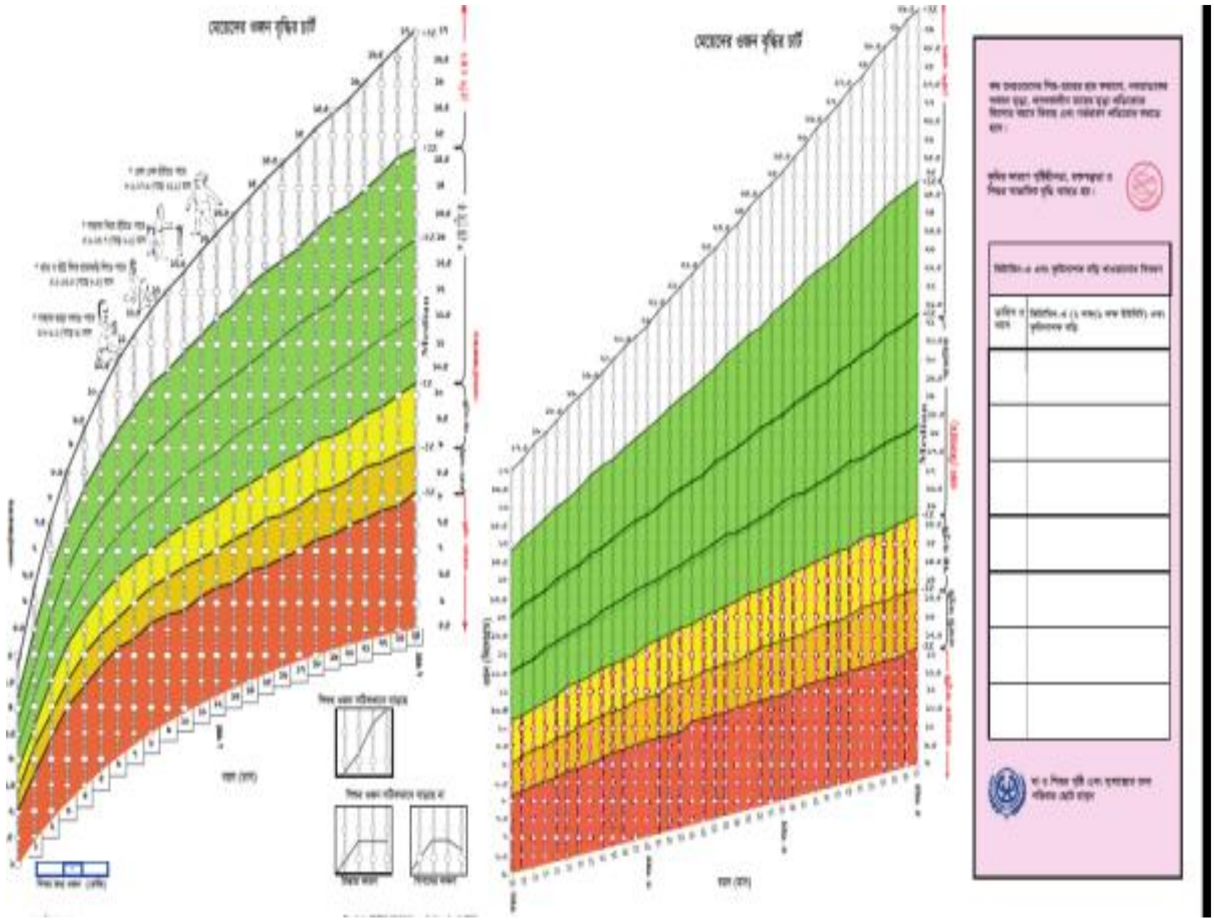

সংযুক্তি: চিত্র- ২

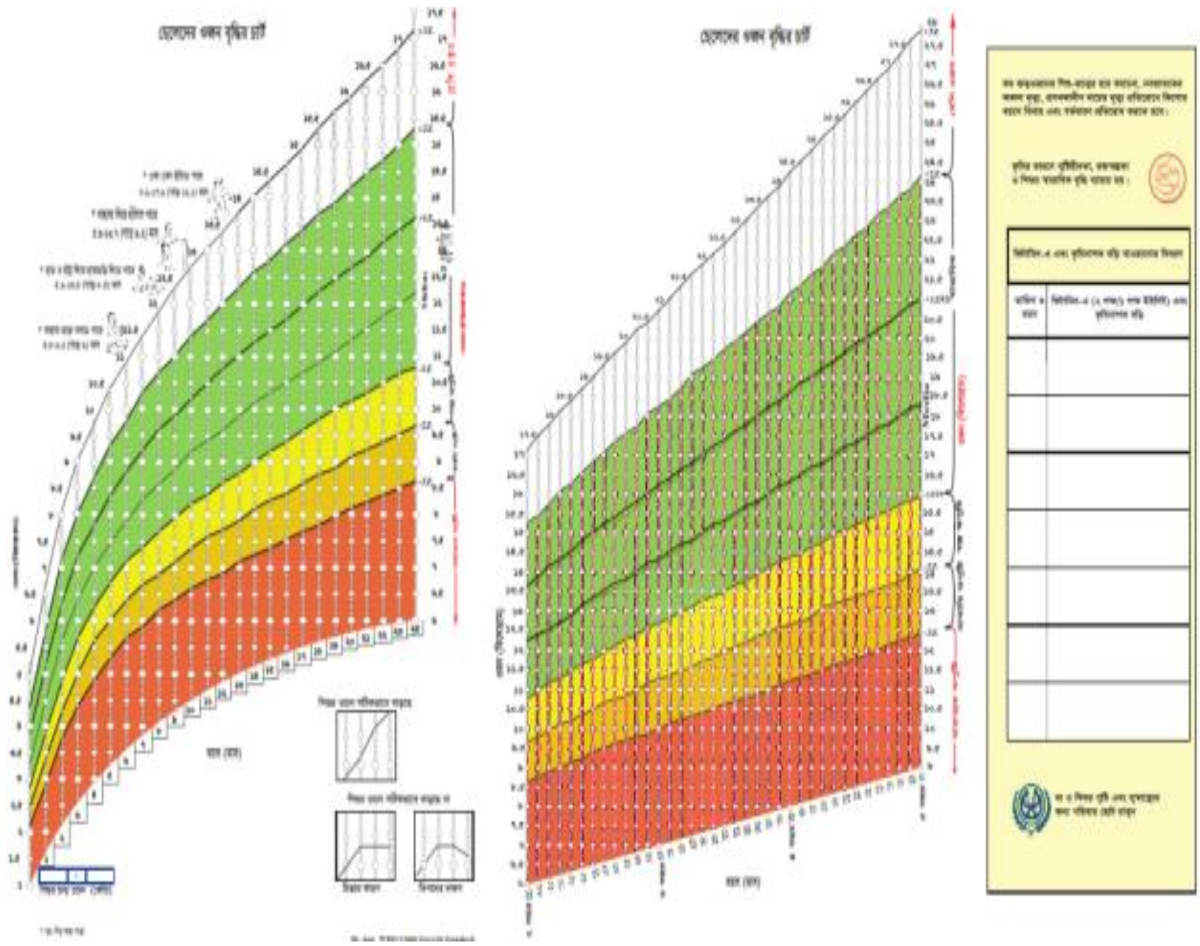

সংযুক্তি: চিত্র- ৩

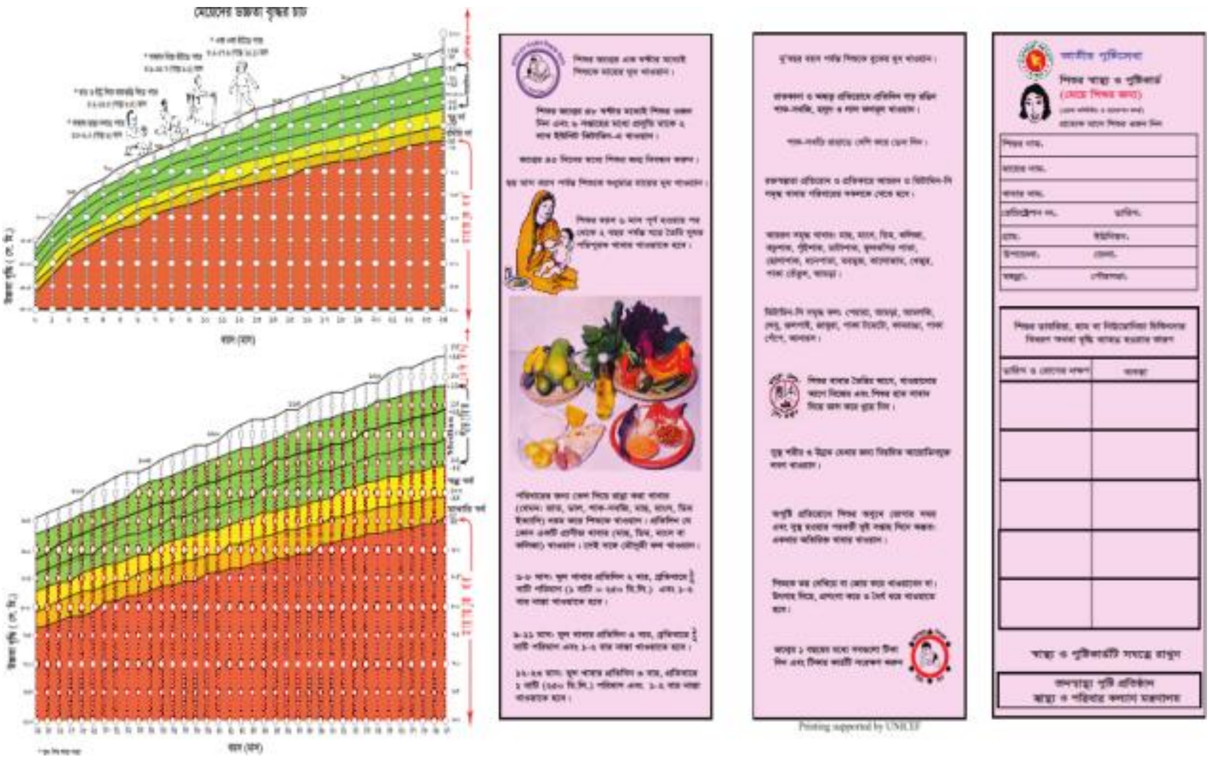

সংযুক্তি: চিত্র- ৪

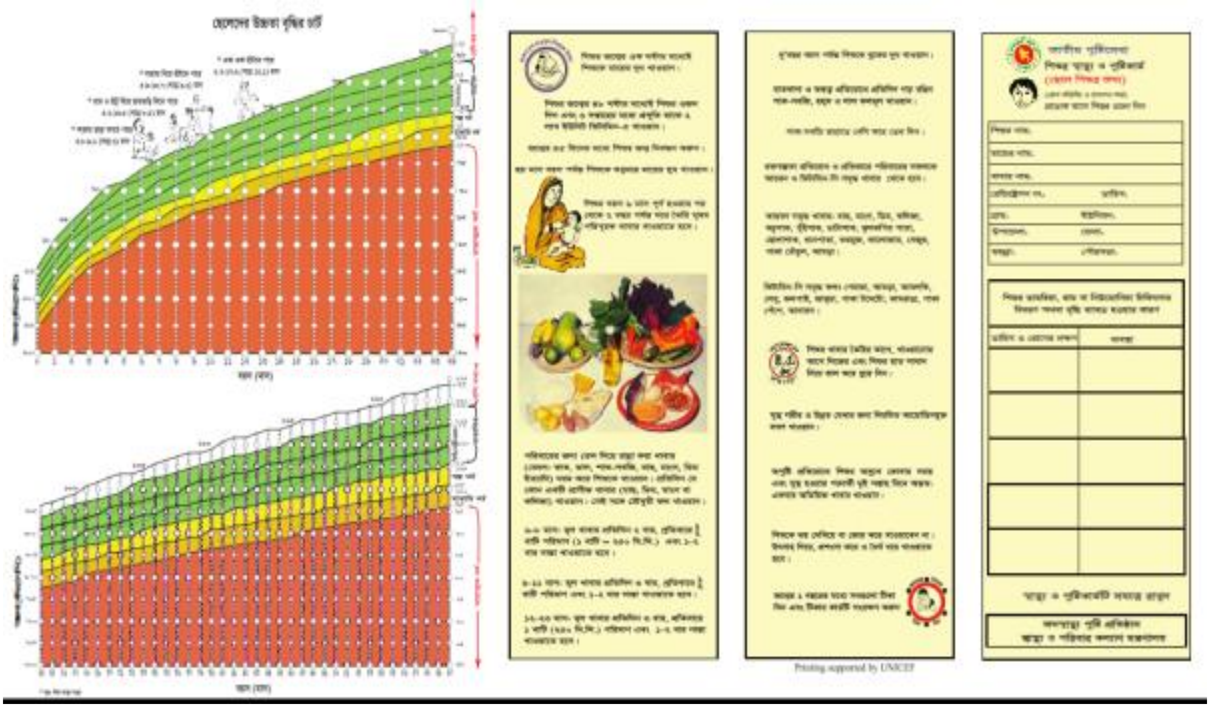

পাঠ-৬
শিশুর ক্রমবৃদ্ধি সংক্রান্ত মায়েদের পুষ্টি শিক্ষা

শিশুর বিকাশমান শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে খাদ্য সম্পর্কীয় পরামর্শ দান বা পুষ্টি শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলতঃ শিশুদের ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও উৎসাহদান কার্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষাকে সরাসরি উৎসাহদান পর্যায়ে গণ্য করা হয়। এই উৎসাহ দান পর্যায়টিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) প্রাপ্ত ওজনের ভিত্তিতে পুষ্টিহীনতার ধাপ নির্ণয়পূর্বক মাকে যথাযথ খাদ্য সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করা।

খ) শিশু স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রচার করা।

ক) মাকে যথাযথ খাদ্য সম্পর্কিত পরামর্শ ঃ

১। পরিবারের আর্থিক অবস্থার সংগে সংগতি রেখে কম ওজন সম্পন্ন শিশুদের জন্য বারে বারে খাবার দিতে হবে এবং আস্তে আস্তে খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে।

২। সাধারণভাবে গঠন ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য এবং শক্তিদায়ক খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তবে স্থানীয় খাদ্য প্রাপ্তি এবং আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করেই এই সকল খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।

৩। সম্ভব হলে আস্তে আস্তে তেল জাতীয় খাবার বাড়াতে হবে।

৪। একই সংগে শাক-সবজি ও ফলের আবাদ করে অথবা বাজার থেকে ক্রয় করে শিশুকে যথাসম্ভব খাওয়াতে হবে।

৫। পরিবারে খাবার বন্টনে শিশুকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬। খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার দূর করতে হবে।

৭। শিশুকে টাটকা খাবার দিতে হবে এবং ফলমূল নিরাপদ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।

]

খ) শিশুর পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

মাকে নিম্নোক্তভাবে শিশু খাদ্য সম্পর্কিত পরামর্শ দেয়া যায়-

	এক বৎসর পর্যন্ত		এক হতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত

ক)	জন্মের পর পরই নবজাতককে মায়ের বুকের প্রথম দুধ (শাল দুধ) বা কলোষ্ট্রাম দিতে হবে।	ক)	দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্যান্য খাদ্যের সংগে সংগে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।
খ)	শিশুর বয়স ৬ মাস পর্যন্ত শিশুর শারীরিক চাহিদা মেটাতে শুধুমাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট।	খ)	শিশুর বয়স এক বৎসর হলেই তাকে পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিমাণ মত দিতে হবে।
গ)	ছয় মাস বয়স থেকে শিশুকে পরিপূরক খাবার অর্থাৎ খিঁচুড়ী, সুজি, সিদ্ধ আলু, ডিমের কুসুম, পাকা কলা, পাকা পেঁপে ইত্যাদি খাওয়ানো শুরু করতে হবে। একই সংগে মায়ের দুধও খাওয়াতে হবে।	গ)	শিশুকে বারে বারে খাবার খাওয়াতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের খাবারের সংমিশ্রণে খাবারের গুণগতমান উন্নয়ন করতে হবে।
ঘ)	শিশুকে নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে এবং নিরাপদ পানি দিয়েই তার থালা বাসন ধুতে হবে।	ঘ)	শিশুকে নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে এবং নিরাপদ পানি দিয়েই তার থালা বাসন ধুতে হবে।
ঙ)	শিশুকে সুষম ও ক্যালরী সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিতে হবে।	ঙ)	শিশুকে সুষম ও ক্যালরী সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিতে হবে।
চ)	শিশুকে খাবার দেয়ার পূর্বে মা হাত ধুয়ে নিবে।	চ)	খাবারের পূর্বে শিশুর হাত ধুতে হবে।

পাঠ-৭

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য:

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে।

পুষ্টি:

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য, শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

পুষ্টিকর খাদ্যঃ

যে সব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম ও নিরোগ থাকে তা-ই পুষ্টিকর খাদ্য।

খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই হতে হবে পুষ্টি সম্মত এবং নিরাপদ। পুষ্টি সম্মত খাদ্য গ্রহন না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরেবিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। পুষ্টি সম্মত খাবার গ্রহন করলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে।

খাদ্য উপাদান ও উৎসঃ

খাদ্যের যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহের কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করে সে গুলোই খাদ্য উপাদান নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী সকল খাদ্য উপাদানকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে-

১) শ্বেতসার বা শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)
উৎসঃ ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ,চিনি, মধু ইত্যাদি

২) তেল ও চর্বি
উৎসঃ তেল, মাছ - মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি ইত্যাদি

৩) আমিষ (প্রোটিন)
উৎসঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি

৪) ভিটামিন
উৎসঃ দুধ, ডিম, কলিজা, সব ধরনেরশাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি

৫) খনিজ উপাদান
উৎসঃ মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক- সব্জি, লবণ ইত্যাদি

৬) পানি

এই ৬টি উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণে ও সঠিক মাত্রায় আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে থাকতে হবে। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে এদের অনুপস্থিত হলে শরীরে ঐ নির্দিষ্ট উপাদানের ঘাটতি জনিত লক্ষন প্রকাশ পায়। এ ঘাটতি বেশী দিন থাকলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণীবিভাগঃ

খাদ্যের কাজ অনুযায়ী শরীরের প্রধানত তিন ধরণের খাবারের প্রয়োজন হয়ঃ

১) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যঃ (শর্করাওচর্বি জাতীয় খাবার যেমনঃ ভাত, রুটি, আলু, গুড়, চিনি, মিষ্টিআলু, পাউরুটি, তেল, মাখন, ঘি, চর্বি, মধু, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, নারকেলইত্যাদি)

২) শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্যঃ (আমিষ জাতীয় খাবার যেমনঃ মাছ, মাংস, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, দুধ, ডিম, সিমের বীচি, ছোটমাছ, বড়মাছ, কলিজাইত্যাদি)

৩) রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্যঃ (ভিটামিনওখনিজসম্মৃদ্ধখাবার যেমনঃগাঢ় হলুদ ও সবুজ রঙের সব ধরনের শাক ও ফলমূল, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপেঁ, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা ইত্যাদি)

ভাত

াদ্য

লাল শাক

সুষম খাদ্য ও এর তৈরীর কৌশলঃ

সুষম খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য যাতে খাদ্যের সব পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজনমত, বয়স ও লিঙ্গ ভেদে সঠিক মাত্রায় থাকে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য হলো এমন একটি খাবার যা শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধক। প্রত্যেকের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে যে সে কি ধরনের সুষম খাবার খেতে পারে। বেশি খরচ করে যেমন সুষম খাবার খাওয়া যায়, তেমনি অল্প খরচেও সুষম খাবার খাওয়া যায়।

সুষম খাদ্য

তিনে মিলে এক হয়
সুষম খাবার তারে কয়।

খাদ্য পিরামিড

খাবারে বৈচিত্র্যঃ

কিভাবে খাবারে বৈচিত্র্য আনা যায়:

- খাবার এমন হতে হবে যেন সেই খাবার পরিমাণে সঠিক হয় এবং সব রকম পুষ্টি থাকে
- পরিমাণ মত/উপযুক্ত অর্থাৎ এই সব খাবার যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি, আমিষ এবং অনুপুষ্টির (micro nutrient) চাহিদা পূরণ করে
- একই খাবার খেতে ভাল লাগে না তাই মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাবার দেয়া ভাল, এতে খাবারের রুচি বাড়ে

মনে রাখতে হবে:

- মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা অথবা ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি জাতীয় খাবার প্রতিদিন খেতে হবে যা দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরনে সহায়তা করে
- গাঢ় সবুজ শাক-সব্জি, লাল ও হলুদ রঙের ফল এবং বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি ও ফল (যেমন- কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, ডাটা শাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর এবং পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি) এগুলোর যে কোন এক প্রকার শাক-সব্জি ও ফল প্রতিদিন অবশ্যই খেতে হবে কারণ এই সব খাবার থেকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায় যা শরীরকে অসুখ বিসুখ এর হাত থেকে রক্ষা করে
- ১ কাপ দুধ অথবা দুধের তৈরি খাবার প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে ৩-৪ দিন খেতে হবে
- অবশ্যই আয়োডিন যুক্ত লবন দিয়ে সব রকম রান্না করতে হবে

পাঠ-৮
অনুপুষ্টি

অনুপুষ্টি:

মুখ্য পুষ্টি উপাদানসমূহ যেমন-শক্তিদায়ক খাদ্য(শর্করা), বৃদ্ধিকারক খাদ্য(আমিষ) এবং অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ যেমন- ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানসমূহ এ সব নিয়েই হয় স্বাস্থ্যকর খাবার। এখানে ম্যাক্রো(মুখ্য) বলতে "বড়" এবং মাইক্রো বলতে "ছোট" বুঝানো হয়। ভালভাবে কাজ করার জন্য আমাদের শরীরে যে সকল অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ প্রয়োজন, এই অধিবেশনে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ আমাদের অতি সামান্য পরিমানে প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করা না হলে একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। সাধারণত প্রতিদিন ১০০মিলি এর বেশি বা কম হলে মুখ্য ও অনু বলা হয়।

অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ-

খাদ্যে অনেক ধরনের অনুপুষ্টি আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

- ভিটামিন এ
- ভিটামিন বি **(**কমপ্লেক্স**)**
- ভিটামিন সি
- ভিটামিন ডি
- আয়রণ
- আয়োডিন
- জিংক
- ক্যালসিয়াম

ভিটামিন- এ:

ভিটামিন-এ চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিনগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন যা শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন-এ উৎস:

প্রাণীজ উৎস:মায়ের দুধ, কলিজা, ডিমের কুসুম, ছোট মাছ, মাছের তেল, মাখন, ঘি। প্রানীজ উৎস থেকে ভিটামিন এ গ্রহন করলে তা আমাদের শরীরে দ্রুত শোষিত হয়।

উদ্ভিজ উৎস: হলুদ রঙের ফল- পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, পাকা পেঁপে এবং সব ধরনের গাঢ় শাক-সব্জি যেমন- গাজর, মিষ্টি কুমড়া, কচু শাক, মূলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ধনে পাতা, পুঁই শাক, কলমি শাক, সজনে শাক, লাল শাক, পাট শাক, পালং শাক, থানকুনি পাতা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি।

মাখন কলিজা

পাকাকাঁঠাল

পাকা পেঁপে পাকা আম

গাজর

পালং শাক লাল শাক মিষ্টি কুমড়া

কচু শাক পুঁই শাক কলমি শাক

চিত্র: ভিটামিন-এ এর উৎস

ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যা:

- চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে রাতকানা,চোখে ঘাঁও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়এমনকিচোখ অন্ধ পর্যন্তহয়ে যেতে পারে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হয়এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।
- দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়

ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ:

- গর্ভাবস্থায় মায়েদের ভিটামিন-এ এর চাহিদা বেড়ে যায়, এজন্য ভিটামিন-এ এর অভাব পূরণের জন্য গর্ভবতী মায়েদের ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার যেমন-গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, হলুদ ফলমূল, সম্ভব হলে মাছ, ডিম, কলিজা, মাংস বার বার বেশি পরিমাণে খেতে দিতে হবে। এ সমস্ত খাদ্য খেলে শরীরে ভিটামিন-এ এর চাহিদা মিটবে এবং গর্ভস্থ শিশুর কোন ক্ষতি হবেনা
- প্রসূতি মা সন্তান প্রসবের (৪২ দিনের) মধ্যে (সম্ভব হলে শিশুর জন্মের পর পর) ২ লক্ষ আই.ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লাল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
- নবজাতক শিশুকে শালদুধ খাওয়ানোসহ ৬ মাস পর্যন্তশুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়াতে হবেএবং৬ মাস বয়সের পর থেকে ভিটামিন-এ সম্মৃদ্ধ বাড়তি খাবার দিতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ভিটামিন-এ যুক্ত খাবার (মাছ-বিশেষ করে ছোট মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম), হলুদ ও গাঢ় রঙের শাক-সব্জি ও ফলমূল খেতে দিতে হবে। শিশুরা যেভাবে পছন্দ করে খাবারগুলো সেভাবে তৈরী করতে হবে। শাক-সব্জি অবশ্যই পরিমাণ মত তেল দিয়ে রান্না করতে হবে, কারণ ভিটামিন-এ দেহে শোষণের জন্য তেলের প্রয়োজন হয়। ভিটামিন এযেহেতু(Fat soluble)চর্বিতে দ্রবনিয়,তেল না হলে সবজী থেকে কোন লাভ পাওয়া যাবেনা।

- ৬-১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে ১ লক্ষ আই.ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নীল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
- ১-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর ২ লক্ষ আই.ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লাল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
- পাশাপাশি সকলকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার সর্ম্পকে পুষ্টি শিক্ষা দিতে হবেভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিকার:

রাতকানা, হাম, মারাত্নক অপুষ্টি, দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের বয়স ও রোগ অনুযায়ী ভিটামিন-এ ক্যাপসুল দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

ভিটামিন-এ এর মাধ্যমে সঠিক ডোজসহ চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগ সমূহ	ডোজ/মাত্রা			খাওয়ানোর নিয়ম
	বয়স ৬ মাসএর নিচে	বয়স ৬-১২ মাস	বয়স ১২ মাস +	
রাতকানা, বিটট্স স্পট, জেরোফথালমিয়া	৫০ হাজার আই.ইউ.	১ লক্ষ আই.ইউ	২ লক্ষ আই.ইউ.	১ম দিন, ২য় দিন, ১৪ তম দিন
হামপরবর্তী	৫০ হাজার আই.ইউ.	১ লক্ষ আই.ইউ	২ লক্ষ আই.ইউ.	১ম দিন, ২য় দিন
মারাত্নক অপুষ্টি	৫০ হাজার আই.ইউ.	১ লক্ষ আই.ইউ	২ লক্ষ আই.ইউ.	এক মাত্রা
দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া	৫০ হাজার আই.ইউ.	১ লক্ষ আই.ইউ	২ লক্ষ আই.ইউ.	এক মাত্রা

ভিটামিন-'এ' এর অভাব জনিত সমস্যা (চিত্র):

রাতকানা/অন্ধ

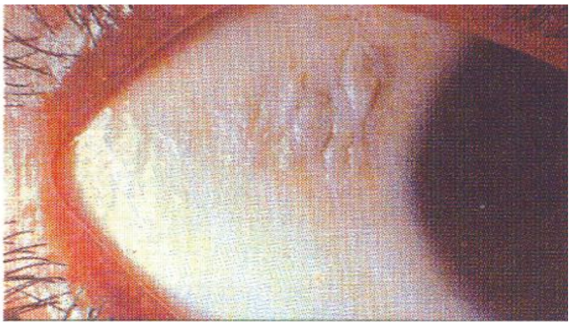

চোখের সাদা অংশে দাগ (বিটট্স স্পট)

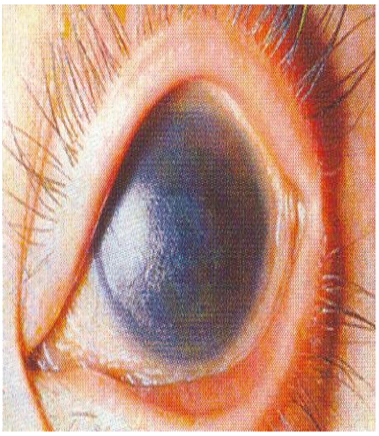

কর্নিয়ার শুস্কতা

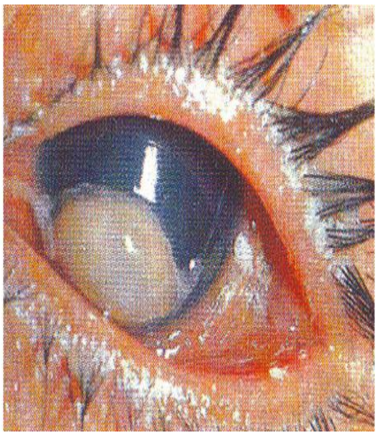

কর্নিয়ার ঘা

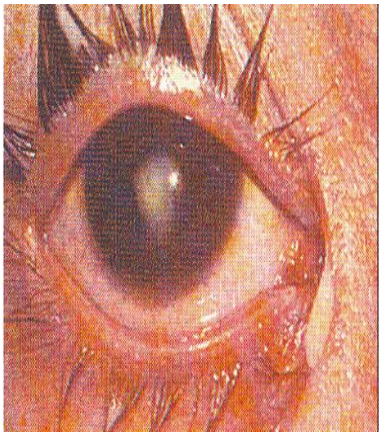

কর্নিয়ার ঘায়ের স্থায়ী দাগ

*আই.ইউঃ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট

**ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে ও আর এস (খাবার স্যালাইন) ও জিংক ট্যাবলেট/ সিরাপ দিতে হবে

আয়রণঃ

আয়রণ একটি খনিজ উপাদান যা রক্তের একটি গুর‍ুত্বপূর্ণ উপাদানহিমোগে- াবিন তৈরীর জন্য অপরিহার্য। এই হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে শরীরের সকল অংশে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন বহন করে, যার কারনে শরীর কর্মক্ষম থাকে।

আয়রণ এর উৎস:

প্রাণীজ উৎস: মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুটকি মাছ ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ উৎস: কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, সাজনা শাক, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল, খেজুর, কালোজাম, তরমুজ, পাকা তেঁতুল, গুড় ইত্যাদি।

চিত্র: আয়রণ এর উৎস

আয়রণ এর অভাবজনিত সমস্যাচিহ্ন ও উপসর্গ:

চোখের আবরণ (কন্‌জাংটিভা), নখের গোড়া এবং নখের পরিবর্তন আসে, হাতের তালু, চেহারা, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়

- নখ ভংগুর হয়, আপনা আপনি ভেঙ্গে যায় এমনকি মধ্যাংশে কমে/দেবে যায় (koilonychia)

- বুক ধড়ফড় করে
- অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি বোধ হয়
- মেজাজ খিটখিটে থাকে
- ক্ষুধামন্দা হয়
- শিশুরা অস্থির চিত্ত হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ কমে আসে

রক্তস্বল্পতাবা অ্যানিমিয়া কি:

অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতা বলতে আমরা প্রধানত আয়রণের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতাকেই বুঝি, এই ধরনের রক্তস্বল্পতাই আমাদের মাঝে ব্যাপক আকারে বিদ্যমান। রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন/ লোহিতবা লালরক্ত কণিকার পরিমাণ কমে যাওয়াকে রক্তস্বল্পতা বলে।

প্রয়োজনীয় খাবার, বিশেষ করে আয়রণ সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা এই রোগে বেশি ভোগে। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় প্রধানত আয়রণসমৃদ্ধ খাবারের অভাবে । মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে এবং ঘন ঘন সন্তান হওয়ার কারনেও মহিলারা রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

আয়রণ ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার:

- আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার যেমন- মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুটকি মাছ, কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, সাজনা শাক, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল ইত্যাদি খেতে হবে ।
- শরীরে আয়রন কাজে লাগানোর জন্য আয়রণ জাতীয় খাবারের সাথে ভিটামিন সি যুক্ত (যেমন-লেবু বা টক ফল)খাবার খেতে হবে।
- শিশুকে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি আয়রন সমৃদ্ধবাড়তি খাবার দিলে শিশুর আয়রনের ঘাটতি পূরন হবে।
- বাড়ন্ত শিশু, কিশোর-কিশোরী, মাসিক চলাকালীন, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে আয়রণের প্রয়োজন। তাই তাদেরকে বেশি করে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।
- সংক্রমণ রোগ যেমন- কৃমি, রক্ত আমাশয়, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির কারণেও রক্তস্বল্পতা হয় এজন্যমল, মূত্র নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা এবং মল মূত্র ত্যাগের পরে দুই হাত ভাল করে সাবান ও পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। খাওয়ার আগে দুই হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা এবং খালি পায়ে না হাঁটা।
- এছাড়াও মনে রাখতে হবে যে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস অন্তরঅন্তর কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে।
- দুপুর এবং রাতের প্রধান খাবারের সাথে চা ও কফি না খাওয়া।

আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবন:

গর্ভবতী, প্রসূতি মা, কিশোরী এবং মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুকে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেটের মাত্রা ও মেয়াদ (Dose & Duration) নির্ধারিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে তা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী (Target Group)	মাত্রা (Dose)	মেয়াদ (Duration)
কিশোরী (১৩-১৯ বছর) ও গর্ভবতী নয় এমন মহিলা	আয়রণ ফলিক এসিড সপ্তাহে-০২টি ট্যাবলেট	০৩ মাস চলবে, পরবর্তী ০৩ মাস বন্ধ থেকে পুণরায় ০৩ মাস চলবে
গর্ভবতী মহিলা	আয়রণ ফলিক এসিড দৈনিক-০১টি ট্যাবলেট	গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে পুরো গর্ভকালীন সময়
দুগ্ধদানকারী মহিলা	আয়রণ ফলিক এসিড দৈনিক-০১টি ট্যাবলেট	প্রসবের পর ০৩ মাস পর্যন্ত
শিশু (০৬-২৪ মাস)	আয়রণ ফলিক এসিড দৈনিক-০১ বার অথবা মাইক্রোনিউট্রেন্ট পাউডার (MNP-05 ingredients) দৈনিক ০১ (Sachet) খাবারের সাথে	০২ মাস চলবে পরবর্তী ০৪ মাস বন্ধ থেকে পুণরায় ০২ মাস চলবে।
শিশু (০২-০৫ বছর)	আয়রণ ফলিক এসিড সপ্তাহে- ০১ বার	০৩ মাস চলবে পরবর্তী ০৩ মাস বন্ধ থেকে পুণরায় ০৩ মাস চলবে।
শিশু (০৫-১২ বছর)	আয়রণ ফলিক এসিড সপ্তাহে -০১ বার	০৩ মাস চলবে পরবর্তী ০৩ মাস বন্ধ থেকেপুণরায় ০৩ মাস চলবে।

আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

- কারো কারো বমি বমি ভাব হতে পারে। খাওয়ার সাথে বা খাওয়ার পরে আয়রণফলিক এসিড ট্যাবলেট খেলে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বহুলাংশে কমে যায়
- পায়খানা শক্ত হতে পারে। বেশি বেশি সবজি ও পানি খেলে এই সমস্যা কমে যায়
- ওষুধের কারণে পায়খানার রং কালো হতে পারে, যা খুবই স্বাভাবিক। এতে ভয়ের কিছু নেই।

আয়োডিন:

আয়োডিন হচ্ছে এক প্রকার প্রাকৃতিক খনিজ উপাদান।

আয়োডিনের উৎস:

প্রাকৃতিক: সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলবর্তী শাক-সব্জি এবং শ্যাওলা

কৃত্রিম: আয়োডিনযুক্ত লবণ

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা:

- গলগন্ড বা ঘ্যাগ হয়
- স্বাভাবিকবুদ্ধি বিকাশে বাধা দেয়
- মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধিতা যেমন: হাবাগোবা, মূক, ট্যারা, বধির, খর্বাকায় ইত্যাদি

- গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসব অথবাজন্মের পর পর শিশুর মৃত্যুওহতে পারে

চিত্র: আয়োডিনের অভাব জনিত রোগের লক্ষণ

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধ:

যেহেতু দেহে বেশি পরিমাণ আয়োডিন সংরক্ষণ করা যায় না। তাই নিয়মিত এবং অল্প পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। খাবার লবণের মাধ্যমেই পরিমাণ মত আয়োডিন গ্রহণ করা সহজ, কারণ আমরা সবাই প্রতিদিন পরিমাণ মত লবণ খাই। আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ লবণ খাই তাতে সাধারণত প্রয়োজনীয় পরিমাণ আয়োডিন থাকে।

সবচেয়ে সহজ পথ হলো প্রতিদিনই আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া এবং সব সময় তা পরিবারের সবারই গ্রহণ করা। গৃহপালিত পশুপাখিকেও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ানো উচিত; এতে তাদের থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ, ডিম-এ আয়োডিন পাওয়া যাবে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ খেয়েও আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার ও সংরক্ষণ:

আয়োডিনযুক্ত লবণ রান্নায় এবং খাবারে প্রতিদিনই ব্যবহার করতে হবে। লবণ কেনার সময় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রতীক চিহ্ন দেখে নিতে হবে। স্বাভাবিক রান্নায় লবণের আয়োডিন হ্রাসের পরিমাণ খুবই

কম। তবে রান্নার শেষ মুহূর্তে লবণ ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় অধিক তাপে আয়োডিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাজারের খোলা লবণ কেনা উচিত না। লবণ গলে গেলে তাতে আয়োডিন থাকে না। লবণ রোদে কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে রাখলে আয়োডিনের পরিমান কমে যেতে থাকে। এজন্য লবণ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ ও প্যাকেট করতে হবে এবং লবণে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ সূর্য রশ্মি থেকে দূরে ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বোতল বা পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি যাচাই করার পরীক্ষা:

- এক চা চামচ পরিমাণ লবণ নিন এবং চামচের উপরের বাড়তি লবণ আঙ্গুল দিয়ে ফেলে দিন
- একটি পরিষ্কার প্লেটে লবণ রাখুন
- ৫টি ভাতের দানা নিন। লক্ষ্য রাখুন যেন ৫টির বেশি ভাতের দানা না হয়
- ভাতের দানা লবণের সাথে ভালভাবে চটকে নিন এবং প্লেটের মাঝখানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন
- লবণ মেশানো ভাতের উপর দু'ফোঁটা লেবুর রস দিন এবং লক্ষ্য করুন, যদি লবণের রং বেগুনি হয় তাহলে আপনার লবণে আয়োডিন আছে
- প্রতিবার লবণ কেনার পর উপরের নিয়মে পরীক্ষা করুন

চিত্র:লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি যাচাই করার পদ্ধতি

জিংক:

জিংক হচ্ছে এক প্রকার খনিজ উপাদান।

জিংক এর উৎস:

প্রানীজ: মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম

উদ্ভিজ: খোসাসহ শষ্য, ডাল, বাদাম এবং ঢেঁকি ছাটা চাল

জিংক এর অভাবজনিত সমস্যা:

- শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়
- শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার প্রবনতা বেড়ে যায়
- জননাঙ্গের গঠন ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয়না
- হাড়ের পরিপক্কতা ব্যহত হয়

জিংক এর অভাবজনিত সমস্যারপ্রতিকার ও প্রতিরোধ:

- ডায়রিয়া হওয়ার সাথে সাথে জিংক খাওয়াতে হবে

জিংক ট্যাবলেট ডোজ:

শিশুর বয়স	ডোজ
৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	১ টি ট্যাবলেট (২০মি: গ্রা:) প্রতি দিন- ১০ দিন

ক্যালসিয়াম:

শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ গুলোর মধ্যে অন্যতম ক্যালসিয়াম।

ক্যালসিয়াম এর উৎস:

মায়ের দুধের চেয়ে গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশী থাকলেও মায়ের দুধ শিশুর জন্য ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে উত্তম উৎস কারণ এটি শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম অনেক খাবারেই পাওয়া যায় যেমন- দুধ, দুধ জাতীয় পন্য (পনির, মাখন, দই), ডিম এবং মাছ।

ক্যালসিয়াম এর অভাবজনিত সমস্যা:

- হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয়না
- রক্ত জমাট বাধতে বাধাপ্রাপ্ত হয়
- মাংসপেশীর সংকোচনে বাধাপ্রাপ্ত হয়
- হৃৎযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়
- মায়ের দুধ উৎপাদন ব্যহত হয়
- বয়স্ক মহিলাদের অস্টিওম্যালেসিয়া দেখা দেয়

ক্যালসিয়াম এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ:

- গর্ভকালীন সময়ে এবং ৪০ বছরের পর প্রতিদিন ক্যালসিয়াম ট্যবলেট খেতে হবে এবং বেশী পরিমানে দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার খেতে হবে

পাঠ-৯
দামী ও সস্তা খাবার

খাবার সম্বন্ধে রোগীকে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে অনেক লোক বিভিন্ন পুষ্টির অভাবজনিত রোগে ভুগে। পুষ্টি অভাবজনিত রোগের মূল চিকিৎসা হচ্ছে খাবার। কমিউনিটি প্যারামেডিক হিসাবে রোগীদের খাবার সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

একজন রোগী যখন কেন্দ্রে বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে আসেন তখন তার চেহারা দেখে তার আর্থিক অবস্থা জানতে পারবেন। রোগীর রোগ নির্ণয় করে তার চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত খাবারের পরামর্শ (একটি সঠিক উপযুক্ত বার্তা) দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মনে রাখবেন ক্লায়েন্টকে সঠিক বিশ্লেষণ না করে পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হবে না।

দামী ও সস্তা খাবার

পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার মানেই দামী খাবার নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি দামী খাবার থেকে অনেক পুষ্টি উপাদান বেরিয়ে যায়। আমিষের জন্য আমরা যেমন দামী খাবার, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাই তেমনি আমিষযুক্ত সস্তা খাবার যেমন- ছোট মাছ, ডাল, সিমের বীচি, বাদাম এগুলোও খেতে পারি। ঘি-মাখন প্রভৃতি থেকে যেমন ক্যালোরী বা খাদ্যশক্তি পাই তা আমরা সস্তা খাবার তেল, আলু, ভাত, গম, কচু ইত্যাদি থেকেও পেতে পারি।

দামী খাবার ও তার সমমানের সস্তা খাবারের একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো ঃ

দামী খাবার	সস্তা খাবার
চাল (মিহি) গম (পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি)	চাল (মোটা) গম (আটার রুটি)
মাংস, বড় মাছ (রুই, বোয়াল, কাতলা ইত্যাদি) ডিম	ডাল/সিমের বীচি/মটরশুটি প্রভৃতি, ছোট মাছ, মূল জাতীয় (আলু/গাজর/শালগম ইত্যাদি)
দুধ, ডিম, পনির, কলিজা	মুলা শাক, লাউ শাক, কচু শাক, লাল শাক, পুঁই শাক, সজনা, সজনা পাতা
আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, কমলা, টমেটো, কলা	পেয়ারা, পেঁপে, জামবুরা, আমলকি
মাখন, ঘি	তেল

সুষম খাবার

সুষম খাবার বলতে আমরা এমন খাবারের কথা বুঝি, যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় (বয়স, লিঙ্গ ও পেশা অনুযায়ী) সবগুলো খাদ্য উপাদানই সঠিক পরিমানে থাকবে। যেমন- আমিষ, শর্করা, তৈল, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজলবণ। অর্থাৎ সুষম খাদ্যে শক্তিদায়ক, শরীরবৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক এবং রোগপ্রতিরোধক খাবার পরিমিত পরিমানে বিদ্যমান থাকতে হবে। মোটের উপর দৈনিক খাবার তালিকায় শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী সব রকমের খাবার পরিমান মতো থাকলে খাবার সুষম হবে। দামী ও সস্তা উভয় খাবারই সুষম হতে পারে।

যাদের দামী খাবার কেনার ক্ষমতা আছে তাদের উপর লিখিত ছকের বামপাশে লেখা খাবারের কথা বলুন। কিন্তু যাদের দামী খাবার কেনার ক্ষমতা নেই তাদের ছকের ডান পাশে লেখা খাবারের কথা বলুন।

পাঠ-১০
শিশুর অপুষ্টি

অপুষ্টি:

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কিংবা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অপুষ্টি বলে। আমাদের দেশে সাধারনতঃ খাদ্য গ্রহনের অপর্যাপ্ততার কারণে অপুষ্টি দেখা দেয়।অপুষ্টি একটি বড় ধরণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা,যা প্রতিরোধযোগ্য । বিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিশু পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়এবং এর প্রায় ৪৫ শতাংশই অপুষ্টির কারণে ঘটে।

অপুষ্টির প্রকারভেদ: অপুষ্টিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

(১) **অতিপুষ্টি/স্থুলতা** (Over-nutrition): প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার গ্রহণ অথবা/ এবং কম শারীরিক পরিশ্রমের কারণে অতিপুষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। অতিপুষ্টি ভবিষ্যতেশিশুদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগ সহ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

(২)**কম পুষ্টি** (Under-nutrition): অপার্যপ্ত খাদ্য গ্রহন অথবা/এবং ঘস ঘস সংক্রমনের (রোগ) কারণে কম পুষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থায় সব রকমের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যেমন; আমিষ, শর্করা, তেল, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ ইত্যাদি উপাদানের ঘাটতির কারণে পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা দেয়।

- ওয়েসটিং/ কৃশকায়: উচ্চতা অনুপাতে ওজন কম
- স্টান্টিং/খর্বাকৃতি: বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম
- আন্ডারওয়েট/কম ওজন: বয়স অনুপাতে ওজন কম
- মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুপুষ্টির অভাব

অপুষ্টির প্রধান কারণসমূহ:

- দারিদ্র্য
- খাদ্যের অপর্যাপ্ততা
- কম ওজন নিয়ে জন্ম
- ঘন ঘন অসুস্থতা বিশেষ করে সংক্রামক রোগে ভোগা
- মায়ের পুষ্টি জ্ঞানের ও শিশুর যথার্থ পরিচর্যার অভাব

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর উপসর্গ:

- রোগা, পাতলা শরীর, দেখে মনে হবে বুড়ো হয়ে গেছে
- শিশুটি একেবারে চুপচাপ, দুর্বল এমনকি কান্না করারও শক্তি নেই
- বুকের পাঁজরের হাড় ও শরীরের অন্যান্য হাড় সহজেই চোখে দেখা যায়
- হাতের চামড়াগুলো ঝুলে পড়ে
- খিটখিটে মেজাজ হয়
- পেছন থেকে ঘাড় ও পাজরের হাড় স্পষ্ট চোখে পড়ে এবং শরীরের নীচের অংশের চামড়া ভাজ ভাজ হয়ে ঝুলে পড়ে
- মারাত্মক ধরণের ওজন হ্রাস পেলে মনে হবে পুরো শরীর থেকেই চামড়া ঝুলে পড়েছে। এ ধরণের শিশুদের শরীরের চর্বি ও মাংসপেশী শুকিয়ে যায় এবং একই/সমউচ্চতার আরেকটি সুস্থ শিশুর তুলনায় তার ওজন অনেক কমে যায়
- কারো কারো পা ও শরীরের অন্যান্য জায়গা ফুলে যায়। পায়ের পাতায় চাপ দিলে আঙ্গুল ডেবে যায় (**Bilateral**Pitting Oedema)

বাইল্যাটারাল পিটিং ইডিমা রোগীদের নিচের লক্ষণগুলো থাকতে পারে:

- মুন ফেস বা চাঁদের মতো গোল মুখ
- ডার্মাটোসিস: চামড়ায় সাদা - কালো ছোপছোপ দাগ (মারাত্মক ক্ষেত্রে)
- দুর্বল
- খাওয়ার রুচি নষ্ট হওয়া
- চুলের পরিবর্তন
- খুব সহজে বিরক্ত হয় এবং কাছে গেলে কেঁদে ফেলে

অপুষ্টির ফলাফল:

- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে দেহ দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়
- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা কমে যায়অপুষ্টি দীর্ঘমেয়াদী হলে মারাত্নক অসুস্থতা বা মৃত্যু হতে পারে

- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা:মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি বা স্যাম -এর কারণে মৃত্যু হার অনেক বেশি (প্রায় ৯ গুণ), এ কারণে এ বিষয়টির দিকে সকলেরই বাড়তি নজর দিতে হবে যাতে মারাত্মক তীব্র অপুষ্ট শিশুর মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়
- মাঝারী ও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে চিহ্নিত করে প্রাণঘাতী অবস্থায় পৌছানের আগেই চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা

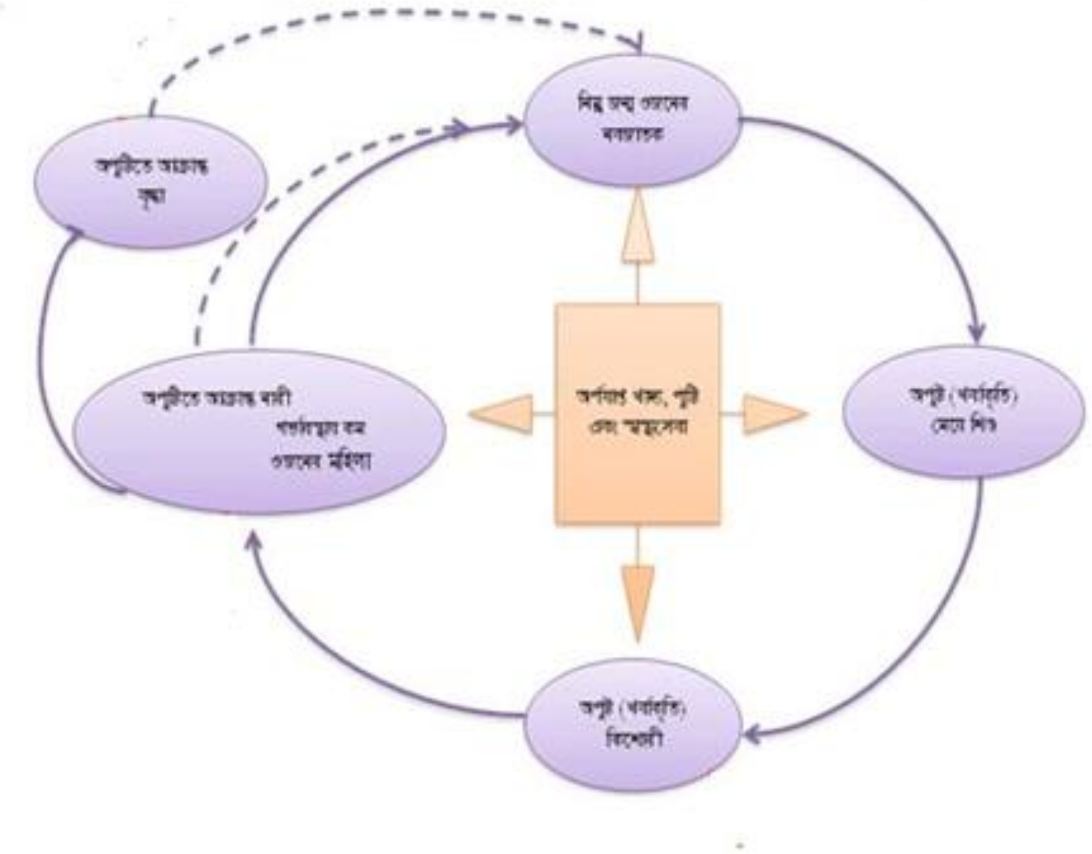

চিত্র:অপুষ্টির চক্র

অপুষ্টির চক্র:

মেয়ে শিশুদের ঠিকমত খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান না করলে তারা খর্বাকৃতি হয়ে বাড়তে থাকে পরর্বতীতে খর্বাকৃতি অপুষ্ট কিশোরী হিসাবে বেড়ে উঠে। বিয়ের পর সে একজন কম ওজনের মহিলা হিসাবে গর্ভধারন করে তার ফলে তিনি কম ওজনের শিশুর জন্ম দেন। সেই কম ওজনের মেয়ে শিশুকে সঠিক খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা না দিতে পারলে সে অপুষ্টিতেভুগবেএবং বিয়ের পর অপুষ্টশিশু জন্ম দিবে, এভাবে মেয়েদের ভিতর অপুষ্টির চক্র ঘুরতে থাকবে, যার ফলাফল ভয়াবহ। আলোচনা থেকে বুঝা গেলযে, অপুষ্টি একটি বড় ধরণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা, যা প্রতিরোধযোগ্য এবং যথাযথ চিকিৎসাযোগ্য।

অপুষ্টির প্রতিরোধ/প্রতিকারের উপায়সমূহ:

শিশুদেরঅপুষ্টি প্রতিরোধে কিশোরী, গর্ভবতী মা এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অপুষ্টি প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে:

- **কিশোরীর অপুষ্টি প্রতিরোধ/প্রতিকারের উপায়:**
  - ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেয়া
  - দেরিতে বাচ্চা নেয়া
  - পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
  - 'আয়রণ ফলিক এসিড' ট্যাবলেট খাওয়া
- **গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের অপুষ্টি প্রতিরোধ/প্রতিকারের উপায়:**
  - গর্ভবতীর সঠিক সেবা
  - পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
  - বিশ্রাম নেয়া
  - 'আয়রণ ফলিক এসিড' ট্যাবলেট খাওয়া
- **শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ/প্রতিকারের উপায়:পুষ্টি:**
  - জন্মের সাথে সাথে (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দেয়া
  - জন্মের পর থেকে পূর্ণ ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দেয়া
  - শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে (১৮১তম দিন) থেকে পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করা
  - শিশুকে ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত পারিবারিক বাড়তি খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া
  - সময়মত সবগুলো টিকা নেওয়া
- **অসুস্থ শিশুর যত্ন: :**
  - এসময় ঘন ঘন মায়ের দুধ দিতে হবে যাতে সে বেশি পরিমাণে দুধ পায়
  - শিশুর অসুস্থতার সময় অল্প অল্প পারিবারিক খাবার বারে বারে দিতে হবে
  - শিশুর অসুস্থতার পর যখন তার ক্ষুধা বেড়ে যাবে তখন কমপক্ষে ১৪ দিন পর্যন্ত তার বাড়তি খাবারের
  - পরিমাণ - বাড়াতে হবে। তাকে বিভিন্ন ধরণের অতিরিক্ত খাবার দিতে হবে

- শিশুর অসুস্থতা বেশী হলে চিকিৎসক অথবা নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে

পাঠ-১১

ভিটামিন-এ অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং জটিলতা

ভিটামিন-এ অভাবজনিত রোগের লক্ষণ এবং চিহ্ন

কমিউনিটি প্যারামেডিক এর একটা প্রধান কাজ হলো শিশুদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব সনাক্তকরণ, তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা এবং প্রতিরোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের যে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ রয়েছে, তা জেনে রাখা উচিত। যখন আপনি অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন, কেবল তখনই আপনি একটি শিশুর অন্ধত্ব রোধ করতে পারবেন।

রাতকানা/অন্ধ

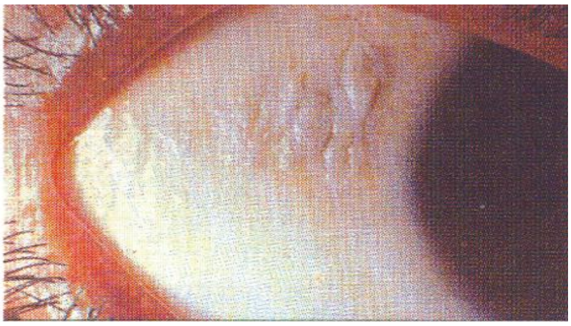

চোখের সাদা অংশে দাগ (বিটট্স স্পট)

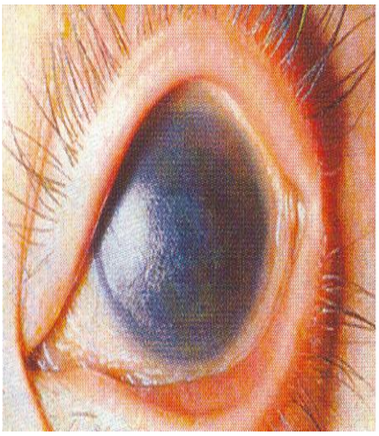

কর্নিয়ার শুস্কতা

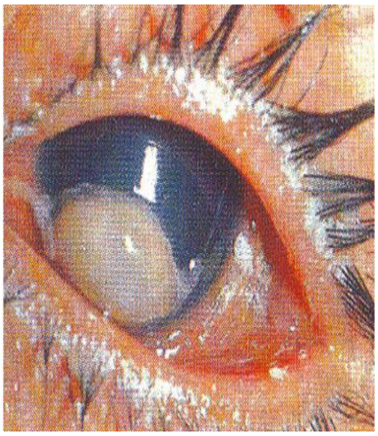

কর্নিয়ার ঘা

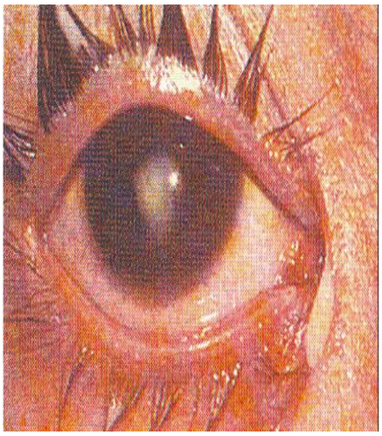

কর্নিয়ার ঘায়ের স্থায়ী দাগ

রাতকানা (Night Blindness)

রাতকানা হল ভিটামিন 'এ' এর অভাবের প্রথম লক্ষণ। সুস্থ চোখ দ্বারা দিনের বেলায় ভালভাবে দেখতে পারা যায়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও সুস্থ চোখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। স্বল্প আলোতেও যাতে চোখে দেখতে পারে তার জন্য চোখের ভিটামিন 'এ' এর প্রয়োজন। একটি শিশু ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভুগলে দিনের বেলায় ভালভাবে দেখতে পায়। কিন্তু রাতে অথবা অন্ধকারে যখন প্রচুর আলো থাকে না তখন আদৌ ভাল দেখতে পায় না কেবল অনুমানে চলাফেরা করে। সে চোখে খাবার দেখতে পায় না বলেই খেতে ও অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশা বা খেলাধুলা করতে চায় না। এ অবস্থাকে রাতকানা বলা হয়।

চোখের সাদা অংশের উপর পরিস্কার আবরণের শুষ্কতা (জেরোফথালমিয়া)

চোখের সাদা অংশ একটি পরিস্কার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এটিকে বলা হয় 'কনজাংটিভা'। 'কনজাংটিভা' স্বচ্ছ থাকার কারণেই এর ভিতর দিয়ে চোখের সাদা অংশটুকু দেখতে পাওয়া যায়। তাই গোটা অংশ সাদা দেখা যায়। চোখের পাতা দুটো পিটপিট করে চোখের পানি দ্বারা 'কনজাংটিভা' ও কর্ণিয়াকে মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে। যে শিশু ভিটামিন-এ এর অভাবে ভুগছে, তার চোখে ভাল মানের পানি থাকে না। তার চোখের পানি খুব পাতলা হয় এবং তৈলাক্ত হয় না। ফলে, কনজাটিভা এবং কর্ণিয়ার মাখে পানি জমে যায়। এতে করে কনজাংটিভা

শুকিয়ে যায়। চোখের সাদা অংশ আর মসৃণ এবং উজ্জ্বল থাকে না। কনজাংটিভার শুষ্কতাই জেরোফথালমিয়ার (শুস্কচোখ) প্রথম চিহ্ন।

বিটট'স স্পট

ফ্রান্সের ডাঃ বিটট 'জিরফথালমিয়া'র এই বিশে চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। 'কনজাংটিভা' শুষ্ক থাকে বলেই চোখের সাদা অংশের বিভিন্ন দিকে আবরণ তৈরী হয়। এগুলো সাবান গোলা পানির ফেনার বুদবুদের মত। বিটট স্পটযুক্ত কোন শিশুকে দেখলে বুঝতে হবে তার ভিটামিন 'এ' এর অভাব রয়েছে।

কর্ণিয়ার শুষ্কতা

কর্ণিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ থাকতে হবে, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে। এটা অবশ্যই মসৃণ এবং উজ্জ্বল থাকতে হবে।

যদি একটি শিশু দীর্ঘদিন যাবত ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগে এবং তার চিকিৎসা করা না হয়, তখন তার কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কর্ণিয়া সংক্রমিত হলে মারাত্মক রূপ নেয় এবং তা ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নষ্ট হয়ে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগা একজন শিশু হাম অথবা ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার কর্ণিয়া আরও তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রোগী অন্ধ হয়ে যায়।

কর্ণিয়ার নরম ভাব বা ঘা

যদি শুষ্ক কর্ণিয়ার চিকিৎসা করা না হয়, তাহলে কর্ণিয়াতে খুব তাড়াতাড়ি ঘা তৈরী হয়। এ ঘা বড় হলে চোখ নরম হয়ে যায়। অল্প ঘা হয়ে যাওয়া অবস্থায় ভিটামিন-এ দিয়ে যদি শুরুতেই চিকিৎসা করা হয় তবে এতে মাত্র একটি ছোট দাগ থাকবে। ঘা যদি বড় হয় এবং চোখ নরম হয়ে যায় তবে চোখে দাগের বিস্তৃতি ঘটবে এবং রোগী অন্ধ হয়ে যাবে।

কর্ণিয়ার ক্ষত বা দাগ

কর্ণিয়ার ঘা গভীর হলে চিকিৎসার পরেও ক্ষত বা চিহ্ন থেকে যায়। শুরুতেই যদি শিশুকে ভিটামিন-এ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।তবে ঘা যত ছোট থাকবে, চিকিৎসার পর দাগও তত ছোট থাকবে। চিকিৎসার পর কর্ণিয়ার উপরে সামান্য দাগ থাকলেও শিশুর প্রয়োজনীয় দৃষ্টিশক্তি বজায় থাকে। চোখে পড়া সামান্য দাগের চারদিক দিয়ে সে দেখতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ অবশিষ্ট স্বচ্ছ কর্ণিয়া দিয়ে সে দেখতে পায়।

অন্যান্য

ভিটামিন-এ এর অভাব হলে শরীরের বিভিন্ন ঝিল্লি, যেমন- শ্বাসতন্ত্র, বৃহদন্ত্র এবং ক্ষুদ্রান্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। ফলে শিশু নিউমোনিয়া এবং পাতলা পায়খানায় সহজে আক্রান্ত হয়।

ভিটামিন এ ক্যাপসুল দ্বারা চিকিৎসার তালিকা

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব চিকিৎসার জন্য ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে। ক্যাপসুলের শক্তি সব সময় ২,০০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট থাকা উচিত। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের (শুষ্ক চোখ) লক্ষণ এবং চিহ্ন দেখা গেলে চিকিৎসার জন্য তিনটি ক্যাপসুল রোগীকে দিতে হবে। যখন আপনি রোগীর জেরফথালমিয়ার লক্ষণ ও চিহ্ন সনাক্ত করতে পারলেন, তখন তাকে প্রথম ক্যাপসুলটি দিন। পরের দিন আরো একটি ক্যাপসুল দিন এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের মাথায় শেষ ক্যাপসুলটি দিন।

চিকিৎসা তালিকা নিম্নরূপ

বয়স	দিন	উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন এ ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আই ইউ)
ক) ৬ মাসের নীচে	ডোজ ১ম দিন	৫০,০০০ আই, ইউ (৪ ফোঁটা)
খ) ৬-১২ মাস	ঐ	১,০০,০০০ আই, ইউ (৪ ফোঁটা)
গ) ১২ মাস+	ঐ	২,০০,০০০ আই, ইউ (৮ ফোঁটা)

সঠিকভাবে এ তালিকা মেনে চলা আপনার জন্য জরুরী। শুধুমাত্র ৩ টি মাত্রাই (৩টি ক্যাপসুল) দিতে হবে, এর চেয়ে বেশি নয়। শিশুকে মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া বিপজ্জনক, এতে করে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ভিটামিন এ ক্যাপসুল নিরাপদ, যদি এটাকে উপরোক্ত নির্দেশমতো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। কর্ণিয়ার শুষ্কতা বা ঘা আক্রান্ত শিশুকে একটি ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিন এবং নিকটস্থ চিকিৎসক বা চক্ষু বিশেষজ্ঞের নিকট তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে বলুন। যদি শিশুকে তার মা চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে না নিয়ে যেতে চান অথবা নিয়ে যেতে দেরী করেন তবে মাকে বলবেন যেন তিনি দ্বিতীয় (পরের দিন) ও তৃতীয় (২ সপ্তাহের মাথায়) মাত্রা ভিটামিন এ ক্যাপসুল নিয়মমতো শিশুটিকে খাওয়ান।

হাম

হাম এমন একটি রোগ, যা ভিটামিন এ অভাবগ্রস্ত শিশুদের খুব তাড়াতাড়ি অন্ধ করে দিতে পারে। সাধারণভাবে হাম স্বাস্থ্যবান শিশুদেরও অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। যাই হোক, হামের কারণে যে জ্বর হয় তার ফলে অসুস্থ শিশুর যকৃতে (কলিজায়) যে অল্প পরিমাণে ভিটামিন এ জমা থাকতে পারে তাও ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ভিটামিন এ-এর অভাবে শিশুর চোখ অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে যায়। চোখ সুস্থ না থাকার কারণে হামের ভাইরাস সরাসরি চোখের আক্রান্ত স্থানে ঘা সৃষ্টি করতে পারে। যদিও ঘা শুকিয়ে যেতে পারে, তবুও তার ক্ষতচিহ্ন চোখে থেকে যায় এবং পরবর্তীতে শিশুকে অন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রতি তিন জন অন্ধ শিশুর একজন অন্ধ হওয়ার আগে হামে আক্রান্ত হয়েছিল। তাই হামের পর শিশুকে ২ ডোজ ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেওয়া হয়।

ডায়রিয়া (পাতলা পায়খানা)

একজন শিশুর যতবার পাতলা পায়খানা হয় ততবারই যকৃতে (কলিজায়) যে সামান্য পরিমাণে ভিটামিন এ মজুত থাকে তা ব্যবহৃত হয় এবং নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। এমনকি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশু ভিটামিন এ সহ কোন পুষ্টি ধরে রাখতে পারে না বা হজম হয় না। বাংলাদেশে যে সব শিশু ভিটামিন এ এর অভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে তার প্রতি ৪ জন শিশুর ৩ জনই অন্ধ হওয়ার ৪ সপ্তাহ আগে ডায়রিয়ায় ভুগেছে। তাই ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে ১ ডোজ অতিরিক্ত ভিটামিন এ দেয়া হয়।

নিউমোনিয়া

হামের মতো নিউমোনিয়ার জ্বরেও শিশুদের শরীরের ভিটামিন এ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং শিশুরা অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের শিকার হতে পারে।

ভিটামিন এ সনাক্তকরণ চার্টে বলা হয়েছে যে মারাত্মক অপুষ্টি, কর্ণিয়া ঘোলাটে হলে ৩ ডোজ ভিটামিন এ প্রথম দিন ১টি ডোজ, ২য় দিন আর একটি ডোজ এবং ১৪ দিন পর আরো ১টি ডোজ দিতে হবে।

(মনে রাখবেন মারাত্মক অপুষ্টি, হাম, ডায়রিয়া এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ ও চিহ্ন নিউমোনিয়ার পর দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত ডোজ ভিটামিন এ দিন)। আইএমসিআই এর আলোকে কর্ণিয়া ঘোলাটে হলে ৩ ডোজ, হাম এর জন্য ২ ডোজ এবং দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া বা মারাত্মক অপুষ্টির জন্য ১ ডোজ ভিটামিন এ দিন। নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ১ ডোজ ভিটামিন এ দিন। হামের ২ ডোজের ক্ষেত্রে ১ম ডোজ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও ২য় ডোজ পরের দিন দিবে।

ভিটামিন এ ক্যাপসুল দ্বারা অন্ধত্ব প্রতিরোধ তালিকা

ভিটামিন এ ক্যাপসুল দ্বারা অপুস্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এ ধরনের অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য রোগীকে যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয় তার ক্ষমতা ২,০০,০০০ আই ইউ। ক্যাপসুল প্রতি ছয় মাসে একবার করে দিতে হবে।

প্রতিরোধের জন্য তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

ভিটামিন এ এর পরিমান আই ইউ = ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

- ৬ মাস থেকে ১ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে ১,০০,০০০ আই, ইউ দিতে হবে (১/২ ক্যাপসুল বা ৪ ফোঁটা)।
- ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে ২,০০,০০০ আই, ইউ দিতে হবে (১ ক্যাপসুল বা ৮ ফোঁটা)।

কমিউনিটি প্যারামেডিক হিসাবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ার ইতিহাস প্রত্যেক রোগীকে কাছ থেকে জেনে নেয়া। শিশুদের বেলায় ক্যাপসুলের বোঁটা কেটে তা চিপে ছোট শিশুর মুখে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখুন, যাতে বড় শিশুরা ক্যাপসুল চুষে খায়। এভাবে সব শিশুর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আমাদের থেকে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব নির্মূল করতে পারি এবং লক্ষণীয়ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও তাদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করতে পারি।

- শিশুর বয়স ৯ মাস বা বেশি হলে এবং বিগত ৬ মাসে ভিটামিন-এ না পেয়ে থাকলে, তাকে এক ডোজ ভিটামিন-এ দিন।
- কর্ণিয়া ঘোলাটে হলে ৩ ডোজ (১ম ১ ডোজ, ১ দিন পর ২য় ডোজ, ১৪ দিন পর ৩য় ডোজ) হাম হলে ২ ডোজ (১ম ডোজ, পরের দিন ২য় ডোজ), দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া, মারাত্মক অপুষ্টি, নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ১ ডোজ ভিটামিন-এ দিতে হবে।

পাঠ-১২
ভিটামিন এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব এবং ভিটামিন এ এর অভাব রোধ করার সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা। আমরা গ্রামের পরিবারগুলোকে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার সম্বন্ধে এবং কিভাবে শিশুদেরকে সেগুলো খাওয়াতে হয় সে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে চাই। যে গরীব জনগণ তাদের শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাদ্য পায় না, আমরা তাদের মধ্যে ভিটামিন এ এর চাহিদা সৃষ্টি করতে চাই।

আত্মবিশ্লেষণ

পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়ার আগে আত্মবিশ্লেষণ করুন। আপনি কি নিজের শিশুকে শাল দুধ প্রদান করে বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করেছেন? বুকের দুধের পাশাপাশি ৬ মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই আপনার শিশুকে সবজি এবং ফলমূল (পারিবারিক খাবার) প্রদান করেছেন? শিশুটির শক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলেছেন? আপনার বাড়িতে সবজি চাষ হয় কি না?

ক্লায়েন্ট বিশ্লেষণ

কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত দলের সংগে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করা যেতে পারে এমন কয়েকটি দলের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো-

- মায়েরা

- গ্রামীণ ধাত্রীগণ
- গ্রামের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

কতগুলো সুনির্দিষ্ট পরিবেশ ও অবস্থা এবং ভিটামিন এ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ভিটামিন এ এর অভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। ভিটামিন এ অবাব জনিত শিশুদেরকে প্রায়ই সমাজের এমন কোন দল বা শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যেখানে এ অবস্থা সকল শিশুর মধ্যে বর্তমান। যদি আপনি কোন শিশুর অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দেখতে পান, তবে অবশ্যই আপনি এটা তার গোটা পরিবারে বা সে সমাজে আরো অনেক শিশুর মধ্যে দেখতে পাবেন। এখানে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পরিবেশ, অবস্থা ও অজ্ঞতা যেগুলো অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের জন্য দায়ী, সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

পরিবেশগত

অন্ধত্বের একটি বড় পরিবেশগত কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ঋতুতে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার সমানভাবে পাওয়া যায় না। বছরের অন্যান্য সময় যেরূপ ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল ও শাক সবজি পাওয়া যায়, বর্ষাকালের শেষে পল্লীর জনগণ সেরূপ পায় না। যার ফলে বর্ষাকালে ফসল কাটার আগে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বেশী হয়।

অর্থনৈতিক

ভিটামিন এ এর অভাবের জন্য প্রধানত দারিদ্রতা এবং ভুল ধারণাই দায়ী। কারণ বেশীরভাগ লোকই তাদের সন্তানদের ভিটামিন এ যুক্ত খাবার কিনে খাওয়াতে পারে না। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জন ভূমিহীন। কৃষকরা যে জমিতে কাজ করে সে জমিতে কি ফসল আবাদ হবে তা তারা নির্ধারণ করতে পারে না। তাদের শ্রমে যে ফসল উৎপাদিত হয়, তারা সেগুলোর মালিক নয়। তাদেরকে নগদ যে মজুরী দেয়া হয় তাতে হয়তো চাল কেনা সম্ভব, কিন্তু কোন সবজি কেনা সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেকে মনে করে যে শাক-সবিজ হচ্ছে গরীবের খাবার, সেজন্য খেতে চায় না।

গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক গরীব লোকের মোরগ-মুরগী ও গরু-ছাগল আছে। কিন্তু তারা টাকা উপার্জন করার জন্য ডিম ও দুধ সাধারণতঃ বিক্রি করে দেয়। অনেকের শাক-সবজি ও ফলমূল চাষ করার জন্য যথেষ্ট আবাদী জায়গাও আছে, কিন্তু এ কাজ করার মতো সচেতনতা তাদের নেই। শহরে বস্তি এলাকাতে সবজি বাগানের জন্য কোন জায়গা নেই এবং বেশীর ভাগ লোক কোন গবাদি পশুও পোষে না। গ্রাম ও শহর এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা, যেমনঃ বেকারত্ব, নিম্নমানের চাকুরী এবং পরিবার বিভক্তি (যৌথ পরিবারের ভাংঙ্গন) শাক-সবজি ও ফলমূলের মতখাদ্য ক্রয় করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম ও শহর এলাকায় মেয়েদের নিরক্ষরতা একটি প্রধান সমস্যা। যে সকল মায়েরা স্কুলে যাননি এমনি মায়েদের পরিবারেই অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বেশী দেখা যায়। যে মায়েরা পড়তে জানেন না এবং সুষম খাদ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পাননি, তাদের শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল মায়েরা স্কুলে গেছেন সে সব মায়েদের শিশুদের চেয়ে যারা স্কুলে যান নি তাদের শিশুদের ৪ গুণ বেশী অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভুল ধারণা

অনেক মায়েদের শিশুদের খাওয়ানো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। তারা শালদুধ ফেলে দেয়। শিশুর বয়স যখন ৬ মাস পূর্ণ হয় তখন বাড়তি খাবার খেতে দেয় না, অনেকে ২ বছর পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ শিশুদের খেতে দেয়। এই ভুল ধারণা হচ্ছে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক মায়েরা জানেন না যে বাড়ন্ত শিশুদেরকে ৬ মাস পূর্ণ হবার পর হতেই ভিটামিন এ যুক্ত শাক-সবজি ও ফল খাওয়ানো প্রয়োজন।

ভিটামিন এ-এর অভাব সম্বন্ধে জানতে পেরেছি এবং এর জন্য শিশুরা কিভাবে অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যায় এবং পরিণতিতে শিশুরা কিভাবে এ রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যু ঝুকি বৃদ্ধি করে তাও জেনেছি। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য ভিটামিন-এ ক্যাপসুল দিতে হবে।

বাংলাদেশে অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে শিশুদের অবশ্যই ৬ মাস পর পর ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে। এমন এক দিন আসবে যখন অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দূর করার জন্য ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়োজন হবে না। আর এমন সময় তখন আসবে যখন শিশুরা তাদের নিজেদের ঘরে প্রত্যেক দিনের খাবার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন এ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। অতএব, খাদ্যের মান উন্নয়ন করা এবং যদি খাদ্যে ভিটামিন এ-এর অভাব থাকে তবে তা বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের দেশের পরিবারগুলোকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, ভিটামিন এ ক্যাপসুল ভিটামিন এ যুক্ত খাবারের বিকল্প মাত্রা। বিশেষ করে ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণের সম?য় সকলকে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে পুষ্টি শিক্ষা দিতে হবে।

আমরা অবশ্যই সকল পরিবারকে সুষম খাদ্য সম্পর্কে শিক্ষা দান করবো। আমরা তাদেরকে আরো শেখাব কোন কোন খাদ্যে ভিটামিন এ আছে এবং কিভাবে সেগুলো শিশুদের জন্য প্রস্তুত করতে হয়।

ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাদ্য

ভিটামিন এ যুক্ত খাদ্যের একটি তালিকা এখানে দেয়া হয়েছে। নিম্নের তালিকায় এই খাদ্যের শ্রেণী বুঝানো হচ্ছেঃ

গাঢ় সবুজ ও লাল শাক সবজি	হলুদ সবজি	হলুদ ফলমূল	প্রাণী জাতীয় খাদ্য
মিষ্টি কুমড়া শাক, পুঁই শাক, পালং শাক, কলমী শাক, লাল শাক, কচু শাক, পাট শাক, মূলা শাক, সজিনা শাক ইত্যাদি।	মিষ্টি কুমড়া, গাজর	পাকাআম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল	দুধ, কলিজা, ছোট মাছ (মলা ও ঢেলা)

বাড়ন্ত শিশুদের ভিটামিন এ যুক্ত সবজি ও ফলমূল দিতে হবে। শিশুরা যাতে পছন্দ করে খাবারগুলো সেভাবে তৈরী করতে হবে। সবজি পরিমাণ মত তেলে রান্না করা উচিত। ঝাল এবং মশলা যথা হলুদ এবং ধনিয়া দিয়ে

রান্না করা সবজি ছোট শিশুরা পছন্দ করে না। আপনি চাল, ডাল, সবজি এবং তেল দিয়ে খিঁচুড়ী তৈরী করতে পারেন। খিঁচুড়িতে যথেস্ট পরিমাণে ভিটামিন ও আমিষ আছে। এ খাদ্য শিশুদের জন্য খুবই উপযোগী সুষম খাদ্য।

মায়ের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস

এটা খুবই ভাল লক্ষণ যে শতকরা ৯০ জনের অধিক বাংলাদেশী মহিলা এবং বলতে গেলে গ্রামের প্রায় সকল মহিলাই তাদের সন্তানদেরকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ দিয়ে থাকেন। ভিটামিন এ সম্পর্কে শিক্ষাদানের সময় কলস্ট্রাম বা শাল দুধের ব্যাপারে মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমরা অবশ্যই মায়েদেরকে তাদের সন্তানদের শাল দুধ দিতে উৎসাহিত করবো। এ দুধে পূর্ণ মাত্রায় ভিটামিন এ থাকে এবং শিশুদের জন্য তা ক্ষতিকর তো নয়ই বরং খুবই উপকারী এবং প্রয়োজনীয়।

মায়ের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি শিশুদের অন্যান্য শক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস

মায়ের বুকের দুধ সব সময় শিশুদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ৬ মাস বয়সের পর হতেই শিশুদেরকে বাড়তি খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ ৬ মাস বয়স এর পর থেকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ তার চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয় এবং শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করলে একজন শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে পারে।
ভাত বা চালের জাউ শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। বাড়ন্ত শিশুর জন্য ভাতের সাথে সবজি এবং ফলমূল মেশানো খাবারের দরকার। যারা খরচ পোষাতে সক্ষম, তারা শিশুকে ভাতের সাথে দুধ ও ডিম দিতে পারেন।

বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ

গ্রামের সকল পরিবার খুব সহজেই তাদের ভিটামিন এ যুক্ত খাবার পেতে পারে, যদি তাদের নিজস্ব সবজি বাগান থাকে। এ বাগানকেই বাড়ীর বাগান, পারিবারিক বাগান বা সবজির বাগান বলা হয়ে থাকে। প্রতি পরিবারকেই তাদের বাড়ীর সম্মুখে অথবা পেছনে সবুজ শাক-সবজি চাষে উৎসাহিত করতে হবে। বাড়ীর দেয়ালের পাশে কিংবা কোথাও সামান্য জায়গায়, পুঁইশাক, লালশাক এবং কুমড়া শাকের চাষ করা যেতে পারে। এমনকি পেঁপে গাছ লাগিয়ে পেঁপে পেতে পারেন।

উপকরণ

জাতীয় কর্মসূচীতে সংযুক্ত ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করা হয়।

কার্ড নং-১

রফিক অন্ধ। কারণ সে ছোটবেলায় ভিটামিন এ যুক্ত শাক-সবজি ও ফলমূল খায়নি। তাদের দু'বছর বয়স পর্যন্ত কেবল মাত্রা বুকের দুধ ও চালের গুড়া খওয়ানো হয়েছে।

আলীর চোখে কোন রকম অসুবিধা নাই। তার দৃষ্টি শক্তিও খুব ভালো। সে বেশ হাসিখুশি কারণ প্রতিদিন সে ভাতের সাথে ভিটামিন এ যুক্ত শাক-সবজি খায়। তাছাড়া হলুদ ফলমূলও খেয়ে থাকে।

দলকে জিজ্ঞাসা করুন

আপনারা রফিকের মত কোন অন্ধ শিশু দেখেছেন কি?

কার্ড নং-২

এখানে কয়েকটি ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবারের ছবি দেয়া আছে। এর মধ্যে কয়েকটি খাবার ব্যয়বহুল; যেমন-ডিম এবং দুধ। এছাড়া বেশ কিছু সস্তা খাবারও আছে যেমন লাল শাক, কচু শাক, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এগুলোর যে কোন একটি শিশুরা প্রতিদিন খেলে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

দলকে জিজ্ঞাসা করুন

১) এ খাবারগুলির মধ্যে কোন কোন খাবারগুলি সাধারণত: আপনাদের এলাকায় পাওয়া যায়?

২) কোন কোন খাদ্যগুলি আপনি কিনতে পারেন?

কার্ড নং-৩

আলী ভাতের সঙ্গে ভিটামিন এ যুক্ত শাক-সবজি ও ফলমূল খাচ্ছে। তার বোন সায়মার বয়স এখন ৮ মাস। ৭ মাস বয়স থেকেই সায়মাকে তার মা বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন এ যুক্ত খাবার সিদ্ধ ও নরম করে খাওয়ান। এখন সায়মা এবং আলী দুজনই ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার খেতে পছন্দ করে।

দলকে জিজ্ঞাসা করুন

১) কিভাবে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ভিটামিন এ যুক্ত শাক-সবজি রান্না করবেন?

২) কিভাবে এই খাদ্যগুলো ছোট শিশুদের জন্য রান্না করবেন?

৩) কি কি মসলা দিয়ে তরকারী রান্না করবেন যাতে বাচ্চারা সেই সব তরকারী খেতে পছন্দ করবে?

কার্ড নং-৪

আলী যাতে অন্ধ না হয় সে জন্য বছরে দু'বার ভিটামিন এ ক্যাপসুল খায়, একবার গরম কালে এবং একবার শীতকালে। স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিবার কল্যাণ কর্মীগণ ছয় বছরের নীচের বাচ্চাদের ভিটামিন এ ক্যাপুসল দিয়ে থাকেন।

দলকে জিজ্ঞাসা করুন

১) আপনাদের বাচ্চাদের কি কখনও ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে?

২) শেষ বার কখন এই ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে?

৩) কে তাদেরকে এই ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিয়েছে?

পাঠ-১৩
আঁশযুক্ত খাবার

আঁশযুক্ত খাবার কাকে বলে?

আঁশ উদ্ভিদজাত খাদ্যের সেই অংশ যা হজম হয় না এবং শরীরের পুষ্টি প্রয়োজনে লাগে না। আঁশযুক্ত খাবার হজম করতে যে জারক রসের প্রয়োজন হয় তা পরিপাকতন্ত্রে না থাকায় এগুলো অন্ত্রে শোষিত হয় না।

আঁশযুক্ত খাদ্যের কাজ

শাক-সবজি, উদ্ভিদ আমিষ যেমন- ডাল, সীমের বীচি, কাঁঠালের বীচি ইত্যাদি।

আঁশযুক্ত খাদ্যের কাজ

আঁশযুক্ত খাদ্য খেতে বেশী চিবাতে হয়। এই চিবানোর ফলে মুখের লালাগ্রন্থি হতে প্রচুর পরিমাণ লালা নিঃসৃত হয় এবং হজমে সাহায্য করে।

- **মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে**

  বেশী আঁশযুক্ত খাদ্য মলের আয়তন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে মল নরম হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। খাদ্য আঁশের পানি ধারণ ক্ষমতার জন্য মলের ওজন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে। মলের আয়তন বৃদ্ধি এবং মলের ঘনত্ব কমার ফলে মলাশয়ের চাপ কমে যায় এবং হার্নিয়া, অর্শ রোগ কম হয়।

- **মলাশয়ে ক্যান্সারের আশংকা কমায়**

  যথেষ্ট আঁশযুক্ত খাবার খেলে খাবার অতিরিক্ত সময় ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং বৃহদন্ত্রে না থাকার ফলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- **যারা শরীরের মেদ কমাতে চান তাদের জন্য পরামর্শ**

  যে সকল আঁশ অন্ত্রের এ্যানজাইম দ্বারা বিপাক হয় না তা মলাশয়ে অবিকৃতভাবে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যাংশ বেশী জায়গা দখল করে, পেট ভরা ভাব অনুভব হয় এবং অল্প খেয়েও তৃপ্তিবোধ হয়। এ সকল কারণে আঁশযুক্ত খাদ্য মোটা ব্যক্তি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপকার করে। আঁশযুক্ত খাদ্য খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকলে হৃদরোগের সম্ভাবনাও কমে যায়।

আঁশযুক্ত খাবার নিয়মিত না খেলে কি কি রোগ হতে পারে?

দৈনিক খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত খাবার খুব কম থাকলে বা না থাকলে নিম্নলিখিত রোগগুলো হতে পারে-

• কোষ্ঠকাঠিন্য • হৃদরোগ • মলাশয় ক্যান্সার	• হারনিয়া • এ্যাপেনডিসাইটিস

দৈনিক খাদ্য তালিকায় আঁশজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ

সাধারণত : ২ মুঠো শাক-সবজি অথবা ২০০-৩০০ গ্রাম পরিমাণ শাক-সবজি, অধিক পরিমাণে খেলে মল নরম ও ঘন ঘন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিঃ দ্রঃ

১। আঁশযুক্ত খাবার (শাক-সবজি) গরীবের খাবার নয়। এটা আমাদের সকলের শরীরের জন্য অনেক উপযোগী।

২। আঁশযুক্ত খাবারে পুরুষের যৌনক্ষমতা কমে না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা।

আঁশযুক্ত খাবারের অভাবজনিত রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পরামর্শদান

আঁশযুক্ত খাবারকে ৭ নম্বর পুষ্টি উপাদান বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ দৈনিক খাদ্য তালিকায় অবশ্যই আঁশযুক্ত খাবার খেতে হলে নিয়মিত প্রচুর শাক-সবজি খেতে হবে। ভূষিযুক্ত আটা দিয়ে রুটি খাওয়া ভালো। আঁশযুক্ত খাদ্যের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় হলো পরিমিত পরিমাণে শাক-সবজি খাওয়া।

দৈনিক খাদ্য তালিকায় কতটুকু আঁশ খাওয়া উচিত

প্রত্যেক দিন কমপক্ষে এক মুঠো রান্না করা শাক-সবজি খেতে হবে। শাক-সবজির পাশাপাশি উদ্ভিজ আমিষে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আঁশ থাকে, যেমন- ডাল, সীমের বীচি, কাঁঠালের বীচি, সয়াবীন, ডাল ইত্যাদি।

খাদ্য আঁশ

বিভিন্ন শাক-সবজিতে অবস্থিত খাদ্য আঁমের পুষ্টির মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। খাদ্য আঁশের পুষ্টিমান নির্ভর করে আঁশের গঠন প্রকৃতি ও রাসায়নিক গুণাগুনের উপর। যেসব খাদ্য আঁশ আকারে ও পুরুত্বে ছোট সে সব খাদ্য আঁশের পুষ্টিমান বেশী। কারণ পাকস্থলীতে এরা সহজে চলাচল করতে পারে। সহজে খাদ্য দ্রব্যের সাথে মিশতে পারে ও প্রয়োজনীয় ক্রিয়া কান্ড ঘটাতে পারে।

খাদ্য আঁশ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে খাদ্য আঁশ পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য, এপেনডিসাইটিস, হেমোরয়েডস এবং মুত্র নালীর পাথর। অন্যদিকে কাদ্য আঁশ নানা রকম বিপাকীয় (Metabolic) রোগ, যেমন- বহুমুত্র, স্থুলতা, হৃদরোগ ও রক্তচাপ রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে অংশ নেয়।

বিভিন্ন শাক-সবজিতে অবস্থিত খাদ্য আঁশের পরিমাণের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। শাক-সবজির মধ্যে পটলে রয়েছে শর্করা ৩ ভাগ, এর পর ফুল কপিতে শতকরা ২ ভাগ, কচুশাকে ১.৮ ভাগ ও সীমে ১.৯ ভাগ। অন্যান্য বেশীর ভাগ খাদ্যে আঁশের পরিমাণ ১ বা ১এর কাছাকাছি।

খাদ্যশক্তি

পুষ্টিমানের বিচারে শাক-সবজিতে শক্তি জাতীয় উপাদান বা ক্যালোরী খুবই কম। খাদ্যশক্তির প্রধান উৎস শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য। কোন কোন মূল জাতীয় শাক-সবজিতে বেশী খাদ্যশক্তি থাকে।

আমিষ

খাদ্য শক্তির মত আমিষের ক্ষেত্রেও শাক-সবজির গুরুত্ব অনেকটা কম। তাই আমিষের পরিমাণের উপর শাক-সবজির পুষ্টিমান নির্ভর করে না। তবুও কয়েকটি শাক-সবজিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমিষ রয়েছে। যেমন-খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে কচু শাক ৬.৮ গ্রাম, ফুলকপিতে ৫.৯ গ্রাম, লালশাকে ৫.৩ গ্রাম, সীমে ৪ গ্রাম, সাজনা পাতায় ৬ গ্রাম।

ক্যালসিয়াম

ক্যালসিয়াম আমাদের দেহে হাড় গঠন করে, রক্তক্ষরণ বন্ধ করে, ভিটামিন 'ডি' বিশ্লেষণ ও সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিগ্রাম ও পূর্ণবয়স্ক গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ৬৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। বাড়ন্ত শিশুর ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ কিছুটা বেশী। ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের শিশুদের দেহে হাড় গঠন ব্যহত হয় এবং এই অপুষ্টিজনিত রোগকে বলা হয় রিকেট। গর্ভবতী মাকে শুধুমাত্র খাদ্যস্থ ক্যালসিয়ামের উপর নির্ভর না করে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হয়। নচেৎ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে একই ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

শাক-সবজির পুষ্টিমানের আলোচনায় ক্যালসিয়ামের পরিমান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ খাদ্য আঁশের মত ক্যালসিয়ামের একটি বিশিষ্ট উৎস শাক-সবজি। শিশু অবস্থায় মায়ের দুধ এবং বয়স্ক অবস্থায় শাক-সবজি ও ছোট মাছ ক্যালসিয়ামের প্রদান উৎস হিসাবে বিবেচিত। আমাদের আলোচ্য শাক-সবজির মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় লাল শাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম লাল শাকে প্রায় ৩৭৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এরপর লাউ শাক, ফুল কপি, কচু শাক, সীম, ধনে পাতা পুঁই শাকের মধ্যে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম রয়েছে।

আয়রণ

আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় ধাতব উপাদানের মধ্যে সম্ভবত: প্রথম স্থানীয় উপাদান হচ্ছে আয়রণ। আয়রণের কাজ দেহে রক্ত তৈরী করে দেহে অক্সিজেন বহন করা, এনজাইমের কাজ সাংগঠনিক অংশ হিসাবে কাজ করা, বিমেস করে দেহে শক্তি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। মোট কথা আয়রণ দেহকে প্রায় সবদিক থেকে বাঁচিয়ে

রাখতে সহায়তা করে। আমাদের দেহে গড়ে প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাভাবিক মহিলার ৩২ মিলিগ্রাম এবং একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ২৪ মিলিগ্রাম প্রয়োজন।

শাক-সবজি লোহার একটি প্রধান উস। বিশেষ করে রঙ্গীন পাতাজাতীয় শাক-সবজিতে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়। লোহার পরিমাণের দিক থেকে আলোচ্য শাক-সবজিগুলির মধ্যে ডাঁটাশাকের স্থান সর্বোচ্চ, প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী ডাঁটা শাকে রয়েছে প্রায় ২৫ মিলিগ্রাম আয়রণ। এরপর ধনেপাতা, পুইশাক, কচুশাক, পালং শাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে খাদ্যের আমিষের মান ও ভিটামিন সি আয়রণ বিশোষণে সহায়তা করে।

ক্যারোটিন

ভিটামিন এ আমাদের দৃষ্টি শক্তি দিয়ে থাকে। ক্যারোটিন ভিটামিন এ এর উৎস। ক্যারোটিন পাকস্থলীতে গিয়ে ভিটামিন এ তৈরী করে। ভিটামিন এ চোখ, পাকস্থলী, মূত্রনালী, শ্বাস-প্রশ্বাসনালীর ঝিল্লী তৈরীতে সহায়তা করে। ভিটামিন এ এর অভাবে এসব স্থানে ঝিল্লী তৈরী বিঘ্নিত হয়। ফলে এসব স্থান শুকিয়ে আসে ও সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ভিটামিন এ এর অভাবে প্রথমে চোখের পাতা ও পরে কর্ণিয়া শুকিয়ে যায় এবং কর্ণিয়অতে বিটট দাগের সৃষ্টি হয়। কর্ণিয়ার উপরে একটা সাদা আবরণ পড়ে। এরপরের ধাপে কর্ণিয়া নরম হয়ে আসে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যায়ে কর্ণিয়া গলে যায় এবং চিরতের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। ভিটামিন এ এর অভাবে গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যায়। হাঁটু ও কনুইতে লোমকুপের গোড়ায় ছোট ছোট খুসকীর সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে ভিটামিন এ এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য উৎস শাক-সবজি। কারণ ভিটামিন এ যে সব উৎস থেকে পাওয়া যায়, যেমন- খাদ্য তৈল, মাছের তৈল, ঘি, এসব আমরা খুব কম খাই। আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় একমাত্র শাক-সবজির উপর। শাক-সবজির মধ্যে রঙ্গীন পাতা জাতীয় সবজিতে রয়েছে সর্বাধিক ভিটামিন এ। সম্ভবতঃ যে সব শাক-সবজিতে ভিটামিন এ সর্বাধিক রয়েছে, তার সবকটাই আমাদের দেশে প্রচুর উৎপাদিত হয়। তবুও আমাদের দেশে ভিটামিন এ এর অভাবে বছরে প্রায় হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের অজ্ঞতারই ফল। আমাদের দেমের লোকজন তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করছে না এবং খাচ্ছে না, তাই এ দুরাবস্থা। অথচ আমাদের দৈনিক যেটুকু ভিটামিন এ-এর প্রয়োজন (প্রতিদিন ৭৫০ মাইক্রোগ্রাম) তা আমাদের চারপাশে অবস্থিত যে কোন পাতা জাতীয় সবজি থেকে সহজে পেতে পারি। ক্যারোটিন বা ভিটামিন এর পরিমাণের দিক থেকে প্রথম স্থানই হল হেলেঞ্চা, পুঁইশাক, লালশাক, কলমী শাক, কচুশাক, ডাটাশাক, পালংশাক। এসব শাকের মাত্র ১ বা ২ চামচ খেলেই আমাদের দৈনিক ভিটামিন এ এর চাহিদা পূরণ হতে পারে।

মূল বা ফল জাতীয় সবজিতে ভিটামিন এ এর পরিমাণ সাধারণতঃ কম থাকে। ভিটামিন এ এর বিশোষণ ও দেহের কাজে লাগাতে প্রয়োজন তেল ও আমিষের। কারণ ভিটামিন এ একমাত্র তেলের মাধ্যমে বিশোষিত হয়

এবং ভিটামিন 'এ' ও আমিষ যৌগের সৃষ্টি হয়ে দেহের কাজে লাগে। তাই ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূর করতে খাবারে পরিমিত তৈল ও আমিষ থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

ভিটামিন 'এ' তাপে নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের প্রচলিত রান্না প্রক্রিয়ার প্রচুর ভিটামিন 'এ' নষ্ট হয়। তাই শাক-সবজি রান্নার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শাক-সবজি রান্নার সময় ঢেকে রাখতে হবে এবং অতি রান্না প্রক্রিয়া বাদ দিতে হবে।

ভিটামিস সি

ভিটামিন-সি বা এসকর্বিক এসিড আমাদের দেহে বহুবিধ কাজ সম্পাদন করে। ভিটামিন সির অভাবে দেহের ক্ষত শুকাতে দেরী হয়। অনেকের মতে হৃদপিন্ডের কার্যবিধির সাথে ভিটামিন-সি এ রঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দাঁতের অসুস্থতা, মাড়ির অসুখ, রক্তক্ষরণ, চামড়া খসখসে হওয়া ভিটামিন-সি এর অভাবের কয়েকটা লক্ষণ। ভিটামিন-সি এর অভাবে স্কার্ভী রোগ হয়। আমাদের দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এর প্রয়োজন। ভিটামিন সি এর প্রধান উৎস টক জাতীয় ফল। প্রাণীজ বা শস্যজাতীয় খাদ্যে ভিটামিন সি খুব কম থাকে। তাই ভিটামিন-সি এর জন্য আমাদেরকে যে কোন ফল, বিশেষ করে টক জাতীয় ফলের উপর নির্ভর করতে হয়। কাঁচা মরিচে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে।

বি ভিটামিনসমূহ

বি-ভিটামিনের দিক থেকে শাক-সবজি ভিটামিন এ বা সি এর মত সমৃদ্ধ নয়। তবে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। কারণ এসব ভিটামিনের চাহিদার পরিমাণও খুবই কম। বি-ভিটামিনের অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনা করলে একমাত্র ডিম ও মাংস ছাড়া শাক-সবজিতেই বি-ভিটামিনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

শাক-সবজির পুষ্টিমান

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের দিক থেকে পাতাজাতীয় শাক-সবজির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লাউয়ের চেয়ে লাউশাক, মুলার চেয়ে মুলা শাক, কুমড়ার চেয়ে কুমড়া শাক, পুষ্টিমানে শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে বেশ কিছু অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত, অন্য কথায় সামাজিক মর্যাদায় নিম্ন স্থানীয় শাক-সবজি যেমন- হেলেঞ্চা, ডাটাশাক, কলমী শাক, কচুশাক, সাজনা পাতা, বকফুল শাক, নটে শাক, নিম পাতা ইত্যাদি শাক সমূহ পুষ্টিমানের দিক থেকে বহু দামী শাকের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অথচ আমাদের সমাজে এসব শাকের তেমন কদর নেই। আবার খাদ্য ও খাদ্য উপাদান সম্বন্ধে ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব উচ্চমানের খাদ্যকে অবহেলা করছি। এটা আমাদের অজ্ঞতা। খাদ্যের প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য। তাই আমাদেরকে এসব অজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে এসব খাবারের উৎপাদন বাড়ানো উচিত ও বেশী করে খাওয়া উচিত।

শাক-সবজি রান্না ও পুষ্টিমান

শাক-সবজি রান্নার প্রক্রিয়ার সাথে পুষ্টিমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আমাদের দেশে শাক-সবজি জমি থেকে আনার পর বা বাজার থেকে আনার পর যেভাবে কাটা, ধোয়া ও রান্না করা হয়, তাতে অনেক খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- শাক-সবজি ধুয়ে কুটতে হয়, কেটে ধুতে হয় না। কারণ কাটার পর শাক-সবজির দেহের পানিতে দ্রবনীয় আবরণ খুয়ে যায় এবং এ অবস্থায় ধুলে পানির সাথে যাবতীয় পুষ্টি উপাদান ধুয়ে যায়। পানিতে দ্রবনীয় পুষ্টি উপাদানের মধ্যে ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি, ধাতব মৌল ও আমিষের অপচয় বেশী হয়। অন্যদিকে শাক-সবজি রান্না করলে যে পানি শাক-সবজি থেকে বের হয়, তা দেখা যায় না। এই পানিতে থাকে প্রচুর পুষ্টি উপাদান। শাক-সবজি রান্নার সময় যথেষ্ট সাবধান হতে হয়। কারণ রান্নার সময় পাত্রের ঢাকনা খোলা রাখলে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' তাপে নষ্ট হয়। তাই শাক-সবজি যতদুর সম্ভব অল্প সময়ে রান্না করা উচিত ও রান্নার সময় পাতিলের মুখে ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে। ঢাকা অবস্থায় এসব পুষ্টি উপাদন কিছুটা কম নষ্ট হয়। অন্যদিকে শাক-সবজি সব সময় তাজা খেতে হয়। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহলো শাক-সবজি কাটবার পদ্ধতি। দেখা গেছে কোন কোন পুষ্টি উপাদানের বেশীর ভাগ অংশ চামড়ার কাছাকাছি থাকে। তাই চামড়া না ফেলেই এসব শাক-সবজি খাওয়া উচিত।

উপসংহার

আমাদের দেহকে সুস্থ সবল ও কার্যক্রম রাখতে শাক-সবজি অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের দৈনিক প্রায় ৩০০ গ্রাম শাক-সবজি খাওয়া উচিত। বর্তমানে আমরা মাত্র ১২০ গ্রাম শাক-সবজি খেয়ে থাকি।

ফলে আমাদের দেশের লোকদের স্বাস্থ্য দুর্বল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, জীবনী শক্তি কম, উৎপাদন ক্ষমতা কম। বছরে অনেক শিশু ভিটামিন-এ এর অভাবে অন্ধ হচ্ছে, শতকরা ৭০-৮০ ভাগ রক্তস্বল্পতায় ভুগছে, শতকরা ৯৩ জনের ভিটামিন-সি এর অভাব রয়েছে। এ চিত্র বড় বেদনাদায়ক। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও মাটি প্রচুর শাক-সবজি উৎপাদনের অনুকুলে। আমরা সারা বছর নানা জাতের শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারি এবং আমাদের শাক-সবজির অভাব মেটাতে পারি। সারা বছর উৎপাদনযোগ্য শাক-সবজির মধ্যে মূলাশাক, ডাঁটাশাক, লউশাক, কুমড়া শাক, কলমী শাক, লাল শাক, পুঁইশাক, পালং শাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব শাক-সবজি পুষ্টিমানের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। শাক-সবজি নিয়মিত উৎপাদন করে আমরা অতি সহজেই শাক-সবজির ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সু-স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে পারি। এ জন্য প্রয়োজন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সুসঙ্গত উদ্যোগ।

পাঠ-১৪
রক্তস্বল্পতা

রক্তস্বল্পতা কি?

মানবদেহে রক্তে গড়ে ১৪.৮ গ্রাম % হিমোগ্লোবিন থাকে। রক্তে ১১ গ্রাম % হিমোগ্লোবিন চেয়ে কম হলে রক্তস্বল্পতা বলা হয়। তবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সকলের সমান নয়।

স্বাভাবিক পুরুষদের হিমোগ্লোবিন মাত্রা	-	১৪-১৬ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার
স্বাভাবিক মহিলাদের হিমোগ্লোবিন মাত্রা	-	১২-১৪ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার
নবজাতকের	-	১৯ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার
শিশুদের	-	১১.৫ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার

হিমোগ্লোবিনের মাত্রানুযায়ী রক্তস্বল্পতাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

স্বাভাবিক	-	১১-১৪/১০০ মিলি লিটার
স্বল্পমাত্রার রক্তস্বল্পতা (+)	-	৮-১০.৯/১০০ মিলি লিটার

মধ্যম মাত্রার রক্তস্বল্পতা (++) - ৬-৭.৯ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার

অত্যাধিক মাত্রার রক্তস্বল্পতা (+++) - ৬ গ্রাম/১০০ মিলি লিটার এর কম

রক্তস্বল্পতার কারণ

- খাদ্যে লৌহ, আমিষ এবং ভিটামিন-বি এর অভাব।
- বক্রকৃমির কারণে অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ।
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- ম্যালেরিয়ার কারণে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়া।
- কম ওজনের শিশু এবং যমজ বাচ্চাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কম হয়।
- গর্ভকালে মায়ের রক্তস্বল্পতা থাকলে শিশু রক্তস্বল্পতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।
- ঘন ঘন বাচ্চা হওয়া।
- ৬ মাস বয়সের পর শিশুদের শুধুমাত্র দুধ খাওয়ালে শিশুর রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
- অস্থিমজ্জার অসুখের কারণে কম রক্তকণিকা উৎপন্ন হওয়া।
- লোহিত কণিকা ভেঙ্গে গেলে (Hemolytic Anaemia) রক্তস্বল্পতা হয়।

রক্তস্বল্পতার চিহ্ন ও লক্ষণ

- হিমোগ্লোবিনের কারণেই রক্তের রং লাল হয়। রক্তস্বল্পতায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে শরীরের বিভিন্ন স্থানের ঝিল্লি ফ্যাকাশে দেখায়।
- চোখের পাতার ভেতরের দিক (Conjunctiva) ফ্যাকাশে দেখাবে।
- ঠোঁট ও জিহ্বার ঝিল্লি ফ্যাকাশে দেখাবে।
- হাতের তালু এবং নখও ফ্যাকাশে দেখাবে।
- রোগী দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠার অভিযোগ করতে পারে।
- রক্তের ঘনত্ব কমে যাওয়ার ফলে শরীরে পানি (Oedema) দেখা দিতে পারে।
- রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শ্বাস এবং নাড়ীর গতিও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হবে।
- তীব্র রক্তস্বল্পতার কারণে হৃদপিন্ডের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে (Heart Failure)।

রোগীর রক্তস্বল্পতা নির্ণয়

আমাদের শরীরের যেসব জায়গায় মিউকাস মেমব্রেন খুবই পাতলা সেখান দিয়ে ভেতরের প্রবাহমান রক্তের রং দেখা যায়। রক্তস্বল্পতা হলে এই সব মিউকাস মেমব্রেন ফ্যাকাশে দেখায়। সাধারণত: চোখের নীচের পাতার ভেতরে, জিহ্বার এবং ঠোঁটের মিউকাস মেমব্রেনে রক্তস্বল্পতা পরীক্ষা করা হয়।

চোখের নীচের পাতায় মিউকাস মেমব্রেন পরীক্ষা করার জন্য-

- মিউকাস মেমব্রেন পরীক্ষা করার আগে কি করতে যাচ্ছেন রোগীকে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- রোগীর মুখোমুখি বসুন।
- দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চোখের নীচের পাতা নিচের দিকে টেনে ধরুন।
- এখন রোগীকে উপরের দিকে তাকাতে বললেই চোকের মিউকাস মেমব্রেন স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। বেশ কয়েকজনের চোকের পাতা পরীক্ষা করলেই মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে রক্তস্বল্পতায় মিউকাস মেমব্রেন কেমন দেখায়।
- জিহ্বায় রক্তস্বল্পতা দেখায় জন্য রোগীকে জিহ্বা বের করতে বলতে হবে এবং জিহ্বার আগা নিরীক্ষণ করতে হবে।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ জানার জন্য রক্ত পরীক্ষা

১. রক্ত পরীক্ষার সব উপকরণ তৈরী করে নিতে হবে। যেমন- একটি ট্রেতে স্পিরিট, কিডনি ট্রে, তুলা ল্যানসেট/সূঁচ।

২. রোগীর কাছে ব্যাখ্যা করুন যে তার রক্তস্বল্পতা আছে কি না তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাকে আস্বস্ত করুন এতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

৩. ভালভাবে আপনার হাত ধুয়ে নিন।

৪. রোগীর আঙ্গুলের মাথার দিকটা তুলায় স্পিরিট লাগিয়ে পরিস্কার করে নিন (সাধারণতঃ বাম হাতের অনামিকা)।

৫. আঙ্গুলের যে জায়গা থেকে রক্ত নিবেন তার ঠিক নীচেই দুই আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরুন।

৬. জীবাণুমুক্ত একটি সুচ দিয়ে আঙ্গুলের মাথার চামড়া ফুঁড়ে দিন।

৭. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি তুলা দিয়ে মুছে ফেলুন।

৮. তারপর রক্তের একটি ফোঁটা স্কালা কাগজে শুষে নিন।

৯. রোগীকে এক টুকরা পরিস্কার তুলা দিয়ে ফুটো করা জায়গাটি রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখতে বলুন।

১০. কাগজে রক্তের রং চার্টের শতকরা হিসাবের রংয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

১১. ফলাফল ঃ

ক) স্বাভাবিক - শতকরা ৮০ এর উপরে

খ) স্বল্পমাত্রার রক্তস্বল্পতা - ৮০% এর কম হলে

গ) মধ্যম রক্তস্বল্পতা - ৬০% এর কম হলে

ঘ) মারাত্মক রক্তস্বল্পতা - ৪৫% এর কম হলে

১২. আপনার হাত ভালভাবে ধুয়ে নিন।

১৩. ফলাফল লিপিবদ্ধ করুন।

১৪. ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিন (চিকিৎসা ৫০% এর উপরে এবং রেফার ৫০% এর নীচে)।

১৫. কাজ শেষে জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিবার নতুন সূঁচ ব্যবহার করতে হবে নতুবা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পদ্ধতিতে শুধু হিমোগ্লোবিনের শতকরা হার জানা সম্ভব। সঠিক পরিমাণ জানার জন্য পদ্ধতি Haemoglobin Estimation ব্যবহার করে হিমোগ্লোবিন পরিমাণ জেনে নিতে হবে।

রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা

ফেরাস সালফেট বড়ি ৬০ মিঃ গ্রাঃ আয়রন+ফলিক এসিড ০.২৫ মিঃ গ্রাম।

সরবরাহ ঃ প্রতি ট্যাবলেট ফেরাস সালফেট ৬০ মিঃ গ্রাঃ এবং ফলিক এসিড ০.২৫ মিঃগ্রাঃ।

ব্যবহার ঃ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের রক্তস্বল্পতা এবং শরীরের লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতায় এই বড়ি খুবই উপাকারী।

মাত্রা	০-১ বৎসর	১-৫ বৎসর	৬-১২ বৎসর	পূর্ণ বয়স্ক
প্রতি ট্যাবলেট ফেরাস সালফেট ৬০ মিঃ গ্রাঃ আয়রন+ফলিক এসিড ০.২৫ মিঃ গ্রাম	১/৪ করে দিনে ২ বার	১/২ টি করে দিনে ৩ বার	১ টি করে দিনে ২ বার	১টি করে দিনে ৩ বার

কতদিন খাওয়াতে হবে ঃ প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ রক্তস্বল্পতা সেরে না উঠা পর্যন্ত (সাধারণতঃ ১-৩ মাস)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার সময়কাল গর্ভকালীন সময় এবং প্রসবের পর তিন মাস পর্যন্ত চিকিৎসা চালাতে হবে।

উপদেশ

- উত্তম শোষনের জন্য ঔষধ খালি পেটে, খাবারের এক ঘন্টা আগে বা দুই ঘন্টা পরে খেতে হবে।
- খাদ্যের আয়রণ শোষনের জন্য লেবু খাবেন। কারণ ভিটামিন-সি আয়রন শোষনে সাহায্য করে।

- আয়রণ বড়ি খেলে পেটের সমস্যা, সাথে বুক জ্বালা, বমি বমি ভাব, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা পাতলা পায়খানা হতে পারে।
- অশোষিত আয়রণের কারণে পায়খানার রং কালো হয়। এতে কোন ক্ষতি হয় না।
- আয়রণ যুক্ত খাবার : যেমন- সবুজ শাক-সবজি, কচু শাক, সীমের বীচি, কচু, কলা, পেয়ারা, ডাল ও অন্যান্য বীচি জাতীয় খাবার; আটার রুটি, কলিজা এবং সব রকম স্বাভাবিক খাওয়ার কথা বলতে হবে।
- বাড়ীর আশে পাশে ছোট বাগান করে শাক-সবজি লাগানো শিখাতে হবে এবং হাঁস মুরগী পালনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- শাক-সবজি ধুয়ে কেটে রান্না করার জন্য বলতে হবে যাতে খাবারের লৌহ নষ্ট না হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে আসতে বলতে হবে।

রেফার

- মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় রেফার করতে হবে।
- যদি রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৪৫% অথবা ৬ গ্রাম/১০০ মিঃলিঃ এর কম হয় তাহলে রোগীকে রক্ত দিতে হবে। এক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে রেফার করুন।
- যদি রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় বা নাড়ীর গতি মিনিটে ১০০ এর উপরে হয় তাহলেও অবিলম্বে রেফার করুন।
- রোগীর শরীরে যদি পানি আসে তা হলেও রেফার করতে হবে।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য শিক্ষা

রক্তস্বল্পতার প্রতিরোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ

- সুষম খাদ্য গ্রহণ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায়। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় লৌহ জাতীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- সবুজ পাতাযুক্ত শাক। লাল শাক, কাঁচা কলা, কলার থোর, কচুশাক, কচুর লতি, ডাল, গমজাত খাদ্য এবং গুড় থাকতে হবে। অর্থের সমস্যা না থাকলে প্রাণীজ খাবার যেমন- কলিজা, ডিম, মাংস, খাওয়ার উপদেশ দিতে হবে।
- গর্ভবতী মায়েদের সুষম খাদ্যের পাশাপাশি আয়রণ বড়ি দিতে হবে এবং বিশেষ করে লোহাযুক্ত খাবার বেশী দিতে হবে। কারণ মায়ের শরীরে লোহার যে সঞ্চয় গড়ে উঠে তা শিশুর শরীরে সঞ্চালিত হয়।
- যে সব শিশু গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই জন্ম নিয়েছে তাদেরকে শালদুধসহ প্রথম ৬ মাস কেবলমাত্র মায়ের দুধ অবশ্যই দিতে হবে। কোন বাড়তি পানীয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।
- ৬ মাস বয়স পূর্ণ হবার পর লৌহসমৃদ্ধ বাড়তি খাবার দিতে হবে।
- গর্ভবতী মায়েদের পরিমাণ বেশী এবং লৌহ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সব রকমের খাবার দিতে হবে।
- লেবু জাতীয় টক ফল দিতে হবে কারণ টক ফলের ভিটামিন-সি খাদ্যের লৌহ শোষনে সহায়তা করে।

- কৃমি যাতে না হয় তার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে। খালি পায়ে পায়খানায় যাওয়া উচিত নয়। পায়খানার পর হাত সাবান/ ছাই দিয়ে ধুতে হবে। খালি পায়ে চলাফেরা করা যাবে না।
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য খেতে হবে।
- খাওয়ার আগে হাত সাবান/ ছাই দিয়ে ধুতে হবে। গৃহকর্তাকে লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দিতে হবে।
- বাড়ির আশে পাশে শাক-সবজি লাগাতে হবে ও হাঁস-মুরগী পালতে হবে।
- যে সমস্ত কারণে রোগীর রক্তস্বল্পতা হতে পারে, যেমন-

  ক) অর্শ্ব রোগ, খ) পেপটিক আলচার

  গ) কৃমি সংক্রমণ, ঘ) মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

পাঠ-১৫
মায়ের দুধ খাওয়ানো ও শিশু পুষ্টি

মায়ের দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। শিশু জন্মের পর পরই শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানো বিশেষ প্রয়োজন। শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিতে হবে এমনকি এক ফোটাঁ পানিও না।

শালদুধঃ

শিশু জন্মের পর প্রথম ৩-৫ দিনের মধ্যে মায়ের স্তন থেকে হলুদ রঙের ঘন আঠালো যে দুধ বের হয় তাকে শালদুধ বলে। শালদুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য ভিটামিন থাকে যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিশুর জন্মের পরপরই (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো বিশেষ প্রয়োজন।

মায়ের দুধের উপকারিতাঃ

মায়ের দুধের উপকারিতা অনেক। সেগুলো হচ্ছে–

শিশুর উপকারিতা-

- শাল দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর
- মায়ের দুধে এন্টিবডি থাকে যা শাল দুধে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই এন্টিবডি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিশুর অসুখ কম হয় যেমন- জন্ডিস,ডায়রিয়া, কান পাকা, সর্দি-কাশি, চুলকানি, নিউমোনিয়া, সেপসিস ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা কমে যায়, এছাড়াও এতে প্রচুর ভিটামিন-এ থাকে
- পরিমাণে কম হলেও এই শাল দুধ প্রথম তিন দিনের জন্য যথেষ্ট
- জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের বুকে দিলে সে দুধ চুষে খেতে শিখে এবং এতে মায়ের দুধও তাড়াতাড়ি তৈরীহয়
- শাল দুধ শিশুর প্রথম কালো পায়খানা বের হতে সাহায্য করে
- শিশুর শরীরে যতটুকু পানির দরকার তা মায়ের দুধে বিদ্যমান
- শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়
- মায়ের দুধ সবসময়ই নিরাপদ। এটি বাসি হওয়া এবং সংক্রমিত হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সবসময় সঠিক তাপমাত্রায় থাকে এবং এই দুধ তৈরীর ঝামেলা নাই
- মায়ের দুধ শিশুর চোয়াল,দাঁত ও মাড়ি গঠনে সহায়তা করে
- মায়ের দুধ দেয়ার সময় মায়ের শরীরের সাথে লেগে থাকার কারণে শিশু মায়ের উষ্ণতা পায়, যা শিশুর জন্য খুব প্রয়োজন
- শিশুর অসুস্থতার সময় দিনে-রাতে ঘন ঘন মায়ের দুধ দিলে শিশু তাড়াতাড়ি অসুখ থেকে সেরে উঠেএবং অপুষ্টি থেকে রক্ষা পায়

মায়ের উপকারিতাঃ

জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালেঃ-

- মায়ের জরায়ু দ্রুত সংকুচিত হয় এবং তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরে যায়

- গর্ভফুল তাড়াতাড়ি বের হয় এবং রক্তপাত কম হয় (সেজন্য সিজারিয়ান সেকশনের পরও শিশুকে দুধ দেয়ার জন্য মাকে সাহায্য করতে হবে)
- মায়ের দুধ বেশী বেশী করে তৈরী হয়
- মা মানসিক তৃপ্তি পান

পরিবারের উপকারিতাঃ

- কৃত্রিম দুধ, দুধ তৈরির সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং জ্বালানি-পানির খরচ বেঁচে যায়
- শিশু কম অসুস্থ হয় তাই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় ও খরচ বাঁচে
- পরিবারের অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সর্বোপরি মায়ের তথা পরিবারের দুশ্চিন্তা কমে

শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোঃ

জন্ম থেকে পূর্ণ ৬ মাস(১৮০ দিন)পর্যন্ত কোন শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দেয়া, বাইরের কোন খাবার বা এমন কি এক ফোঁটা পানিও না দেয়া, শিশুর পুষ্টি রক্ষার জন্য এসময় শুধুমাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট।

মায়ের দুধ দেয়ার সময় সঠিক পজিশন ও এ্যাটাচমেন্ট(সংস্থাপন) এবং মায়ের দুধ গেলে বের করাঃ

সঠিকপজিশন ও এ্যাটাচমেন্টঃ

সঠিক পজিশন (অবস্থান) এর ৪ টি মূল বার্তাঃ

শিশুকে সঠিকভাবে দুধ খাওয়ানোর জন্য, তাকে সঠিকভাবে মায়ের বুকে লাগাতে হবে, নাহলে শিশু ঠিকমত দুধ পাবে না, এজন্য যা করতে হবে-

- শিশুর মাথা ও শরীর একই লাইনে থাকবে
- শিশুর শরীর মায়ের সাথে নিবিড়ভাবে লাগানো থাকবে
- মা শিশুর সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধরে থাকবে ও
- শিশু যখন স্তনের দিকে এগোবে তখন তার নাক স্ড়নেরবোঁটা বরাবর থাকবে

সঠিকএ্যাটাচমেন্ট (সংযোগ) এর ৪ টি মূলবার্তাঃ

শিশুকে মায়ের স্তনে সঠিকভাবে লাগালে সে মায়ের দুধ ভালোভাবে টেনে/চুষে খেতে পারে এবং এতে তার পুষ্টির চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হবে এবং সে ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। মায়ের বুকে শিশু লেগে থাকার জন্য যা করতে হবে-

- শিশুর মুখ বড় করে হা করা থাকবে
- নিচের ঠোঁট বাইরের দিকে উল্টানো থাকবে
- শিশুর থুতনি মায়ের স্তনে লেগে থাকবে
- স্তনের কালো অংশ(অ্যারিওলা) নিচের দিকের চেয়ে ঠোঁটের উপরের দিকে বেশী দেখা যাবে

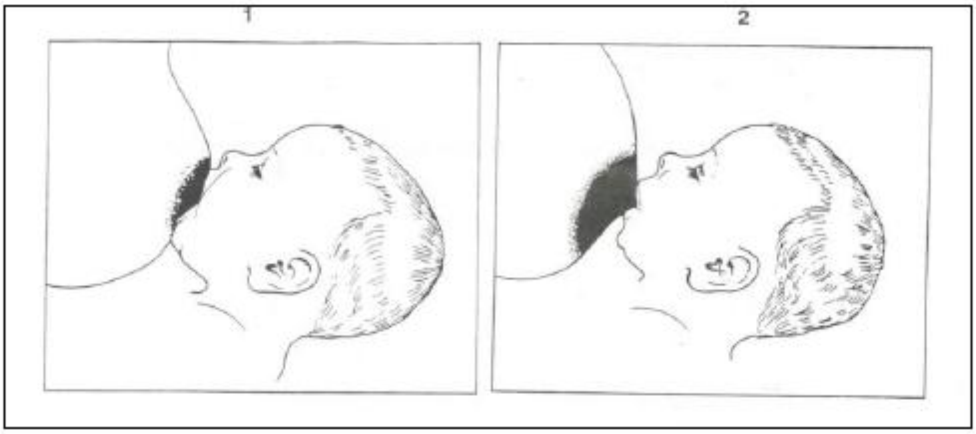

ছবি ১: সঠিক সংস্থাপন **ছবি ২: ভুল সংস্থাপন**

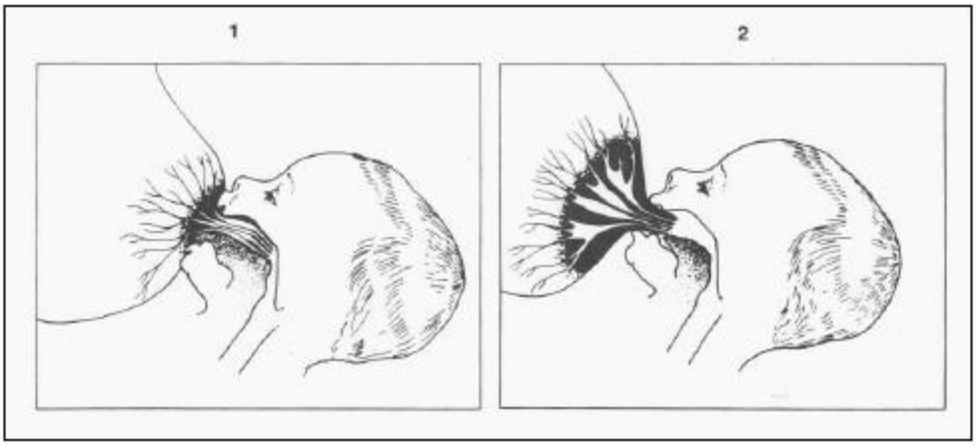

ছবি ১:

সঠিক সংস্থাপন **ছবি ২: ভুল সংস্থাপন**

মায়ের দুধ গেলে বের করা:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মায়ের দুধ গেলে বের করার প্রয়োজন:

- মায়েরা যখন বাইরে কাজ করতে যান
- কম ওজনের জন্ম নেয়া শিশু যারা মায়ের দুধ টেনে খেতে পারে না
- মারাত্মক অসুস্থ শিশু যারা মায়ের দুধ টেনে খেতে পারে না
- মায়ের বুকে দুধ জমে স্তন ফুলে গেলে
- মায়ের স্তনের বোঁটা ফেটে গেলে বা ঘাঁ হলে

মায়ের দুধ গেলে বের করার নিয়মাবলী:

হাত দিয়ে মায়ের দুধ গেলে বের করা সবচেয়ে সহজ। মায়ের উচিত নিজের বুকের দুধ নিজেই গেলে বের করা কারন যদি অন্য কেউ তা করে দেয় তাহলে মা ব্যথা পেতে পারে।

- মায়ের হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুতে হবে

- দুধ গেলে রাখার পাত্রটি বড় মুখওয়ালা একটি বাটি বা কাপ হতে হবে এবং তা ভালভাবে পরিস্কার করে নিয়ে মাকে আরামদায়ক ভাবে বসতে হবে
- বুড়ো আঙ্গুল স্তনের উপরের কালো অংশে ও বাকী ৪টি আঙ্গুল স্তনের নীচে কালো অংশে আস্তে আস্তে বার বার চাপ দিতে হবে এবং ছাড়তে হবে, এভাবে বার বার করতে হবে
- প্রথমে দুধ না আসলেও পরে ফোঁটায় ফোঁটায় দুধ বের হয়ে আসবে। স্তনের কালোঅংশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে দুধ বের করতে হবে। বোঁটায় চাপ দেয়া উচিত নয়। বোঁটায় চাপ দিয়ে বা বোঁটা টেনে দুধ বের করা যায় না
- এক স্তন থেকে কমপক্ষে ৩-৫ মিনিট পর্যন্ত দুধ বের করা যেতে পারে। সেই স্তনের দুধ যখন আর বেশী করে বের হবে না তখন আরেক স্তন থেকে দুধ বের করতে হবে
- প্রথম কয়েকদিন মায়ের দুধ গেলে বের করতে ২০-৩০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হতে পারে

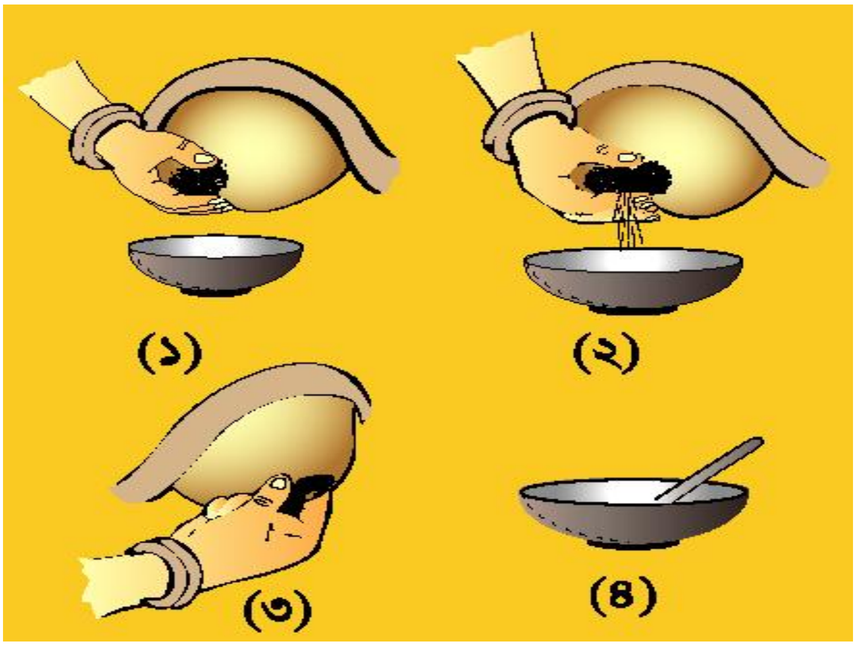

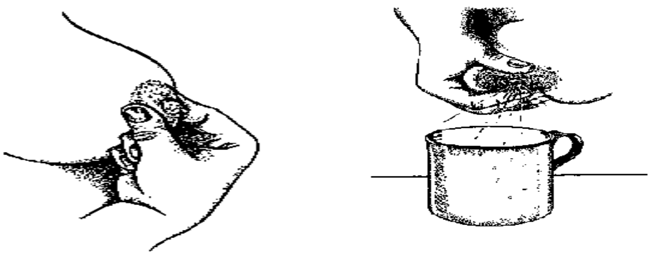

চিত্র: হাত দিয়ে দুধ গেলে বের করার পদ্ধতি কাপ/বাটির সাহায্যে

গালানো দুধ শিশুকে বাটি/ কাপের সাহায্যে খাওয়ানোর নিয়মাবলী:

- শিশুকে কোলের উপর আধশোয়া অবস্থায় ধরতে হবে
- বাটিতে/কাপে/চামচে দুধ নিয়ে শিশুর নীচের ঠোঁটে স্পর্শ করতে হবে এবং কাপটি/ বাটি/চামচে সামান্য একটু কাত করে দুধ ঠোঁটে ছোঁয়াতে হবে। তখন শিশু নিজেই দুধ চুক চুক করে খাবে
- যতক্ষন পর্যন্ত শিশু দুধ খাবে ততক্ষন দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে

- চাহিদা অনুযায়ী মায়ের দুধ দিতে হবে। শিশুকে বার বার খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৮-১২ বারের কম নয়
- দুধ কখনই শিশুর মুখে ঢেলে দেয়া যাবে না

গেলে বের করা মায়ের দুধ সংরক্ষণের পদ্ধতি:

- গালানো দুধ একটি পরিস্কার ও ঢাকনা যুক্ত পাত্রে রাখতে হবে
- ঘরের ভিতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মায়ের দুধ ৬-৮ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায় অথবা ফ্রীজে/ডিপফ্রীজে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত গালানো মায়ের দুধ সংরক্ষণ করা যায়
- একটি পাত্রে কুসুমগরম পানি নিয়ে তার ভেতরে দুধের বাটি রেখে গরম করা যায়। মায়ের দুধ আগুনে গরম করা উচিত নয়
- গালানো দুধ শিশুকে বোতলে না খাইয়ে বাটি/ কাপের/চামচে সাহায্যে খাওয়াতে হবে। বোতল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত নয় কারণ এটা পরিস্কার করা কষ্টকর এবং সহজেই জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় কিছু অসুবিধা ও তার সমাধান:

স্তন ফুলে উঠা (এনগর্জমেন্ট):

লক্ষণ	প্রতিরোধ	সমাধান

• স্তন ফুলে উঠে, উষ্ণ ও লালচে হয়, মা স্তনে ব্যথা ও হালকা জ্বর অনুভব করেন এবং স্তনের বোঁটা স্তনের কালো অংশে মিশে যায়। • স্তন শক্ত হয়ে যায়	• সঠিক সংযোগ এবং অবস্থান মেনে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে • শিশুকে জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১ঘণ্টার মধ্যেমায়ের দুধ খাওয়াতে হবে • শিশুর চাহিদা অনুযায়ী মায়ের দুধ দিতে হবে। দিনে ও রাতে ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৮-১২ বার খাওয়াতে হবে • শিশুকে এক স্তনের দুধ খাওয়ানো শেষ হলে অন্য স্তনের দুধ খাওয়াতে হবে • বোতলে দুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে, এমনকি চুষনিও ব্যবহার করা যাবে না	• ফুলা কমানোর জন্য স্তনে পর্যায়ক্রমে ঠান্ডা এবং গরম পানিতে ভেজা কাপড় দিয়ে সেঁক দিতে হবে • স্তন চেপে কিছু দুধ গেলে বের করতে হবে • শিশুকে বারবার এবং বেশীক্ষণ ধরে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে • সঠিক সংযোগ এবং অবস্থান মেনে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে

স্তনের বোঁটায় ঘাঁ বা ফেটে যাওয়া:

লক্ষণ	প্রতিরোধ	সমাধান
• বোঁটায় ব্যথা হয় • স্তনের বোঁটায় ফাটল (Crack) দেখা যায় • কখনো কখনো রক্তক্ষরণ হতে পারে	• সঠিক সংযোগ এবং অবস্থান অনুযায়ী বুকের দুধ খাওয়াতে হবে • জোর পূর্বক শিশুকে স্তন থেকে আলাদা করা যাবেনা • এ সময় ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিধান করতে হবে	• সঠিক সংযোগ ও অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে • ফেটে যাওয়া বোঁটায় মায়ের দুধ লাগিয়ে বাতাসে শুকাতে হবে

যথেষ্ট পরিমাণে দুধ তৈরি না হওয়া:

একজন মা যদি মনে করেন যে তার যথেষ্ট দুধ হচ্ছে না, সেই ধারনা সবসময় সঠিক নয়।

লক্ষণ	প্রতিরোধ	সমাধান

• শিশু যদি কান্নাকাটি করে, দিনে-রাতে ৬ বারের বেশি প্রস্রাব না করে, ঠিক মত না ঘুমায় এবং ওজন ঠিকভাবে না বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে শিশু ঠিক মত দুধ পাচ্ছে না	• শিশু যাতে ভালোভাবে মায়ের দুধ চুষতে ও টানতে পারে তা খেয়াল রাখতে হবে • শিশু যখনই চাইবে তখনই বারে বারে তাকে দুধ দিতে হবে • শিশুকে বোতল (ফিডার) বা চুষনি দেয়া যাবে না • ছয় মাসের ভেতর কোন রকমের বাইরের খাবার এমন কি একফোঁটা পানিও দেয়া যাবে না	• দুধ দেয়ার সময় মা ও শিশুর অবস্থান ও সংযোগ ঠিক আছে কিনা তা র্পযবেক্ষন করতে হবে। ভুল থাকলে ঠিক করে দিয়ে মাকে শিখিয়ে দিতে হবে • যদি সঠিক সংযোগ ও অবস্থান ঠিক থাকে অথচ শিশু দুধ কম পাচ্ছে- তাহলে ডাক্তারের পরামর্শের জন্য রেফার করতে হবে • বারে বারে বেশী সময় নিয়ে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে তাতেআরো বেশি পরিমাণে দুধ তৈরি হবে

স্তনের বোঁটা সমতল বা ভিতরে ঢোকানো:

লক্ষণ	প্রতিরোধ	সমাধান
• স্তনের বোঁটা সমতল হবে বা ভিতরে ঢোকানো থাকবে	• গর্ভকালীন৩য় তিন মাস (3rd trimester) এর সময় থেকে স্তন Massage করে বা নিপল বের করার (Nipple evert) পদ্ধতি নেয়া যেতে পারে	• মাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে কিছু নিয়ম মেনে চললে এটা ঠিক হয়ে যাবে এবং শিশু ঠিকমত দুধ পাবে • মাকে বলতে হবে শিশু স্তনের বোঁটা থেকে নয়, সে স্তনের কালো অংশ থেকে দুধ টেনে নেয়। এজন্য শিশুকে মায়ের দুধ দেয়ার সময় মা ও শিশুর সঠিক সংযোগ এবং অবস্থান মেনে মায়ের দুধ খাওয়ানো দেখিয়ে দিতে হবে • বারে বারে শিশুকে দুধ চুষতে দিলে বোঁটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসবে

শিশুকে মায়ের দুধ দেয়ার ব্যাপারে কিছু কুসংস্কার/ভুলধারণা:

- মায়ের প্রথম দুধ যা ঘন ও হলুদাভ রঙের, দেখতে খারাপ লাগে শিশুকে এটা খাওয়ালে তার পেটের অসুখ হবে
- কোন মা অপুষ্টিতে ভূগলে তার শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাবেনা
- কোন শিশুর পাতলা পায়খানা হলে মা'র শাক খাওয়া যাবে না
- চিকন মায়েদের চেয়ে মোটা বা স্বাস্থ্যবান মায়েদের দুধ বেশি পরিমাণে তৈরি হয়
- গরীব ও গ্রামের মায়েদের দুধ কম তৈরি হয়

সমাধানঃ

মায়েদের বোঝাতে হবে এগুলো ভুল ধারণা, প্রতিটি মা'র বুকে তার শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ থাকে। শুধু এর জন্য প্রয়োজন কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং মায়ের খাবারের প্রতি খেয়াল রাখা।

মায়ের দুধের বিকল্প/ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট (বি এম এস) কোডঃ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গেজেটের মাধ্যমে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেন। বিকল্প শিশু খাদ্য বাজারজাত করার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বানিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য বা ব্যবহারের সরঞ্জামাদির বিজ্ঞাপন লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা অনুরূপ কোন দলিল বিতরণ করার জন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বা ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করা
- উপহার সামগ্রী, ডিসকাউন্ট কুপন, মূল্যহ্রাস বা বিনামূল্যে কোন সামগ্রী প্রদান বা প্রদানের জন্য কোনরূপ প্রস্তাব করা
- কোন সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক সভা, শিক্ষা সফর বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানসহ উচ্চ শিক্ষায় বা কোন গবেষনামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা স্বাস্থ্কর্মীকে কোনরূপ আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা প্রদান করা
- কোন স্বাস্থ্যকর্মী বা তার পরিবারের কোন সদস্যকে আর্থিক প্রলোভন বা অন্য কোন উপহার প্রদান করা
- শিশুদের জন্য কোন ধরনের প্রতিযোগিতা বা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন বা অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদান করা
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য ও বানিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য,মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা উত্তম বা মাতৃদুগ্ধের সমকক্ষ এরূপ ধারনা দেয়া বা বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোন কর্মসূচী পরিচালনা করা
- কোন গর্ভবতী মহিলা, মাতৃদুগ্ধদানকারী বা শিশুর মায়েদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা বা কোন ধরনের প্রলোভন মূলক প্রস্তাব করা
- যে কোন পণ্যের বিশেষতঃ শিশু পণ্যের (যেমন, ডায়পার, কাপড়, খেলনা, পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী, টয়লেট্রিজ ইত্যাদি) প্রচারের সময় মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য বা তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদির প্রচার সম্পর্কিত কোন ধরনের লিফলেট বা উপহার সামগ্রী বিতরণ করা
- দুর্যোগের সময় কোন প্রতিষ্ঠান বা আশ্রয়কেন্দ্রে বিতরণ করা
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্যএবংবানিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্যবা ব্যবহারের সরঞ্জামাদিবিপননও নিয়ন্ত্রণ আইন

পাঠ-১৬
শিশুর বাড়তি খাবার (৬-২৩ মাস) ও
শিশুর স্বাভাবিক খাবার (২৪-৫৯ মাস)

বাড়তি খাবারঃ

শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হবার পর মায়ের দুধের পাশাপাশি তাকে যে খাবার খাওয়ানো হয় তাকে **"বাড়তি খাবার"** বলে। শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে তার সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শুধু মাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট নয় কাজেই তখন মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেয়া প্রয়োজন। তাই ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন শিশুর বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

সঠিক সময়ে বাড়তি খাবার শুরু করার গুরুত্বঃ

- ৬ মাস (পূর্ণ) হওয়ার আগে শিশুকে বাড়তি খাবার দিলে শিশু মায়ের দুধ খাওয়া কমিয়ে দেয় ফলে সে সঠিক পুষ্টি পায় না, সেজন্য ৬ মাসের পর থেকে বাড়তি খাবার শুরু করতে হয়
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে যতটুকু শক্তি/পুষ্টির প্রয়োজন হয় তা শুধুমাত্র মায়ের দুধে পাওয়া যায়। তবে ৬ মাসের পর থেকে মায়ের দুধ শিশুর জন্য যথেষ্ট নয় সেজন্য তাকে ৬ মাসের পর থেকে বাড়তি খাবার শুরু করতে হয়
- ৬ মাস (পূর্ণ) হলে শিশু বাড়তি খাবার সহজে খেতে, চিবাতে ও গিলতে শিখে এবং খাবার হজম করতে পারে। সেজন্য বাড়তি খাবার শুরু করার এটাই সঠিক বয়স
- ৬ মাস (পূর্ণ) হওয়ার সাথে সাথে বাড়তি খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস না করলে পরে শিশু খেতে শিখবে না, তার সঠিক চাহিদা পূরণ হবে না ফলে সে অপুষ্টিতে ভুগবে

বাড়তি খাবারের উপকারিতা:

- মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেয়া শুরু করলে শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হয়
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং বুদ্ধি ভাল হয়
- সঠিক বাড়তি খাবার খেলে শিশুর অসুখ কম হয় এবং সাধারন অসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠে

বাড়তি খাবার খাওয়ানোর সুপারিশমালা:

শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের বাড়তি খাবার খাওয়ানোর উপর কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা গুলো হলো:

১. **বিভিন্ন ধরনের খাবার-** বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক খাবার থেকে শিশুর জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে। ঘাটতি পূরনের জন্য ভিটামিন "এ" এবং "আয়রন" সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে শিশুরপছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২. **খাবারের পরিমান-** ছয় মাসের পর থেকে শিশু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই তার খাবারের পরিমানও সেভাবে বাড়াতে হবে

৩. **খাবারের ঘনত্ব-** শিশু বড় হয়ে উঠার সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী খাবারের ঘনত্ব বাড়াতে হবে

৪. **খাবারের বার-** শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে যেহেতু তার খাবারের পরিমানও বাড়বে সেজন্য সে খাবারটুকু তাকে সঠিক নিয়মে বারে বারে দিতে হবে

- **শিশুর ইশারা বুঝে (Responsive Feeding) খাওয়ানো-** শিশুকে জোর না করে সে যাতে খাবারে উৎসাহ ও আনন্দ পায়,সেভাবে খাওয়াতে হবে
- **সঠিক/স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়তি খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ-** পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সাথেবাড়তি খাবার তৈরি ও খাবার ঢেকেসংরক্ষণ করতে হবে

৫. **অসুস্থতার সময়ে ও অসুস্থতার পরে খাওয়ানো-** অসুস্থতার সময়ে মায়ের দুধ খাওয়া বাড়িয়ে দিতে হবে ও অসুস্থতার পরে অতিরিক্ত বাড়তি খাবার দিতে হবে

সুপারিশ সমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল:

১. **বিভিন্ন ধরনের খাবার:** বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক খাবার থেকে শিশুর জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে।

নিচে দেয়া বিভিন্ন খাবারের তালিকা থেকে কমপক্ষে ৪টি ভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে শিশুর জন্য প্রতি দিনের খাবার তৈরি করতে হবে এবং এর ভিতর দিনে অন্ততপক্ষে ১টি প্রাণীজ খাবার থাকতে হবে-

১) শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন- ভাত, রুটি, চিড়া, আলু, সুজি

২) বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম

৩) দুধ এবং দুধ দিয়ে তৈরি খাবার

৪) প্রাণীজ খাবার যেমন- মাছ, মাংস, মুরগীর কলিজা

৫) ডিম

৬) গাঢ়ঘন সবুজ ও লাল শাক; এছাড়াও হলুদ ও কমলা রঙের সব্জি ও ফল, যেমন- মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পাকা আম, পাকা পেঁপে

৭) অন্যান্য শাক সব্জি ও ফল যেমন: লাউ, ঝিংগা, ফুলকপি, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি

চি[illegible] ধরনের পারিবারিক খাবার

- বিভিন্ন ধরনের মিশ্রিত খাবার শিশুর পূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করবে, কারণ বিভিন্ন ধরনের খাবারে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি থাকে
- বিভিন্ন ধরনের খাবার না খাওয়ালে শিশু মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যার কারণে শিশু সব সময় অসুখ-বিসুখে ভোগে

- বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ালে একটি শিশুর ৬-২৪ মাস বয়সের সময়ে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে বেড়ে উঠে এবং তার বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে
- শিশুর খাবারে তেল বা ঘি দেয়া ভাল, এতে শক্তির পরিমান বেশী থাকে
- চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করা ভালো, কারন গুড় আয়রনের ভালো উৎস
- শিশুদের দেশীয় ওমৌসুমিফলমূল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে
- আয়রন ও ভিটামিন 'এ' ঘাটতি পূরণের জন্য মা ও শিশুকে ভিটামিন 'এ' ও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে

২. **খাবারের পরিমান:** ছয় মাসের পর থেকে শিশু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই তার খাবারের পরিমানও সেভাবে বাড়াতে হবে।

- এসময় তার যথাযথ চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হলে সে সঠিকভাবে বেড়ে উঠে
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে এবং বুদ্ধি বাড়ে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর খাবারের পরিমান না বাড়ালে:
    - শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে সে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবেনা, মেধার বিকাশ হবে না, সব সময় অসুখে ভুগবে
    - বড় হয়ে লেখা-পড়ায় ভালো করতে পারেনা, এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়বে

৬-২৩ মাস বয়স অনুযায়ী শিশুর প্রতিদিন খাবারের পরিমান:

বয়স	পরিমান	কতবার	দিনের মোট খাবার
৬-৮ মাস বয়স (পূর্ণ)(৬.১-৮.৯)	২৫০ মি: লি: (১ পোয়া) বাটির আধা (½) বাটি	২-৩ বার	মায়ের বুকের দুধ (শিশু যতবার চাইবে) + পারিবারিক খাবার (প্রানীজ খাবার যেমন: ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ + শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন: চাল, গম, আলু ইত্যাদি + বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম যেমন: মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সবজি ও ফল+অন্যান্য শাক-সব্জি ও ফল)
৯-১১ মাস বয়স (পূর্ণ)(৯.০-১১.৯)	২৫০ মি: লি: (১ পোয়া) বাটির আধা (½) বাটি	৩ বার + ১-২ বার ঘরে তৈরী পুষ্টিকর নাস্তা	পারিবারিক খাবার (প্রানীজ খাবার যেমন: ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ + শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন: চাল, গম, আলু ইত্যাদি + বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম যেমন: মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সবজি ও ফল+অন্যান্য শাক-সব্জি ও ফল) এবং ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা

১২-২৩ মাস বয়স (পূর্ণ)	২৫০ মিঃ লিঃ (১ পোয়া) বাটির এক (১) বাটি	৩ বার + ১-২ বার ঘরে তৈরী পুষ্টিকর নাস্তা	পারিবারিক খাবার (প্রানীজ খাবার যেমনঃ ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ + শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমনঃ চাল, গম, আলু ইত্যাদি + বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম যেমনঃ মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সব্জি ও ফল + অন্যান্য শাক-সব্জি ও ফল) এবং ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা

৩. **খাবারের ঘনত্বঃ** শিশু বড় হয়ে উঠার সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী খাবারের ঘনত্ব বাড়াতে হবে।

- বাড়তি খাবারে ঘনত্ব যত বেশি সঠিক হয় তার পুষ্টিমানও তত বেশি হয়। মাখানো খাবারটি এমন হবে যেন তা চামচ/হাত দিয়ে তুললে সহজে পড়ে না যায় (ছবি)

- শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাবারের ঘনত্বও বাড়ালে তার যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত হয়
- তরল খাবারের চেয়ে ঘন খাবারে বেশি পরিমানে শক্তি, আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি থাকে, যা শিশুকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে
- শিশুর পেট ছোট হওয়ার কারণে তারা বেশি পরিমানে খাবার খেতে পারে না,(সে জন্য খাবার বেশি পাতলা যেমন:পাতলা ডাল, জুস, সুজি বা অন্য কোন তরল হলে শিশুর পেট ভরে , সে আর খেতে চায় না) তাই খাবার ঘন হলে অল্প পরিমাণ খাবারেই শিশু যথেষ্ট পুষ্টি পায়
- খাবারের ঘনত্ব সঠিক না হলে খাবারের পুষ্টিমান কম হয় যা শিশুর বেড়ে উঠাকে বাধাগ্রস্থ করে
- শিশুর পুষ্টি সঠিকভাবে নিশ্চিত না হলে তার অসুখ-বিসুখ এর ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে তার পরিবারের চিকিৎসা ও ওষুধের খরচ বেড়ে যায়

৪. **খাবারের বারঃ** শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার খাবারের পরিমানও বাড়বে এবং খাবারটুকু তাকে সঠিক নিয়মে বারে বারে দিতে হবে।

- শিশুর বয়স অনুযায়ী সঠিক নিয়মে বারে বারে খাবার দিলে শিশুর সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত হয়, শিশু সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে এবং শিশু খাবার খেতে আগ্রহী হয়
- শিশুর পাকস্থলী/পেট যেহেতু ছোট সে জন্য তাকে অল্প অল্প করে খাবার ও নাস্তা বারে বারে দিতে হবে

৫. **শিশুর ইশারা বুঝে (Responsive Feeding) খাওয়ানো-** শিশুকে জোর না করে সে যাতে খাবারে উৎসাহ ও আনন্দ পায়,সেভাবে খাওয়াতে হবে

- অল্পবয়সী শিশুকে মুখে তুলে খাওয়াতে হবে যারা একটু বড় তাদের নিজে নিজে খেতে সাহায্য করতে হবে
- তাদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। শিশুকে নানা ধরনের খাবার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে উৎসাহ দিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে
- শিশুকে ক্লান্ত বা ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ানো উচিত নয়

- খাওয়ার সময় শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খেলনা দিয়ে ব্যস্ত রাখা যাবে না, এতে সে খাওয়ায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে
- খাওয়ার সময় মা শিশুর সামনা সামনি বসবে এবং তাকে খেতে শেখাবে ও উৎসাহ দেবে, এতে শিশু নিজে খেতে আগ্রহী হবে, খাবার চিনতে শিখবে, বিভিন্ন ধরনের খাবার সে সঠিক পরিমানে খেতে পারবে
- তার নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যস গড়ে উঠবে, এতে মায়ের কাজের চাপ কমে যাবে

৬. **সঠিক/স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়তি খাবার তৈরি ও সংরক্ষণঃ** স্বাস্থ্যসম্মত এবং যথাযথভাবে বাড়তি খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ করতে হবে।

- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়তি খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ করলে, পেটের অসুখ, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, জ্বর ও অন্যান্য অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়তি খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ না করার ফলে শিশু অসুস্থ হয় এবং তার ক্ষুধাকমে যায় ফলে অপুষ্টিতে ভোগে এবং এক সময় মারাও যেতে পারে
- খাবার তৈরি ও শিশুকে খাবার খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- খাবার তৈরির পর পরই শিশুকে খাবার খাওয়াতে হবে। খাবার তৈরি ও খাওয়ানোর সময় পরিষ্কার বাসন-পত্র ব্যবহার করতে হবে

৭. **অসুস্থতার সময়ে ও অসুস্থতার পরে খাওয়ানোঃ** শিশুর অসুস্থতার সময় ও অসুস্থতার পর সঠিকভাবে খাওয়ালে শিশু তাড়াতাড়ি অসুখ থেকে সেরে উঠে, অপুষ্টি থেকে রক্ষা পায়, পরবর্তীতে অসুখ-বিসুখ কম হয়।

- শিশুর অসুস্থতার সময় শক্ত খাবার কমিয়ে দেয়া উচিত নয়, তাকে ঘন ঘন মায়ের দুধ দিতে হবে যাতে সে বেশি পরিমানে দুধ পায় এবং তার পছন্দের বিভিন্ন ধরনের বাড়তি খাবার অল্প অল্প করে বারে বারে দিতে হবে
- শিশুর অসুস্থতার পর পুর্বের ওজন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ (১৪দিন) অতিরিক্ত পরিমানে বাড়তি খাবার দিতে হবে
- শিশু সেরে উঠলে তার ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে
- অসুস্থতার সময়ে সঠিক নিয়মে মায়ের দুধ ও বাড়তি খাবার না খাওয়ালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে রোগ আরো বেড়ে যায় এবং বারে বারে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হয়

২৪-৫৯ মাস (পূর্ণ) বয়সী শিশুদের প্রতিদিন খাবারের ধরন ও পরিমান-

(২৫০ মিঃ লিঃ (১ পোয়া) বাটি হিসাবে)

সকালের খাবার	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার

কারণ	সমাধান

মাঝারী সাইজের ১টি রুটি + ১টি ডিম অথবা সব্জি	যে কোন মৌসুমী দেশী ফল অথবা বাড়িতে তৈরী নাস্তা	ভাত (১ বাটি) + শাক/সব্জি(১ বাটি) + ২ টেবিল চামচ ঘন ডাল + ১ টুকরা মাছ/মাংস	দুধ দিয়ে ঘন করা যে কোন খাবার (পায়েশ, দই ইত্যাদি) অথবা যে কোন মৌসুমী দেশী ফল অথবা বাড়িতে তৈরী নাস্তা	ভাত (১ বাটি) + শাক/সবজী (১ বাটি) + ২ টেবিল চামচ ঘন ডাল + যদি সম্ভব হয় ১টুকরা মাছ /মাংস

শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কিছু কুসংস্কার/ভুলধারনাঃ

- শিশুর অসুখ হলে তার খাওয়া বন্ধ করে দেয়া
- শিশুর ডায়রিয়া হলে মায়ের দুধ খাচ্ছে এমন শিশুর মা শাক-সব্জি খাওয়া বন্ধ করে দেয়া
- ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে না দেয়া
- দামী খাবারে পুষ্টি বেশী
- ৬ মাসের আগে শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়ানো ভাল
- বাড়তি খাবারে শিশুর ডায়রিয়া/ পাতলা পায়খানা হয়

শিশুদের খেতে না চাওয়ার কারণ ও সমাধানঃ

মা শিশুকে জোর করে তাড়াতাড়ি খাওয়াতে চান	তাড়াতাড়ি করার জন্য শিশুকে জোর করা যাবে না, তার মুখে যতটুকু খাবার আছে সেটা গেলা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে মা'র কাজে সাহায্য করতে বলতে হবে
খাওয়ানোর সময় মা শিশুকে উৎসাহ দেননা	খাওয়ার সময় শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে যে তাকে যেটা খেতে দেয়া হয়েছে সেটা খেতে খুব ভালো-মজা। এছাড়াও তাকে নানানভাবে উৎসাহ দিতে হবে যেমন: এই তো ভালো ছেলে কি সুন্দর খাচ্ছে, দেখ এই সবজিটা কি সুন্দর, এই ফলটা কত রঙিন ইত্যাদি
পূর্ণ ছয় মাসের পর থেকে প্রথম প্রথম শিশুকে খাবার দিলে মুখ থেকে সে খাবার বের করে দেয়, মা বা পরিবারের অন্য সদস্য মনে করেন শিশু খেতে চাচ্ছেনা	শুরুতেই খাওয়া শেখার সময় শিশু এমন করতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য প্রথম কয় মাস ধৈর্য্য ধরে বেশ সময় নিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে
শিশুর খাবার শক্ত হলে সে তা চিবাতে বা গিলতে পারেনা	সেজন্য শুরুতে শিশুকে চটকানো নরম খাবার দিতে হবে
শিশুর কখনও কখনও খাবারের স্বাদ পছন্দ হয় না	খাবারে মশলা মেশানোর আগে শিশুর জন্য ১ টুকরা মাছ/মাংস তুলে রাখতে হবে। ঝাল অথবা লবন বেশি হলে ডাল বা পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। খেয়াল করতে হবে কোন খাবারটি শিশু বেশী মজা করে খায়, সেই অনুযায়ী খাবারটি তৈরী করতে হবে
শিশু অসুস্থ্ থাকলে খেতে চায়না	শিশু যেটা খেতে পছন্দ করবে তার জন্য সেটা রান্না করতে হবে, সেটা যেন নরম হয় এবং বারে বারে অল্প অল্প করে তাকে খেতে দিতে হবে। যখন সে সেরে উঠবে তখন তাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার, একটু বেশি করে বারে বারে দিতে হবে
শিশু যখন ক্লান্ত থাকে বা যখন শিশুর ঘুম ঘুম ভাব থাকে তখন সে খেতে চায়না	এসময়ে শিশুকে খাওয়ানো যাবেনা, তার জেগে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে হবে
শিশুর খাবার বেশ পাতলা করে তৈরি করা হলে তাতে শিশুর পেট ভরে যায়	সে জন্য শিশুর খাবার পাতলা করে তৈরি করা উচিত নয়। তাকে চটকানো খাবার বা তার বয়স অনুযায়ী ঘনত্বের খাবার দিতে হবে
শিশুর পেট বেশ ছোট, শিশু যদি খাবার আগে চিপস্, জুস, পানি বা অন্য কোন তরল খাবার দিয়ে পেট ভরিয়ে ফেলে তাহলে তার জন্য তৈরী করা ঘরের খাবার খেতে চায়না	সে জন্য খাবার আগে এসব জিনিষ দিয়ে শিশুর পেট ভর্তি করা উচিত নয়। খাবার এবং নাস্তার মাঝখানে ২ ঘন্টা বিরতি থাকা ভালো, সেজন্য পরবর্তী খাবার দেয়ার মধ্যে অন্তত ২-৩ ঘন্টা দেরী করা উচিত

অনেকগুলো খাবার যদি একসাথে মেশানো হয় তাহলে অনেক সময় শিশু খেতে চায়না	অনেকগুলো খাবার এক সাথে মেশানো যাবে না। বিভিন্ন ধরনের খাবার আলাদাভাবে চটকাতে হবে যেমন, মিষ্টি জাতীয় খাবার লবনাক্ত খাবারের সাথে মেশানো যাবে না। আবার সবুজ শাক-সজি মাছ বা ডিমের সাথে না মেশানো ভালো
শিশু যখন নিজে খেতে চায় তখন যদি তাকে নিজে খেতে দেয়া হয় না	শিশু যখন নিজে খেতে চায় তখন তাকে নিজে খেতে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশু তার হাত দিয়ে ধরতে পারে এমন খাবার দিতে হবে, তবে খাবারের আগে সাবান দিয়ে শিশুর হাত ধুয়ে দিতে হবে
শিশু যখন খেলনা বা বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন সে খেতে চায় না	খাবার সময় শিশুকে খেলনা দিয়ে ব্যস্ত রাখা যাবেনা বা বন্ধুদের সাথে খেলার সময় তাকে খাওয়ানো উচিত নয়। শিশু খাওয়া থেকে অমনোযোগী হয় এমন সব কিছু সরিয়ে ফেলতে হবে
শিশুর খাবার মজা না হলে সে খেতে চায়না	খাওয়ানোর আগে মাকে তার খাবার চেখে দেখতে হবে যে খাবারটি মজা কিনা
একই খাবার প্রতি দিন প্রতিবার খেতে দিলে (যেমন- সুজি ও খিচুড়ী) শিশু খেতে চায়না	বড়দের মত শিশুদেরও বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ঘনত্বের খাবার দিতে হবে

পাঠ-১৭
কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

কৈশোরকাল:

শৈশবকাল থেকে যৌবনে পদার্পনের মধ্যবর্তী সময় (১০-১৯ বছর)-কে কৈশোরকাল বলা হয় এবং এই বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকাল জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তাদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাই এ সময় তাদের পুষ্টি চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। দেহের সুষ্ঠু ও

স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে তাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিচর্যা করা প্রয়োজন। একই সাথে তাদেরকে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলাও একান্ত জরুরী।

কৈশোরকালে পুষ্টির গুর ত্ব:

কৈশোরকাল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় দেহের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। কৈশোরকালে মোট উচ্চতার ১০-২০% এবং মোট ওজনের ২৫-৫০% ওজন বৃদ্ধি হয়। এজন্য এই সময়ে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধির সাথে মানবিকবোধ, আবেগানুভূতি ও হরমোন জনিত পরিবর্তনও জড়িত। মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় ১০-১৩ বছর বয়সের মধ্যে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে তা হয় ১২-১৫ বছর বয়সের মধ্যে। কৈশোরকালের এই বৃদ্ধিই পরবর্তীকালে শারীরিক আকার-আকৃতি, কর্মক্ষমতা, সন্তান জন্মদানে সহজ সাধ্যতাকে নির্ধারণ করে। এছাড়াও গভর্কালীন, প্রসবকালীন ঝুঁকি ও কম ওজনের শিশু জন্মদানের সম্ভাবনা কমানোর ক্ষেত্রেও কিশোরীর পুষ্টি একটি গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কৈশোরকাল: উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক গঠনের পরিবর্তন

উচ্চতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট উচ্চতার ১৫-২০% এই সময়ে হয়
- মেয়েদের চাইতে ছেলেদের দৈহিক বৃদ্ধি দেরীতে শুরু হয়

ওজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট ওজনের ২৫-৫০% এই সময়ে হয়

দৈহিক গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- প্রায় ৪৫% শরীরের কাঠামোর (মাংশপেশী) অংশ বিশেষ এই সময়ে যোগ হয়
- জন্ম থেকে কৈশোরকালের মধ্যে, শরীরের হাড়ের গঠনের ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এই সময় তুলনা মূলক ভাবে বেশী মাংশ পেশী লাভ করে

কৈশোরে মানুষের জীবনযাত্রা ও খাবারের রুচির পরিবর্তন হয়। কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগতে পারে কারণ সে সময় তাদের অধিক মাত্রায় পুষ্টির প্রয়োজন হয় এবং তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যা প্রায়ই অসনাক্ত অবস্থায় থাকে। অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যেমন:

- আয়রণের অভাবে কৈশোরকালীন শারীরিক বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিকের কারণে শরীরে আয়রণের চাহিদা বেড়ে যায়
- আয়রণ ঘাটতির কারণে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক জ্ঞান বৃদ্ধির বিকাশ কমে যায় এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ অনেকাংশে কমে যায় ফলে স্কুলে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে
- কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ, (বিশেষ করে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন ও বেঁটে হন) মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়

অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম,মানসিকও শারিরীক চাপের কারণে কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ ও খাবার গ্রহণে ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রথাগত আচরণের কারণে অনেক দেশে শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোরকাল পর্যন্ত মেয়েরা বিশেষভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে।

কৈশোরকালীন বৈচিত্র্যময় খাবারের গুরুত্ব:

কৈশোরকালে পুষ্টি সমস্যার সাথে প্রথাগত শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত থাকে। কৈশোরকালে খাবার এমন হতে হবে যেন সেই খাবার পরিমাণে সঠিক হয় এবং এতে খাদ্যের ৬ টি উপাদানই থাকে। একই খাবার বার বার খেতে ভাল লাগবে না তাই মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের খাবার দেওয়া ভাল

এতে খাবারের রুচি থাকবে। কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া ও খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিশোর কিশোরী সহ সবার জন্য ঘরে তৈরি খাবারই উত্তম ।তাই তাদের ঘরে তৈরী করা পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে।

তবেকৈশোরে ছেলে-মেয়েদেরমনে হবে যে রাস্তার খোলা খাবার, চানাচুর, আচার, মুড়ালী, চটপটি, চিপস, আইসক্রিম, কেক, কোমল পানীয়- জুস, এ্যানার্জী ড্রিংক ইত্যাদি মুখরোচক খাবার খায় এগুলোতে চর্বি ও শর্করার মাত্রা বেশী থাকে যা পরবর্তী জীবনে স্থুলতা, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধে করনীয়ঃ

- সুষম খাবার খাওয়া :
  - শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, মুড়ি, চিনি, গুড়, মধু, আলু, চিড়া ইত্যাদি) খাওয়া
  - আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি) খাওয়া
  - আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার (মাংস, কলিজা এবং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি) খাওয়া
  - ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার (কলিজা, পাকা পেঁপে, আম, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, ছোটমাছ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি ও হলুদ রঙের ফল-মূল) খাওয়া
  - প্রতিদিন ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া
  - আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার (সামুদ্রিক মাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শাক-সবজি) এবং আয়োডিন যুক্ত লবন খাওয়া
  - প্রতিদিন ১০- ১২ গ্লাস পানি খাওয়া + ঘাম হয় বা হতে পারে কিংবা গরম কালে বেশি পানির প্রয়োজন হতে পারে
- ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ ফলিক এসিড (IFA) ট্যাবলেট খাওয়া
- প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণ করাগর্ভকালীন সময় ছাড়া
- খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পড়ে পায়খানায় যাওয়া
- মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। সব ধরণের খাবার খাওয়া যায় এবং তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এ সময় সব ধরণের স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা যায়
- দেরীতে বিয়ে ও দেরীতে গর্ভধারণ করা
- কিশোরীকে টিটেনাস টিকার ৫টি ডোজ সম্পূর্ন করা

কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার নমুনাঃ

প্রতিদিন কিশোর-কিশোরীদের নানান জাতীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। একজন কিশোর/কিশোরী কি কি খাবার খেলে তার দৈনিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলঃ

কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমূনা খাদ্য তালিকা

(২৫০ মিঃ লিঃ বাটির হিসাব)

সকালের খাবার	সকালের নাস্তা (সকাল ১১টা)	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
-মাঝারী সাইজের ২টি	-যে কোন দেশী মৌসুমী ফল	-২/৩ বাটি ভাত -১ বাটি শাক্-সব্জি	-দুধ দিয়ে তৈরী ঘনযে কোন খাবার (পায়েশ ও	-২/৩ বাটি ভাত

রুটি অথবা ১ বাটি ভাত -১ বাটি সবজী অথবা -১টি ডিম	-বাড়ীতে তৈরী নাস্তা জাতীয় খাবার	-১ বাটি ঘন ডাল -১ টুকরা মাছ/ মাংস/কলিজা	দই ইত্যাদি)/ যে কোন দেশী মৌসুমী ফল/ বাড়ীতে তৈরী নাস্তাজাতীয় যে কোন খাবার।	-১ বাটি শাক-সব্জি -১ বাটি ঘন ডাল - (যদি সম্ভব হয় ১ টুকরা মাছ/মাংস)

*এছাড়াও কিশোরীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার থাকা বাঞ্জনীয়। কিশোরীরা ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী সপ্তাহে ২টি করে আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট এবং ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক বড়ি খাবে। কিশোরীগণ কে ১৫-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ড় প্রত্যহ ১টা করে আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া যায় কিনা বিবেচ্য বিশয় হতে পারে। মনে থকা দরকের শরীরে আয়রনের আধিক্য ঘটলে Free Feritin শরীরে জমা হয় তা ঞড়ীরপ হিসাবে কাজ করে এবং Antioxident নষ্ট করে।

সংযুক্তি:১

কৈশোরকালীন (কিশোর/ কিশোরী) খাবারের তালিকা:

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পরিমান (রান্না করা)	ওজন (গ্রাম)	ক্যালরী (কি.ক্যালরী)
১.	রুটি/ ব্রেড	২ টি (মাঝারী)	২ x ৩২	১৩৩
২.	ডিম	১ টি	৪০	৬২
৩.	সব্জি (সীম, কুমড়া)	২.৫ বাটি	৪৫০	১৫১
৪.	ফল (আমড়া, কমলা, পেয়ারা)	১ টি (মাঝারী)/ ১ বাটি	৬০	৩৯.৬
৫.	কেক/ সিঙ্গারা	১ টি (মাঝারী)	৫০	১৫০
৬.	ভাত	৩.৫ বাটি	৫২৫	৫৬৬
৭.	ডাল	২ বাটি (হালকা ঘন)	৩০০	১৭১
৮.	শাক (লাল শাক, কচু শাক)	১/২ বাটি	৯০	৩৫
৯.	মাছ/ মাংস	২-৩ টুকরা	৮০	১২০
১০.	বিস্কুট/ মুড়ি	২ টি/ ১ বাটি	১৫	৭৫

১১.	দুধ	১ গ্লাস	২৫০	১৬৩
১২.	খাবার তেল	৫ চা চামচ	২৫	২১৮
মোট			-	১৯৬৬

* মাছ/ মাংসের পরিবর্তে সপ্তাহে একদিন ৫-৬ টুকরা (৫০ গ্রাম) কলিজা খেতে পারে।

সূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এবং ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সিলেক্টেট ইথিনিক ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৈশোরকালীন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য:

কিশোর কিশোরী থেকে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে তার মাংসপেশী, হাড় সহ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন সঠিক বৃদ্ধি হয় সে জন্য তাকে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার বেশি পরিমাণে খেতে হবে। নিচে উল্লেখ করা উপাদানসমূহ যে সব খাবারে আছে তা খাবার ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদেরকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে ঃ

- **আমিষ:** দেহের কাঠামোগত বৃদ্ধির জন্য আমিষ জাতীয় খাবার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমিষ পাওয়া যায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ছানা, পনির, শুটকি মাছ, ইত্যাদি খাবার থেকে। বিভিন্ন ধরণের ডাল যেমন: মুগ, মুসুর, মাসকলাই, ছোলা, সীমের বিচি, মটরশুটি, চীনাবাদাম, সয়াবীন ইত্যাদি থেকে আমরা উদ্ভিজ আমিষ পেতে পারি । **দেহের সঠিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য এ জাতীয় খাবার নিয়মিত খেতে হবে**
- **আয়রণ:** বাংলাদেশের কিশোরীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই রক্ত-স্বল্পতার শিকার। কৈশোরকাল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। আয়রণের অভাবে এই বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিকের কারণে শরীরে আয়রণের চাহিদা বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে সুস্থ মা হিসেবে নিজেকে তৈরী করার জন্য কিশোরীদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমানে আয়রণ জমা থাকা প্রয়োজন। প্রাণিজ খাবার যেমন : মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুটকি মাছ ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ খাবার যেমন- কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, সাজনা শাক, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল, খেজুর, কালোজাম, তরমুজ, পাকা তেঁতুল, গুড় ইত্যাদি
- **ক্যালসিয়াম:** হাড়ের বৃদ্ধি ও দাঁতকে সুগঠিত করতে ক্যালসিয়াম জরুরী। ডিম, দুধ, দই,পনির, শুটকি মাছ, মাথা ও কাঁটাসহ ছোটমাছ থেকে প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়
- **আয়োডিন:** আয়োডিন কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। আয়োডিন যুক্ত লবনের ব্যবহার কিশোরীদের মেধাবী এবং স্বাস্থ্যবান হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের বুদ্ধি বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ ও আয়োডিনযুক্ত লবন খেতে হবে
- **ভিটামিন-সি:** কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন ভিটামিন-সি গ্রহণ করতে হবে। আয়রণযুক্ত খাবারের সাথে ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার গ্রহণ করলে আয়রণ শোষণ বৃদ্ধি পায়। এ চাহিদা পূরণের জন্যে তারা কমলা, পেয়ারা, আমলকি, জামবুরা, আনারস, বরই, কামরাঙ্গা, লেবু, টমেটো, কাঁচামরিচ ইত্যাদি খেতে পারে

এছাড়া পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কিশোর-কিশোরীদের প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করা এবং সেই সাথে নিয়মিত ব্যায়াম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, বিশ্রাম ও খেলাধূলা করা প্রয়োজন।

পাঠ-১৮
গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি

মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এ সময়ে অপর্যাপ্ত খাদ্য ও অপুষ্টি, মা ও শিশুর জন্য মারাত্মক হতে পারে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত মায়েরা যে সন্তানের জন্ম দেন, তাদের জন্ম ওজন কম হয়, বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় ,স্বাস্থ্য দুর্বল ও রোগাক্রান্ড় হয় । গর্ভাবস্থায় মা নিজের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে গর্ভের শিশুকে যথাযথ ভাবে গড়ে তুলেন । এ ক্ষেত্রে মায়ের দেহেচাহিদা বাড়ে যা পূরণ করা না হলে মায়ের স্বাস্থ্যহানী ঘটে। এজন্য গর্ভাবস্থায় মাকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী পরিমান খাবার খেতে হবে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেয়েরা কম বয়সে গর্ভধারণ করেন এবং প্রায় সবাই অপুষ্টির শিকার হন। এর ফলে অপুষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহন করে বা কখনও কখনও মহিলারা মৃত সন্তানও প্রসব করেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার অপুষ্টিতে ভোগার পরিণতি:

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়
- কর্মক্ষমতা কমে যায়
- অপুষ্টিরফলেশারীরিক গঠন ছোট হওয়ায় কারণে সন্তান প্রসবে জটিলতা ও বিপদ দেখা দেয়
- প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী জটিলতা এবং রক্তক্ষরণের ফলে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়
- গর্ভবতী মহিলা অপুষ্টিতে ভুগলে কম ওজন নিয়ে সন্তান জন্মানোর এবং নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে

কম জন্ম ওজনের শিশুর ভয়াবহতা:

- মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়
- বারবার রোগাক্রান্ড় হয়
- দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়এবংকর্মক্ষমতা কমে যায়

গর্ভকালীন যত্ন ও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি:

গর্ভকালীন সেবা:

১. গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ৩ বেলা খাবারের সাথে নিয়মিত কমপক্ষে এক মুঠ বেশি খাবার ৫ বারে ভাগ করে বারে বারে খেতে হবে

২. ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, কলিজা, ঘন ডাল, গাঢ় সবুজ শাক-সব্জি ও মৌসুমী দেশী ফল খেতে হবে। রান্নায় যথেষ্ট পরিমান তেল ব্যবহার করতে হবে

৩. গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হবার সাথে সাথে প্রতিদিন রাতের খাবারের পরপরই ১টি করে আয়রণ ফলিক এসিড ট্যবলেট খেতে হবে

৪. গর্ভাবস্থায় ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার যেমনঃ টাটকা সব্জি যেগুলো কাঁচা খাওয়া যায়,যেমনঃ শশা, টমেটো গাঢ় সবুজ শাক এবং   দেশীয় টক স্বাদ যুক্ত ফল খেতে হবে

৫. গর্ভাবস্থায় ৩ মাসের পর থেকে প্রতিদিন সকালে ১টিএবং দুপুরে ১টি করে মোট ২ টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ভরা পেটে খেতে হবে

৬. গর্ভধারনের প্রথম ৩ মাসের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী১ টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতে হবে

৭ .আয়োডিন যুক্ত লবন খেতে হবে

৮. গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম (দুপুরে খাবারের পর ২ ঘন্টা এবং রাতে ৮ ঘন্টা) নিতে হবে

৯. গর্ভবতী মহিলাকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে, এতে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হবে

১০.পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে

১১.ভারী কাজ (যেমন: টিউবওয়েল চাপা, ধান ভানা, ভারী জিনিষ তোলা, অতিরিক্ত/ভারাী কাপড় ধোয়া) এবং কষ্টকর প্ররিশ্রম থেকে বিরত থাকতে হবে

গর্ভকালীন যত্ন:

- গর্ভাবস্থায় অন্তত চারবার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে (মায়ের ওজন, রক্তস্বল্পতা, রক্তচাপ, গর্ভে শিশুর অবস্থান পরীক্ষা করা)

– ১ম স্বাস্থ্য পরীক্ষা = ১৬ সপ্তাহে (৪ মাস)
– ২য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা = ২৪-২৮ সপ্তাহে (৬-৭ মাস)
– ৩য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা = ৩২ সপ্তাহে (৮ মাস)
– ৪র্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা = ৩৬ সপ্তাহে (৯ মাস)

- রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা–

গর্ভধারনের আগে-

– টিটেনাস টিকার ৫টি ডোজ (প্রথম টিকা নেবার ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় টিকা, ৬ মাস পরে তৃতীয় টিকা, ১ বছর পরে ৪র্থ টিকা এবং তার ১ বছর পরে ৫ম টিকা) সম্পন্ন করা । টিটি টিকার কর্মসূচীর আওতায় অর্ন্তভুক্ত হলে ৫ টি টিকা সম্পন্ন করা উচিত। যদি ৫ টি টিকা নিয়ে থাকেন তাহলে আর নিতে হবেনা। যদি সে ১ম ডোজ নেয়া থাকে তাকে ২য় ডোজ দিতে হবে, যদি ২য় ডোজ নেয়া থাকে তাকে ৩য় ডোজ দিতে হবে (২য় ডোজ নেয়ার অন্তত ৬ মাস পর), যদি সে ৩য় ডোজ নেয়া থাকে তাকে ৪র্থ ডোজ দিতে হবে (৩য় ডোজ নেয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর), যদি সে ৪র্থ ডোজ নেয়া থাকে তাকে ৫ম ডোজ দিতে হবে (৪র্থ ডোজ নেয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর)

গর্ভধারনের পরে-

– যদি আপনি কোন টিটি টিকা না দিয়ে থাকেন তাহলে টিকা শুরু করতে হবে এবং গর্ভাবস্থায় ৫ মাস পর ২ টি টিটি টিকা নিতে হবে, সিডিউল অনুযায়ী বাকি টিকাগুলো নিতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী ইমিউনিটির জন্য ৫ টি টিটি টিকার নির্ধারিত সময়সূচী:

১ম ডোজ (**TT 1**): ১৫ বছর বয়সে অথবা প্রসব পূর্ববর্তী প্রথম ভিজিটে
২য় ডোজ (**TT 2**): ১ম ডোজ নেয়ার অন্ততঃ ১ মাস (৪ সপ্তাহ) পর
৩য় ডোজ (**TT 3**): ২য় ডোজ নেয়ার অন্ততঃ ৬ মাস পর
৪র্থ ডোজ (**TT 4**): ৩য় ডোজ নেয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর
৫ম ডোজ (**TT 5**): ৪র্থ ডোজ নেয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর

- ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য মশারী (সম্ভব হলে ওষুধ যুক্ত) ব্যবহার করা

গর্ভকালীন সময়ে ওজন নেয়ার গুরুত্ব:

গর্ভবতী মহিলার পুষ্টির অবস্থা নির্নয়ও এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য

- গর্ভবতী মহিলার ওজন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য
- একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক ওজনের শিশুর জন্ম নিশ্চত করার জন্য
- গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা কমানোর জন্য
- মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য

গর্ভবতী মহিলার স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি:

গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধির মেডিসিন ইনস্টিটিউটের সুপারিশমালাসমূহ:			
গর্ভধারনের পূর্ববর্তী ওজন অবস্থা	বডি মাস ইনডেক্স (BMI)	সুপারিশকৃত মোট ওজন পাউন্ড (কেজি)	গর্ভাবস্থায় ২য় ও ৩য় ট্রাইমস্টার (তিনমাস) এর সময় ওজন বৃদ্ধির সুপারিশসমূহ (কেজি) {গড় ওজন (পাউন্ড/কেজি)}
কম ওজন	১৮.৫ এর নীচে	২৮-৪০ (১১-১৬)	১ (১-১.৩)
স্বাভাবিক ওজন	১৮.৫-২৪.৯	২৫-৩৫ (১০-১৪)	১ (০.৮-১)
মাত্রাতিরিক্ত ওজন	২৫-২৯.৯	১৫-২৫ (৬-১০)	০.৬ (০.৫-০.৭)
স্থুলকায় (সকল শ্রেনী অন্তর্ভুক্ত)	৩০ এবং এর উপরে	১১-২০ (৫-৮)	০.৫ (০.৪-০.৬)

Source: মেডিসিন ইনস্টিটিউট

গর্ভবতী মহিলার স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধির জন্য যা যা প্রয়োজন:

- ২০ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে গর্ভধারণ না করা
- দুই সন্তানের বেশি সন্তান না নেয়া

- শিশুর বয়স ২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় গর্ভধারণ না করা
- নিয়মিত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা(ANC) এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করা
- গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খাদ্য এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। বিশেষত প্রাণীজ খাবার (দুধ,ডিম,কলিজা) এবংগাঢ় সবুজ শাক সবজি ও মৌসুমী দেশী ফলমূল বেশি খাওয়া
- গর্ভকালীন সময়ে, যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়া, কষ্টকর পরিশ্রম বর্জন করা এবং ভারী কোন জিনিস না তোলা
- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত আয়রণ ও ফলিক এসিড মিশ্রিত বড়ি ও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া

গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধি না হওয়ার কারণসমূহ:

- শিশু ও কিশোরী বয়সে দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে এবং রক্তস্বল্পতায় ভোগা
- কিশোরী বা অল্প বয়সে গর্ভধারণ করা
- ঘন ঘন সন্তান ধারণ করা (২ বছরের আগে)
- গর্ভাবস্থায় কম খাদ্য গ্রহণ ও সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা
- গর্ভকালীন সময়ে রক্ত স্বল্পতায় ভোগা
- বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ও কৃমিতে আক্রান্ত হওয়া
- শারীরিক পরিশ্রম বেশি করা ও মানসিক উদ্বেগে থাকা
- খাদ্য সংক্রান্ত কুসংস্কার ও পরিবারে অসম খাদ্য বন্টন

প্রসব পরবর্তী যত্নপ্রসূতি মায়ের পুষ্টি:

প্রসবোত্তর সেবা নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। প্রসবের পর থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে ”প্রসবোত্তর কাল” বলা হয়। এ সময় মায়ের বিশেষ সেবা প্রয়োজন। কারণ এই সময় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের শরীরেপুষ্টিরপ্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে বিদ্যমান; যা শিশু মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এজন্য এ অবস্থায় মায়ের শরীর সুস্থ রাখার জন্য সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার এবং বাড়তি যত্নের প্রয়োজন।

প্রসব পরবর্তী যত্ন:

প্রত্যেক বার খাবারের সময় প্রসূতি মাকে স্বাভাবিকের তুলনায় কমপক্ষে ২ মুঠ বেশি পরিমানেএবং বারে বেশী করে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত খাবার শিশুর জন্য মায়ের দুধ তৈরী করতে সহায়তা করে এবং মায়ের নিজের শরীরের ঘাটতি পূরণ করে

- দুগ্ধদানকারী মাকে সব ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ (শক্তি,আমিষ,আয়রণ, ভিটামিন-এ, আয়োডিন, ক্যালসিয়া, পর্যাপ্ত পানি ইত্যাদি) খাবার খেতে হবে
- দুগ্ধদানকারী মায়ের কাজে পরিবারের সকল সদস্যদের সহযোগিতা করতে হবে
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে

প্রসব পরবর্তী সেবা:

- শিশু জন্মের পর অন্তত চার বার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে

১ম চেকআপ	২৪ ঘন্টার মধ্যে

২য় চেকআপ	প্রসবের ২-৩ দিনের মধ্যে
৩য় চেকআপ	প্রসবের ৪-৭ দিনের মধ্যে
৪র্থ চেকআপ	প্রসবের ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে

- শিশুর জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে,যত দ্রুত সম্ভব মাকে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন(২০০০০০ IU) ভিটামিন এ ক্যাপসুল খেতে হবে
- প্রসবে পর তিনমাস পর্যন্ত১টিকরেআয়রণ ফলিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রতিদিন ভরা পেটে খেতে হবে

গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের সহযোগীতার জন্য পরিবারেরঅন্যান্য সদস্যদের (মা, স্বামী, শাশুড়ী, ননদ) করণীয়:

- গর্ভকালীন সেবা গ্রহনের জন্য গর্ভবতী মহিলার সাথে সেবা কেন্দ্রে যাওয়া এবং আয়রণ ফলিক এসিড খাওয়ার জন্য গর্ভবতী মহিলাকে মনে করিয়ে দেয়া
- গর্ভবতী মহিলা / দুগ্ধদানকারী মাকে অতিরিক্ত খাবার খেতে উৎসাহিত করা
- ঘরের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজে গর্ভবতী মহিলাকে সাহায্য করে তার কাজের বোঝা কমানো
- হাসপাতালে প্রসব করানোর বিষয়ে গর্ভবতী মহিলাকেউৎসাহিত করা এবং সহযোগীতা করা
- হাসপাতালে প্রসবের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নেয়া
- জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য গর্ভবতী প্রসূতিমহিলাকেউৎসাহিত করা এবং সহযোগীতা করা এবংশাল দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা
- মা শিশুকে যথেষ্ট সময় নিয়েএবংসঠিক নিয়মে(position & attachment)দুধ খাওয়াতে পারে তার জন্য দুগ্ধদানকারী মাকে সুযোগ করে দেয়া

সংযুক্তি-৫.২

গর্ভকালীন ৫ টি বিপদ চিহ্ন:

একজন গর্ভবতী নারীর যে কোন সময় যে কোন বিপদ দেখা দিতে পারে। পরিবারের সবার গর্ভকালীন ৫ টি বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে এবং যে কোন একটি দেখা দেয়া মাত্র তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

১. রক্ত ক্ষরণ
২. প্রচন্ড জ্বর
৩. তীব্র মাথা ব্যথা এবং চোখে ঝাপসা দেখা
৪. খিচুনী
৫. অনেকক্ষণ ধরে প্রসব বেদনা/ বিলম্বিত প্রসব (১২ ঘন্টার অধিক সময় ধরে থাকলে)

প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন:

প্রসবের সময় মাথা ব্যতিত অন্য কোন অঙ্গ বের হয়ে আসা

১. বিলম্বিত প্রসব
২. অতিরিক্ত রক্তক্ষন
৩. খিচুনী
৪. গর্ভফুল বের হতে বিলম্ব হওয়া

প্রসবপরবর্তী বিপদ চিহ্ন:

১. অতিরিক্তরক্ত ক্ষরণ
২. প্রচন্ড জ্বর
৩. দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
৪. খিচুনী

সংযুক্তি: ৫.৩

গর্ভবতীমায়ের খাদ্য তালিকা

সূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এবং ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সিলেক্টেট ইথিনিক

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পরিমান (রান্না করা)	ওজন (গ্রাম)	ক্যালরী (কি.ক্যালরী)
১.	রুটি/ ব্রেড	৩ টি (মাঝারী)	৩ x ৩২	২০০
২.	ডিম	১ টি	৪০	৬২
৩.	সব্জি (সীম, কুমড়া)	২.৫ বাটি	৪৫০	১৫১
৪.	ফল (আমড়া, কমলা, পেয়ারা)	১ টি (মাঝারী)	৬০	৩৯
৫.	দুধের তৈরী খাবার	১ বাটি	১৬০	১৫৮
৬.	ভাত	৫ বাটি	৭৫০	৮০৮
৭.	ডাল	২ বাটি (ঘন)	৩০০	২৪৭
৮.	শাক (লাল শাক, কচু শাক)	১/২ বাটি	৯০	৩৫
৯.	মাছ/ মাংস	২-৩ টুকরা	৮০	১২০
১০.	বিস্কুট	২ টি	১৫	৭৫
১১.	কলা/ আম (পাকা)	১ টি (মাঝারী)	১৮০	১৭১
১২.	দুধ	১ গ্লাস	২৫০	১৬৩
১৩.	খাবার তেল	৫ চা চামচ	২৫	২১৮
মোট			-	২৪৪৭

ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংযুক্তি: ৫. ৪

প্রসূতি মহিলার খাবারের তালিকা:

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পরিমান (রান্না করা)	ওজন (গ্রাম)	ক্যালরী (কি.ক্যালরী)
১.	র“টি/ ব্রেড	৩ টি (মাঝারী)	৩ x ৩২	২০০
২.	ডিম	১ টি	৪০	৬২
৩.	সব্জি (সীম, কুমড়া)	২.৫ বাটি	৪৫০	১৫১
৪.	ফল (আমড়া, কমলা, পেয়ারা)	১ টি (মাঝারী)	৬০	৩৯
৫.	দুধের তৈরী খাবার	১ বাটি	১৬০	১৫৮
৬.	ভাত	৬ বাটি	৯০০	৯৭০
৭.	ডাল	৩ বাটি (হালকা ঘন)	৪৫০	২৬৪
৮.	শাক (লাল শাক, কচু শাক)	১/২ বাটি	৯০	৩৫
৯.	মাছ/ মাংস	২-৩ টুকরা	৮০	১২০
১০.	বিস্কুট	২ টি	১৫	৭৫
১১.	কলা/ আম (পাকা)	১ টি (মাঝারী)	১৮০	১৭১
১২.	দুধ	১ গ্লাস	২৫০	১৬৩
১৩.	খাবার তেল	৫ চা চামচ	২৫	২১৮
মোট			-	২৬২৬

*দুধের তৈরী খাবার ১ বাটি= ভাত ১৫ গ্রাম+দুধ ৭০ মি.লি.+ চিনি ১৫ গ্রাম

সূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এবং ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সিলেক্টেট ইথিনিক ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংযুক্তি - ৫.৫

আয়রন বড়ি শরীরের রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) প্রতিরোধ করে

গর্ভবতী মহিলা

প্রতিদিন ১টি আয়রন বড়ি খাবেন

- রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) গর্ভবতী মহিলাদের শরীর দূর্বল করে ও সাংসারিক কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- গর্ভকালে রক্তস্বল্পতার (অ্যানিমিয়া) কারণে কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে।
- গর্ভকালে মারাত্মক রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) গর্ভবতীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

Micronutrient Initiative

Micronutrient Initiative

রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া কি?

শরীরে রক্তের উপাদানের মধ্যে লাল অংশের (লোহিত কণিকা) হেমোগোবিন পরিমাণ কমে গেলে যে অসুস্থতার বা দুর্বলতার সৃষ্টি হয় তাকেই রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া বলে।

গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতা হয়েছে কিনা তা কেমন করে বুঝবেন?

১. দুর্বলতা, অল্পতেই ক্লান্ত হওয়া, মাথাঘোরা;
২. শরীরের শক্তি কমে যাওয়া;
৩. চোখের পাতার ভিতরের অংশ ফ্যাকাশে হওয়া;
৪. হাত বা পায়ের পাতা ফ্যাকাশে হওয়া;

রক্তস্বল্পতার বিপদগুলো কি?

- রক্তস্বল্পতা গর্ভবতী মহিলাদের শরীর দূর্বল করে ও সাংসারিক কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়;
- গর্ভকালে রক্তস্বল্পতার কারনে কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে;
- গর্ভকালে মারত্মক রক্তস্বল্পতা গর্ভবতীর মৃত্যুর কারন হতে পারে;

কেন গর্ভবতী মহিলা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়?

- চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত আয়রন ও ভিটামিনের প্রয়োজন হয়।

রক্তস্বল্পতা কেন হয়?

- রক্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আয়রন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার কম খেলে;
- কিছু রোগের কারণে, যেমন- কৃমি, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়া ইত্যাদি হলে;
- অন্য যে কোন ধরনের রক্তক্ষরণ জনিত কারনে।

কিভাবে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করা যায়?

গর্ভবতী মহিলা প্রতিদিন ১টি করে আয়রন বড়ি খাবে (২০০ মিঃ ফেরাস ফিউমারেট এবং ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলেট) যা সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। গর্ভকালীন সময়ে ২৭০ দিন (গর্ভ ধারনের শুরুর দিন থেকে) এবং প্রসুতি মায়েরা ৯০ দিন (সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়ে)।

আয়রন বড়ি খাওয়ার উপকারিতা?

১. গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতা দূর করে।

২. কম জন্ম ওজনের শিশু হওয়ার ঝুঁকি কমায়

৩. মারাত্মক রক্ত স্বল্পতায় আক্রান্ডমায়েদের মাতৃ মৃত্যু রোধ করে।

আয়রন বড়ির সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কি কি?

আয়রন বড়ি খাওয়ার ফলে সাধারনতঃ তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তবে পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া হলেও তা ক্ষতিকর নয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা স্বাভাবিক ভাবে চলে যায়। যেমন-

- ***কালো পায়খানা*** ঃ ক্ষতিকর নয়
- ***শক্ত পায়খানা*** ঃ বেশি পরিমাণে পানি এবং শাক-সবজি খাবার মাধ্যমে কমানো যায়
- ***বমি ভাব ও বমি*** ঃ ভরা পেটে আয়রন বড়ি খেলে এটা কমানো যায়

উলেখ্য যে আয়রন বড়ি সেবনের সাথে চা ও কফি পান না করাই ভাল।

গর্ভবতী মহিলা প্রতিদিন ১টি করে আয়রন বড়ি খাবেন,
গর্ভকালীন সময়ে ২৭০ দিন (গর্ভ ধারনের শুরুর দিন থেকে)
এবং প্রসুতি মায়েরা ৯০ দিন (প্রসব পরবর্তী সময়ে)।

স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্বঃ

বাড়ী পরিদর্শণকালে:

১. পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্য সহকারী তার কর্ম এলাকায় লক্ষিত প্রতিটি গর্ভবতী মহিলার বাড়ী পরিদর্শণ করবেন;

২. পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্য সহকারী গর্ভবতী মহিলা ও তার পবিবারের সদস্যদের সাথে আয়রন এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন;

৩. গর্ভবতী মহিলা আয়রন বড়ি গ্রহনের দিন থেকে নিয়মিত খাচ্ছেন কিনা, তা পরিবার কল্যান সহকারী বাড়ী পরিদর্শন কালে যাচাই করে দেখবেন (স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে আয়রন বড়ি গ্রহনের তারিখ হতে বাড়ী পরিদর্শনের সময় হিসাব করে দেখবেন);

৪. পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য সহকারীগন গর্ভবতী মহিলাদের সন্ধান করবেন (তার নির্ধারিত কর্ম এলাকায়) এবং তাদেরকে আয়রন বড়ি ও প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে প্রেরনের ব্যবস্থা করবেন;

৫. পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য সহকারীগন পরিবারে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবেন (গর্ভবতীর স্বামী/শাশুড়ী/ মা/ ননদ/ জা যে কেহ হতে পারে) এবং এই দায়িত্বশীল ব্যক্তি গর্ভবতী মহিলাকে নিয়মিত আয়রন বড়ি খাওয়ানোর কথা মনে করিয়ে দিবেন;

৬. বাড়ি পরিদর্শন কালে প্রসূতি মাদেরকে পরিবার কল্যাণ সহকারীগন প্রসবপরবর্তী জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান করবেন, পাশাপাশি আয়রন বড়ি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা ও গুনাগুন সম্পর্কেও বর্ণনা করবেন বা তথ্য প্রদান করবেন।

সুপারভাইজারের দায়িত্বঃ

মাসিক সভা বা স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র পরিদর্শণকালে:

১. স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তির কাছে গর্ভবতী মহিলাদের মাঝে আয়রন বড়ি বিতরনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইবেন;

২. আয়রন বড়ি কর্মসূচী আরো জোরদার সম্পর্কে করনীয় মাসিক সমন্বয় সভায় স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে আলোচনা করবেন;

৩. আয়রন বড়ি গ্রহণ বা ব্যবহার সম্পর্কিত মাসিক রিপোর্ট নিয়ে সভায় পর্যালোচনা করবেন।

গর্ভবতী মহিলাদের সংখ্যা নিরুপন

প্রথম ধাপ ঃ মোট জনসংখ্যা নিরূপন
দ্বিতীয় ধাপ ঃ স্থূল জন্মহার নিরূপন
তৃতীয় ধাপ ঃ গর্ভবতীর সংখ্যা নিরূপন

এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যানের তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবিত জন্মহার বের করা হয় মোট জন্মহার হতে, গর্ভনষ্ট, গর্ভপাত ঘটানো মৃত-প্রসব হিসাব করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ যদি মোট কোন এলাকার জনসংখ্যা হয় ৬০০০ জন
স্থূল জন্মহার হলো ২০/১০০০ জীবিত জন্ম অর্থাৎ ০.০২০
সুতরাং নির্ণিত জীবিত জন্মহার হলো ৬,০০০ X ০.০২০ = ১২০ জন বছরে

সাধারন ভাবে বলা যায় ঐ এলাকায় বছরে ১২০++ জন গর্ভবতী মা পাওয়া যাবে।

গর্ভবতী মহিলা প্রতিদিন ১টি করে আয়রন বড়ি খাবেন,
গর্ভকালীন সময়ে ২৭০ দিন (গর্ভ ধারনের শুরুর দিন থেকে)
এবং প্রসুতি মায়েরা ৯০ দিন (প্রসব পরবর্তী সময়ে)।

সংযুক্তি - ৫.৬

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) যাদের বেশি হয়

Design & Printing: Real Printing & Advertising

Micronutrient Initiative

"The Micronutrient Initiative through the financial assistance of the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA)"

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

কেন প্রসূতি মা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়?

- চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত আয়রন ও ভিটামিনের প্রয়োজন হয়।

কীভাবে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করা যায়?

প্রসূতি মায়েরা সন্তান প্রসবের পর থেকে পরবর্তী ৯০দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি করে আই এফ এ ট্যাবলেট খাবেন যা সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে।

প্রসূতি মাকে আই এফ এ ট্যাবলেট বিতরণের মাত্রা:

প্রতিটি আই এফ এ ট্যাবলেট এ - ২০০ মিলিগ্রাম ফেরাস ফিউমারেট এবং ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলেট আছে। প্রসূতি মায়েরা প্রসবের দিন থেকে ৯০দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি করে ৯০টি আই এফ এ ট্যাবলেট খাবেন:

- আই এফ এ-১: ৪৫টি আই এফ এ ট্যাবলেট
- আই এফ এ-২: ৪৫টি আই এফ এ ট্যাবলেট

প্রতিটি প্রসূতি মা কীভাবে আই এফ এ ট্যাবলেট খাবেন:

প্রতিদিন সকালে ভরা পেটে ১টি করে আই এফ এ ট্যাবলেট খাবেন।

আই এফ এ ট্যাবলেট খাওয়ার উপকারিতা কী?

- প্রসূতি মহিলাদের রক্তস্বল্পতা দূর করে;
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সঠিক ভাবে হবে;
- মারাত্মক রক্ত স্বল্পতায় আক্রান্ত মায়েদের মাতৃমৃত্যু রোধ করে।

আই এফ এ ট্যাবলেট এর সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কী কী?

আই এফ এ ট্যাবলেট খাওয়ার ফলে সাধারণত তেমন কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তবে,পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলেও তা ক্ষতিকর নয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা স্বাভাবিকভাবে চলে যায়। যেমন-

- কালো পায়খানা ক্ষতিকর নয়;
- শক্ত পায়খানা বেশি পরিমাণে পানি এবং শাক-সবজি খাবার মাধ্যমেই কমানো যায়;
- বমি ভাব ও বমি ভরা পেটে আয়রন বড়ি খেলে কমানো যায়;

উল্লেখ্য যে আই এফ এ ট্যাবলেট সেবনের সাথে চা ও কফি পান না করাই ভাল।

Innovating to save lives
Jhpiego
an affiliate of Johns Hopkins University

FIVDB

শীসাস্থ্রিক

FANTA III
FOOD AND NUTRITION
TECHNICAL ASSISTANCE

Save the Children

পাঠ-১৯

খাদ্য নিরাপত্তা, খাবারের গুনগত মান এবং নিরাপদ খাবার

খাদ্য নিরাপত্তা:

প্রতিটি মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর সুষম পরিপূরকখাদ্যের সার্বক্ষনিক প্রাপ্যতাকে খাদ্য নিরাপত্তাবলে। সহজ ভাষায় বলা যায়, খাদ্য জনগনের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য হবে এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

খাদ্য নিরাপত্তার মূল তিনটি স্তম্ভ:

- **খাদ্যের সহজলভ্যতা:** প্রতিনিয়ত পর্যাপ্তনিরাপদখাবারের সহজলভ্যতা
- **খাদ্যের প্রাপ্যতা:** পুষ্টি সম্মত আহারের জন্য সঠিক খাদ্য ক্রয়ের পর্যাপ্ত সামর্থ্য/সম্পদ থাকা
- **খাদ্যের ব্যবহার:** পুষ্টি এবং যত্নের মৌলিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খাদ্যের যথার্থ ব্যবহার এবং পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি ও পয়:নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকা

খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি স্তম্ভের বিবরণ:

- মানুষের খাওয়ার জন্য অবশ্যই খাদ্যের সহজলভ্যতা/প্রতুলতা প্রয়োজন। বাজার, মজুত, বাগান বা অন্যান্য উপায়ে খাদ্যের সহজলভ্যতা করা যায়
- প্রাপ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং সহজলভ্যতার সাথে সম্পর্কিত। বাজারে যদি খাদ্যের সহজলভ্যতা/প্রতুলতা থাকে কিন্তু কারও যদি ঐ খাদ্য ক্রয়ের স্বক্ষমতা না থাকে তবে বলা যায় ঐ ব্যাক্তির খাদ্য নিরাপত্তা নেই

- খাদ্যের ব্যবহার বলতে বুঝায়, কিভাবে নিরাপদ ভাবে খাবার তৈরী করা হয়, তৈরীকৃত খাবার ও পানি গ্রহণ করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে কিভাবে খাদ্য বন্টন হচ্ছে। সেই খাবার থেকে সকলের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যা স্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত; তার মাধ্যমেই বোঝা যাবে পরিবারটি পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে কিনা। খুব সহজেই বসত বাড়ীতে বাগান, মাছ চাষ বা হাঁস মুরগী পালনের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়

নিরাপদ খাবার:

নিরাপদ খাবার হলো সেই খাবার যা সঠিক নিয়মে, পরিস্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষন করা হয় এবং খাদ্যে রোগজীবানুর উপস্থিতির ঝুঁকি কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার করা পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাদ্য নিরাপদ ও পরিস্কার রাখা উচিত ।

নিরাপদ পানি:

নিরাপদ পানি হলো বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন সেই পানি যার সংস্পর্শে আমাদের ক্ষতি হয় না অর্থাৎ যে পানিতে ক্ষতিকারক দ্রব্য, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, শক্তিশালী এসিড ও ক্ষার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিকারী (যেমন -

ক্যান্সার) এবং বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর (যেমন:ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস) পরিমান স্বীকৃত ক্ষতিকারক মাত্রা থেকে কম থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তা ডায়াগ্রামঃ

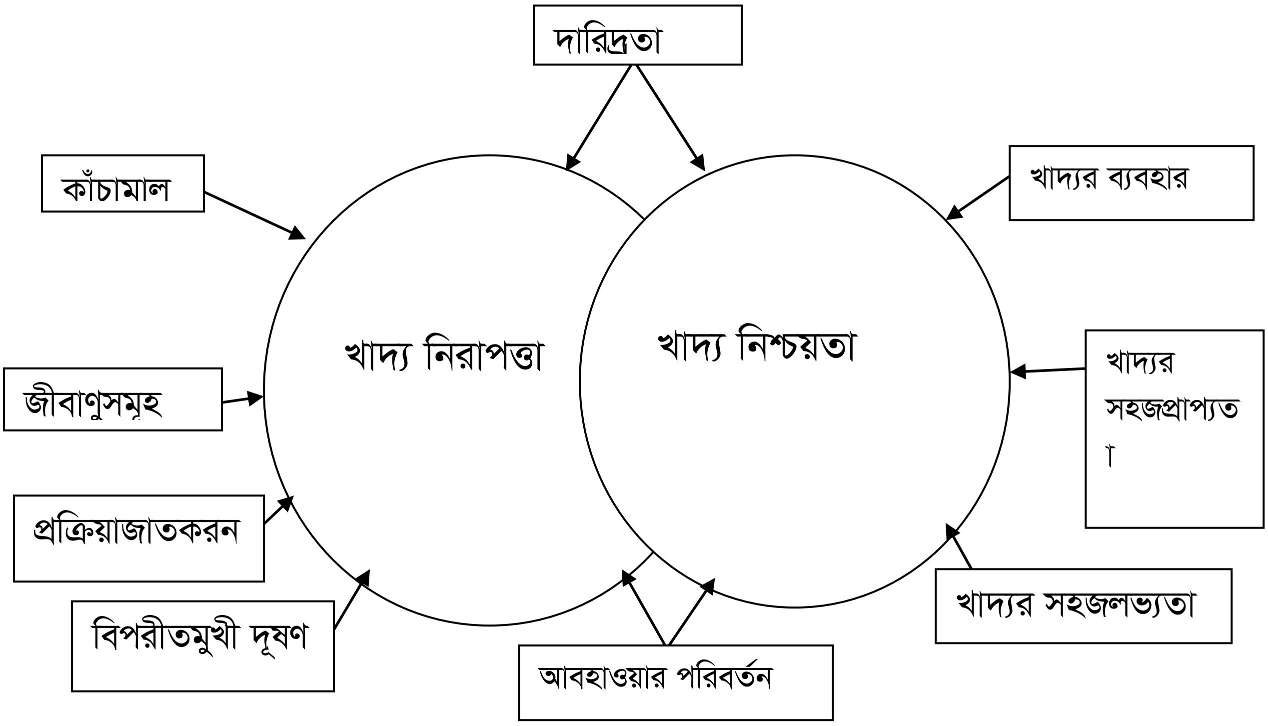

নিরাপদ খাবার ও নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা:

১. বাসি-পঁচা, ফাঙ্গাস পড়া বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। তা খেলে পেটের নানাবিধ নানাবিধ সমস্যা সমূহযেমন হেপাটাইটিস এ এবং ইজনিতভাইরাসরোগ দেখা দিতে পারেজনিত ভাইরাস রোগ দেখা দিতে পারে
২. মাছি পড়া খাবার খেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হতে পারে
৩. কোন খাবার বা পানীয়তে কৃত্রিম রং মেশানো যাবে না। বিভিন্ন খাবারে যে সবকৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় সেগুলো যদি রাসায়নিক বা কাপড়ের রং হয় তাহলে ক্যান্সার ও কিডনী রোগ দেখা দিতে পারে
৪. টমেটো, মটরশুঁটি, পাকা কলা, মাছ ও বিভিন্ন খাদ্যকে সতেজ বা পাকা করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় (যেমন ফরমালিন, কার্বাইড) তা থেকে ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগ হতে পারে
৫. নিরাপদ পানি ব্যবহারে পেটের পীড়া বা ডায়রিয়া, জন্ডিস, আমাশয়, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদি পানি বাহিত রোগ সংক্রমণ হবেনা
৬. যে সমস্ত খাদ্য রান্না করে খাওয়া হয়না (যেমনঃ সালাদ, সবজি) সেগুলো নিরাপদ পানিতে ঠিকমত ধোয়া না হলে তার মাধ্যমে এবং দূষিত পানি, মাটি অথবা আঙ্গুলের মাধ্যমে কৃমির ডিম মুখপথের মাধ্যমে অন্ত্রে প্রবেশ করে

নিরাপদ খাবার ও পানি নিশ্চিত করার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ:

১. **পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন:**
   - হাত পরিষ্কার করে প্রতিবার খাবার তৈরিতে ও পরিবেশন করুন

- শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কার করার পর হাত সাবানে ভালভাবে পরিস্কার করুন
- পশু পাখি পরিচর্যার পর হাত পরিস্কার করুন
- খাওয়ার আগে এবং শিশুকে খাওয়ানোর আগে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিন
- খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত বাটি, চামচ ইত্যাদি ব্যবহারের আগে সাবান ও পানি দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে নিন
- খাবার জন্য ব্যবহৃত বাসন–পত্র ধুয়ে নিন
- রান্নঘর ও খাদ্য পোকামাকড় মুক্ত করুন
- সবসময় টাটকা খাবার নির্বাচন করুন
- হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন

২. **কাঁচা এবং রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখুন:**

- রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি আলাদা রাখুন।কাঁচা মাছ,মাংস, সবজি ইত্যাদি কাটার জন্য পরিস্কার ছুরি/বটি ব্যবহার করুন
- ঢাকনা যুক্ত পাত্রে রান্না করা খাবার রাখুন

৩. **ভালভাবে সিদ্ধ করে রান্না করুন:**

- মাংস, ডিম ভাল করে সিদ্ধ করে রান্না করুন
- পুনরায় গরম করার সময় ভালোভাবে গরম করুন। সম্ভব হলে ভাল করে ফুটিয়ে নিন
- দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করুন

৪. **নিরাপদ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন:**

- রান্নাকরা খাবার ঘরের তাপমাত্রায় ২ ঘন্টার বেশী না রাখা
- খাবার রিফ্রিজারেটরে থাকলেও লম্বা সময় খাদ্য সংরক্ষণ না করা
- শিশুদের খাবার টাটকা হওয়া বাঞ্চনীয় এবং রান্নার পর সংরক্ষন করা উচিত নয়

৫. **নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন:**

- রান্না ও খাবার খাওয়ারক্ষেত্রে সবসময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন
- পানি পান করার পূর্বে ফুটিয়ে নেয়া উচিত। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি, পানি বিশুদ্ধকরন বড়ি ব্যবহার করে জীবানুমুক্ত করুন এবং পরিষ্কার পাত্রে রাখতে বলুন
- পুকুর কিংবা নদীর পানি পান না করা
- যদি কাঁচা খেতে চান তাহলে ফল ও শাক নিরাপদ পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিন
- সব্জি ও ফল মূল কাটার পূর্বে ১ চা চামচ খাবার লবণ নিরাপদ পানিতে মিশিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিঃ ভিজিয়ে রাখলে, শাক-সবজি ও ফল মূলে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব বহুলাংশে কমে যায়
- প্রক্রিয়াজাত,প্যাকেটজাত খাবার মেয়াদ (Expiry date) পার হলে খাবেন না

খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ:

যে সকল রোগ খাদ্য ও পানি দ্বারা এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে সেগুলোকেই খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ বলে। খাদ্য ও পানি আমরা সবাই ব্যবহার করি বলে এগুলোর মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ-জীবাণুগুলো সাধারণত আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে আক্রমণ করে

এবং নানা রকমের পেটের পীড়া সৃষ্টি করে। তিন ধরনের জীবাণু দ্বারা এই রোগগুলোর সংক্রমণ হয়, যথা: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী।

মাছি, ইঁদুর, তেলাপোকা ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যবাহিত রোগ সংক্রমণ হয়। মল, কফ ইত্যাদির উপর বসে মাছি বিভিন্ন জীবাণু বহন করে আনে, পরে খোলা খাদ্যে বসে জীবাণু ছড়ায়।

সাধারণত নিম্নলিখিত অসুস্থতা খাদ্য ও পানিবাহিত রোগজীবানু সংক্রমণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

- পাতলা পায়খানা
- কলেরা
- আমাশয়
- টাইফয়েড
- খাদ্যে বিষক্রিয়া
- জন্ডিস/হেপাটাইটিস
- পোলিও মাইলাইটিস

খাদ্য ও পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচার উপায়:

১. বাসি-পঁচা ও খোলা খাবার খাওয়া যাবে না। রান্না করা খাবার গরম অবস্থাতেই খেতে হবে। ঠান্ডা হলে খাবার আবার গরম করে খেতে হবে
২. পানি প্রয়োজনে ফুটিয়ে নিরাপদ করতে হবে। পানি কমপক্ষে ১০ মি: ফুটিয়ে পান করতে হবে
৩. কাঁচা ফল, সব্জি নিরাপদ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে খেতে হবে
৪. খাবার পরিস্কার স্থানে ও ঢেকে রাখতে হবে
৫. খাওয়াসহ গৃহস্থালির সকল পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে
৬. যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করা যাবে না এবং বাচ্চাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পায়খানা করার অভ্যাস করতে হবে
৭. পায়খানার পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে দুই হাত পরিস্কার করে ধুতে হবে
৮. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
৯. স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যেতে হবে
১০. বাড়ির আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে
১১. গৃহপালিত পশু পাখির মল মূত্র নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে

স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খাবার তৈরী করা:

১. রান্নার পূর্বে এবং খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত সাবান ও পানি দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে নিন
২. রান্নার জন্য তরকারী বড় বড় টুকরা করে কাটা উচিত, এতে খাবারের পুষ্টি গুনাগুণ বজায় থাকে
৩. যেসকল খাবার সতেজ এবং ভাল তা দিয়ে খাদ্য তৈরি করুন
৪. রান্নার পুর্বে মাছ, মাংস, শাক-সব্জি, ফলমূল পরিস্কার পানি দিয়ে ধোয়া উচিত। তা নাহলে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে
৫. খাবার ভালভাবে রান্না করা অর্থাৎ কোন অংশ কাঁচা না রাখা- যেন সকল জীবানু মারা যায়। মাছ, মাংস, ডিম, মুরগী ভাল তাপে রান্না করা উচিত। ডিম কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়
৬. বাসি খাবার খাওয়ার আগে পানি ফুটানোর তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করে নেয়া
৭. খাদ্য প্রস্তুতিতে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করা
৮. ধুলাবালি এড়ানোর জন্য খাদ্যের পাত্র ও রান্নার হাড়ি মেঝেতে না রাখা
৯. রান্নার জন্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র যেমন বটি, ছুরি, দা ইত্যাদি ব্যাবহার করার পর ভালভাবে ধোয়া উচিত। যদি সম্ভব হয় পুনরায় ব্যবহারের জন্য তা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিস্কার করা

১০. খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে

পরিস্কার ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খাবার সংরক্ষণ:

১. পরিষ্কার ও ঢাকনা যুক্ত পাত্রে খাবার সংরক্ষণ করা উচিত
২. সম্ভব হলে খাবার শুকনো করে রাখা উচিত (যেমন- গুড়া দুধ, চিনি, সুজি)
৩. খাবার তৈরীর ২ ঘন্টার মধ্যে খাবার খাওয়া উচিত
৪. যদি অনেকক্ষন খাবার বাইরে থাকে তাহলে, খাবার ভাল করে গরম করে খাওয়া উচিত, যেন জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটে
৫. পোকামাকড়ের বা অন্য কোন জীবাণুর আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য খাবার শুকনো স্থান এবং ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা উচিত
৬. রান্না করা খাবার ফ্রিজে বা তাকে তুলে রাখা উচিত
৭. কাঁচা মাছ, মাংস, মুরগী, আলাদা স্থানে রাখা উচিত। ফ্রিজে রাখা দুধ ১ দিনের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত
৮. আয়োডিনযুক্ত লবণ সূর্য রশ্মি থেকে দূরে ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বয়োম বা প্লাস্টিকের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং রান্নার শেষ মুহুর্তে লবণ ব্যবহার করা উচিত। বাজারে খোলা লবণ কেনা উচিত না

হাত ধোয়ার গুরুত্ব এবং কখন কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবে:

হাত ধোয়ার গুরুত্ব:

১. খাদ্যসামগ্রী ও পানি সংক্রমিত হওয়া এড়াতে
২. মুখে জীবানু প্রবেশ করানো এড়াতে
৩. ডায়রিয়া সংক্রমন এড়াতে
৪. কৃমির সংক্রমন এড়াতে
৫. চর্মরোগ সংক্রমণ এড়াতে

কখন কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবে:

১. খাবার তৈরী/ রান্না করার আগে
২. কোন খাবার ধরার বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে মা/যত্নকারী ও শিশুর হাত ধুয়ে নিতে হবে
৩. পায়খানা/টয়লেট ব্যবহার করার পরে
৪. শিশুর পায়খানা পরিস্কার করার পরে (বা অন্য কোন পায়খানা)
৫. গবাদি পশু-পাখী ধরার পরে এবং তাদের পায়খানা পরিস্কার করার পরে

এছাড়াও নিম্নলিখিত সময়ে হাত ধোয়া আবশ্যক:

১. শিশুর সর্দি পরিস্কার করার পরে
২. হাঁচি দেয়ার পরে
৩. কাঁচা মাছ- মাংস ধরার পরে
৪. রোগীকে দেখার আগে ও পরে
৫. ময়লা নিয়ে কাজ বা খেলা করার পরে
৬. টাকা-পয়সা ধরার পরে

পাঠ-২০
দূর্যোগকালীন অপুষ্টির কারণ, খাদ্য সহায়তা এবং IYCF এর নীতিসমূহ

দুর্যোগ বা জরুরী অবস্থায় অপুষ্টির কারণ ও করণীয়:

দুর্যোগকালীন সময়ে সকলে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়না। বয়স, লিঙ্গ ও স্থানভেদে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকট ও সম্পদের ক্ষতিতে জনগণের, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী অপুষ্টি দেখা দেয়।এ মতাবস্থায়, সৃষ্ট খাদ্য ও সম্পদের সংকটে প্রয়োজন হয় প্রাপ্ত খাদ্য ও সম্পদের যৌক্তিক বিতরণ।

দুযোর্গের সময়ে সবার কাছে, সঠিক সময়ে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য ও নিরাপদ পানীয় পৌঁছানো সম্ভব হয়না এবং বাবা, মা ও আত্মীয়-স্বজনরা খাদ্য, পানি এবং রোজগারের খোঁজে ছোটাছুটি করতে হয় বলে শিশুদের প্রতি সময় কম দিতে পারে ফলে ব্যাপক আকারে অপুষ্টি দেখা দেয়।দুর্যোগকালীন অপুষ্টির কারণকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়–

১) খাদ্যের অপর্যাপ্ত সরবরাহ
২) অপ্রতুল সেবা
৩) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকারীতার অভাব

দুর্যোগ বা জরুরী অবস্থায় করণীয়:

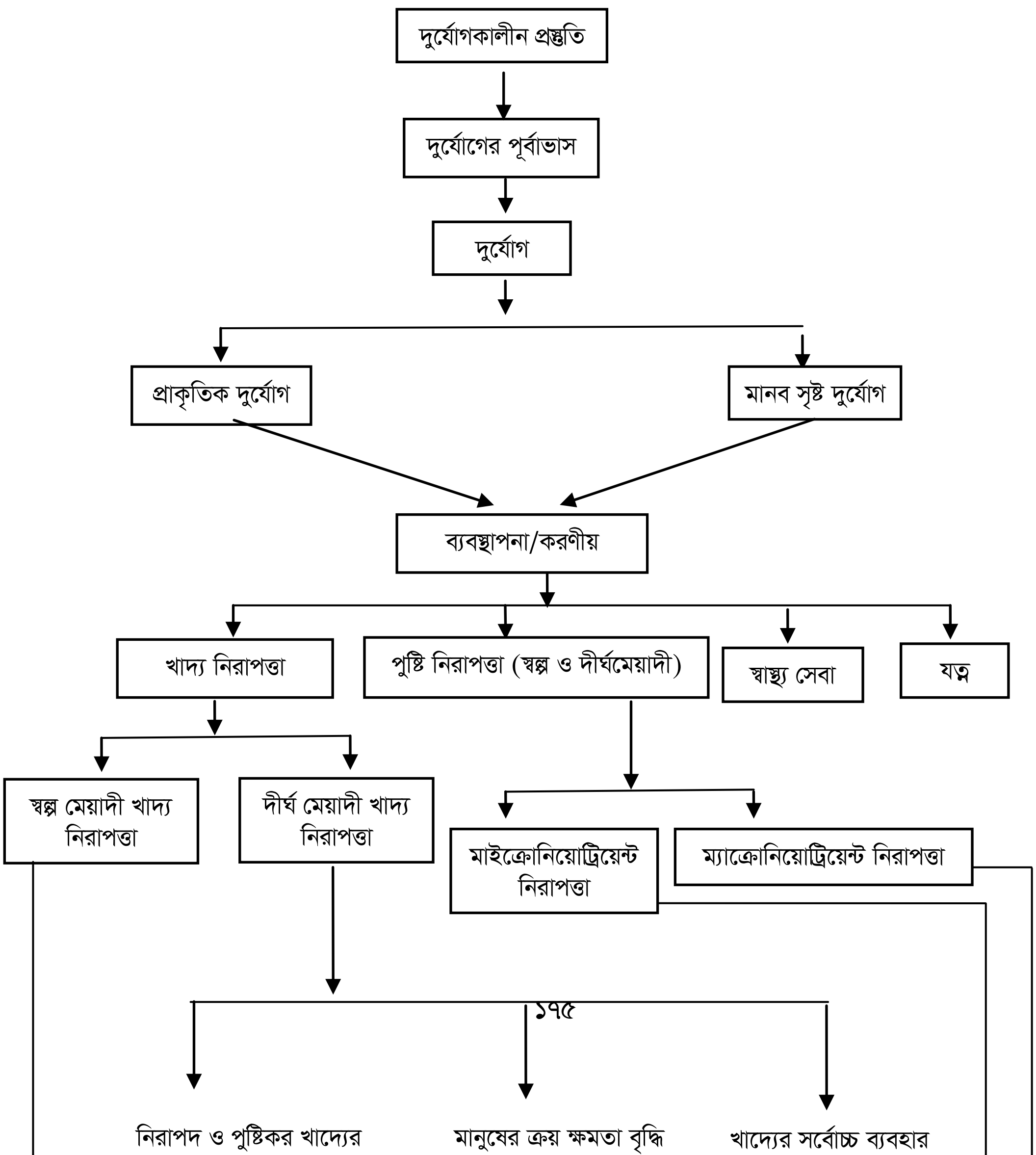

নিরাপদ অবস্থান: দুর্যোগকালীন সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিতে হবে।

খাদ্য: যে কোন দুর্যোগেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রক্রিয়া আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন- বন্যায় ফসলের মাঠ পানিতে তলিয়ে যায়, খাদ্যশস্য নষ্ট হয় ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। বহু মানুষের ঘরবাড়ি পানিতে আংশিক বা পূর্ণ নিমজ্জিত হওয়ায়, বাসস্থানের সন্ধানে মানুষকে নতুন জায়গায় যেতে হয়। নতুন জায়গায় বসতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) স্থাপন, ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান, অনেক পরিবারের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠেনা।

সেবা: যেসব শিশুরা মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল এবং যাদের বয়স ৬-১২ মাস (যারা মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার খায়) তারা দুর্যোগের সময় কম-বেশী ভূক্তভোগী হয়েই থাকে। শিশুরা কতখানি ভূক্তভোগী হবে তা দুর্যোগের ভয়াবহতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে।

দুর্যোগের সময় শিশুদের সঠিক সেবা না পাবার প্রধান প্রধান কারণ-

- দুর্যোগে পরিবারের সদস্য এবং সেবা প্রদানকারীদের ওপর মানসিক চাপ
- খাদ্য, পানি এবং রোজগারের খোঁজে ছোটাছুটি করতে হয় বলে শিশুদের প্রতি সময় কম দিতে পারে
- দুর্যোগকালে স্বাভাবিক সাংসারিক কাজ বিঘ্নিত হওয়ায়, অনেক সময়ের অপচয় হয়। যেমন-রান্নার বাসনপত্র ও জ্বালানীর যোগান
- সুপেয় পানির অভাব দেখা যায় বলে খাবার পানির সন্ধানে তাদের বের হতে হয়

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা: যে কোন দুর্যোগেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবায় বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। দুর্যোগকালে চলমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নানাবিধ বাধা আসে। দুর্যোগ আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা দেয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনা। দুর্যোগে পুষ্টিকর খাবার ও নিরাপদ পানির অভাব হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়ায়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে মানুষের আধিক্যে নানা ধরণের সংক্রামক রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্যোগকালীন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (Micronutrient)-এর অভাবজনিত সমস্যা :

দুর্যোগকালীন সময়ে সচরাচর যেসব মাইক্রোনিউটিয়েন্ট-এর অভাব হয় তা হলো–

ক) আয়োডিনের অভাব /Iodine deficiency disorder
খ) আয়রণের অভাব /Iron deficiency Anaemia
গ) ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব /Vitamin A deficiency
ঘ) জিংক এর অভাব/Zinc deficiency

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক আয়োডিন, আয়রণ এবং ভিটামিন-এ এর অভাবে ভুগছে এবং এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই উন্নয়নশীল দেশের। এসব মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-এর অভাবে সংক্রামক ব্যাধি, অন্ধত্ব, জন্মগত ত্রুটি হয় এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। দুর্যোগে মাইক্রোনিউটিয়েন্টের অভাবে অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার উভয়ই বেড়ে যায়।

দুর্যোগকালীন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাব প্রতিরোধে করণীয়:

ফুড ফর্টিফিকেশন (Food Fortification)-

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাব দূরীকরণে ফুড ফর্টিফিকেশন খুবই কার্যকরী একটি উপায়। এর উদ্দেশ্য, একটা বা দু'টো পুষ্টি উপাদান যার অভাব প্রায়শই দেখা যায়, খাদ্যে তার পরিমাণ বাড়িয়ে মানুষের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করা।

তিনটি পদ্ধতিতে খাদ্যকে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ করা সম্ভব–

১) বাজারজাত করার পূর্বে, প্রক্রিয়াজাতকালে বিভিন্ন খাদ্যের কিছু কিছু গুরত্বপূর্ণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট নষ্ট হয়। যেমন-কারখানা/মিলগুলোতে ধান থেকে চাল বানানোর সময় চালের উপরে লালচে-বাদামী আবরণ যা ভিটামিন বি সমৃদ্ধ তা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাজারজাত করার পূর্বে, প্রক্রিয়াজাতকালে খাদ্য শস্যের গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে

২) যে খাদ্যে যতটুকু পরিমাণ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান তার থেকে পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমেও ফুড ফর্টিফিকেশন করা যায়। যেমন-দুধের সাথে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম যোগ করে, আটার সাথে আয়রণ যোগ করে

৩) ফুড ফর্টিফিকেশন-এর আরেকটি উপায় হলো, কিছু কিছু খাবারের সাথে ঐ খাদ্যে বিদ্যমান নেই এমন কোন নতুন পুষ্টি উপাদান যোগ করা। যেমন- সয়াবিন তেলের সাথে ভিটামিন এ যোগ করা, লবণের সাথে আয়োডিন যোগ করা

ভিটামিন ও মিনারেল সাপ্লিমেন্টেশন (Supplementation):

ভিটামিন এ:

নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রযোজ্য হলে, জরুরী/ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সব শিশু যাদের বয়স ৬ মাস থেকে ৫ বৎসর এবং প্রসূতি মায়েদের (শিশু জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত) ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন দেয়া উচিত:

- জনগোষ্ঠি যে অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেখানে ভিটামিন এ এর অভাব আছে
- বসবাসরত এলাকার মানুষের মধ্যে ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত উপসর্গগুলো (রাতকানা রোগ/বিট্‌টস স্পট) বিদ্যমান আছে
- ঐ এলাকায় অপুষ্টি/ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশী আকারে বিদ্যমান থাকলে
- ব্যাপক আকারে হাম ছড়িয়ে থাকলে

বয়স	ভিটামিন এ ক্যাপসূল-এর মাত্রা	খাওয়ানোর সময়সূচি
শিশু ৬-১১ মাস	১০০,০০০ আই ইউ	১টি নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
শিশু ১২-৫৯ মাস	২,০০,০০০ আই ইউ	৪-৬ মাস পরপর বছরে ২ বার ১টি করে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
প্রসূতি মা প্রসবের পর পরই (২ সপ্তাহের মধ্যে)	২,০০,০০০ আই ইউ	প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মাকে ১টি লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

- ORS এবং জিংক সাপ্লিমেন্টেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরবর্তীতে হাম এর প্রকটতা ও জটিলতা কমানোর জন্য ১ বছরের নীচে শিশুদের জন্য বিশেষ হাম ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করতে হবে

আয়রণ: রক্তস্বল্পতার একটা বড় কারণ হলো রক্তে আয়রণের অভাব হওয়া। সেজন্য যাদের রক্তস্বল্পতার হবার ঝুঁকি আছে এবং যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছে, তাদের আয়রণ ও ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট দেয়া উচিৎ।

দুর্যোগকালীন খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান:

দু'টি উপায়ে মানুষের মাঝে খাদ্য ও পুষ্টি পৌছানো সম্ভব-

১) **জেনারেল ফুড ডিসট্রিবিউশন:**
জেনারেল ফুড ডিসট্রিবিউশন বলতে বুঝায়, দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের খাদ্য সংকট-এর সময় খাদ্য বিতরণ করাকে। সাধারণত খুব বড় আকারের কোন দুর্যোগ যেমন- ভূমিকম্প বা ক্ষরায় মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে ভোগে। এসময় এই প্রক্রিয়ায় মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়

২) **সিলেক্টিভ ফিডিং প্রোগ্রাম:**
সিলেক্টিভ ফিডিং প্রোগ্রাম-এই প্রোগ্রাম দুই ধরণের হতে পারে–

- সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রাম (Supplementary Feeding Programme) এবং
- থেরাপিউটিক ফিডিং প্রোগ্রাম (Therapeutic Feeding Programme)

সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রাম:
এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেসব মানুষ মাঝারি মাত্রার অপুষ্টিতে (Moderate Malnutrition) ভুগছে এবং যারা অপুষ্টিতে ভোগার ঝুঁকিতে আছে (যেমন- কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা) তাদের মাঝে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা। জেনারেল ফুড ডিসট্রিবিউশন এর পাশাপাশি এ প্রোগ্রাম চালানো। এই প্রোগ্রাম ২ ধরণের হতে পারে–

ক) **ব্লাংকেট ডিসট্রিবিউশন** - একটা নির্দিষ্ট এলাকার অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা সবাইকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা। মনে রাখতে হবে ৬ মাসের নীচের শিশু এবং বি এম এস কোড ভঙ্গ করে এমন কোন খাবার ২ বছরের কম বয়সী শিশুকে দেয়া যাবেনা

খ) **টার্গেটেড ডিসট্রিবিউশন**-যারা মাঝারি মাত্রার অপুষ্টি (Moderate Malnutrition) তে ভুগছে তাদেরকে পুষ্টিকর খাবার বিতরণের মাধ্যমে, অতিরিক্ত মাত্রার অপুষ্টি (Severe Malnutrition) থেকে রক্ষা করা

থেরাপিউটিক ফিডিং প্রোগ্রাম:

এই প্রোগ্রামটি যারা অতিরিক্ত মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের জন্য প্রযোজ্য ।বর্তমানে শিশুদের (০-৫ বছর বয়স পর্যন্ত) বয়সের তুলনায় ওজন নিয়ে পুষ্টি অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৬ রেফারেন্স (WHO-2006 Reference) অনুযায়ী Z score পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। Z score পদ্ধতিতে অপুষ্টি গ্রেড নিম্নরূপ :

পুষ্টি অবস্থা	Z score পদ্ধতি
স্বাভাবিক	+2 z থেকে - 1 z
অল্প পুষ্টি	-1 z থেকে - 2 z
মাঝারি অপুষ্টি	-2 z থেকে – 3 z

মারাত্মক অপুষ্টি	- 3 z এর কম

দুর্যোগে জরুরী অবস্থায় IYCF এর নীতিসমূহ;

মূলনীতি ১: দুযোগপূর্ণ অবস্থাতেও জন্মের পর হতে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধই খাওয়াতে হবে

যে কোন শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। শুধু তাই নয় মায়ের বুকের দুধ শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ইনফেকশন/সংক্রামক রোগ থেকেও রক্ষা করে।

শিশু জন্ম হবার পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত, তার জন্য মায়ের বুকের দুধই একমাত্র খাদ্য। এতে শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য সব প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকে। মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খেয়াল রাখতে হবে ৬ মাসের কম বয়সের শিশুদের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাতেও শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোই চালিয়ে যেতে হবে।

শিশুকে সঠিকভাবে মায়ের দুধ পান করানোর পদ্ধতি :

অবস্থানের (Position) চারটি মূল বিষয় হলো –

- শিশুর মাথা ও শরীর একই রেখায় আছে
- শিশুর শরীর মায়ের সাথে নিবিড়ভাবে লেগে আছে
- শিশুর সমস্ত শরীর ভালভাবে আগলানো আছে
- শিশু যখন স্তনের দিকে আগাচ্ছে তখন তার নাক বোটা বরাবর আছে

সংযোগের (Attachment) চারটি মূল বিষয় হলো –

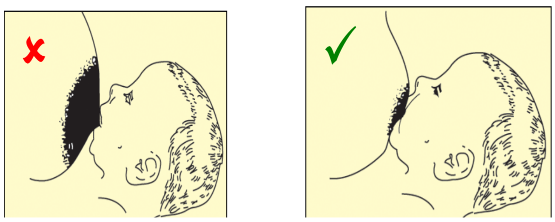

- শিশুর মুখ বড় করে হাঁ করতে হবে
- শিশুর থুতনি মায়ের স্তনে লেগে থাকবে
- নিচের ঠোঁট বাইরের দিকে উল্টানো থাকবে
- স্তনের উপরের কালো অংশ নিচের অংশের চেয়ে বেশী দেখা যাবে

শিশুকে কিভাবে স্তনে সংযুক্ত করবেন:

- স্তনের বোঁটা শিশুর উপরের ঠোঁটে ছোয়াবেন
- শিশু বড় করে হা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন
- বড় করে হা করার সাথে সাথে শিশুকে স্তনের উপর টেনে নিন যেন বোঁটার বেশ নীচে শিশুর নীচের ঠোঁট থাকে এবং স্তনের কালো অংশসহ শিশুর মুখের ভেতর চলে যায়

- মায়ের আচরণ লক্ষ্য করুন এবং শিশুর দুধ চোষার ফলে তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চান। ভাল সংস্থাপন হয়েছে কিনা লক্ষ্য করুন, না হলে আবার চেষ্টা করুন

দুর্যোগ বা জরুরী অবস্থায় নিম্নলিখিত কারণে মা এবং শিশু আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং মাতৃদুগ্ধপান ব্যাহত হতে পারে।

- মায়ের অসুস্থতা, আহত হওয়া এমনকি মৃত্যু
- দুর্ঘটনার সময় মা এবং শিশু আলাদা হয়ে যাওয়া

এমতাবস্থায় শিশু যাতে আবার বুকের দুধ খেতে পারে যত দ্রুত সম্ভব সে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে অন্য প্রসূতি মায়ের বুকের দুধ শিশুকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মূলনীতি ২: লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে, শিশুর দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত বা তারও বেশী বয়স পর্যন্ত মায়েরা বুকের দুধ খাওয়ানোতে উৎসাহিত হয়

৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ এবং ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুকে বাড়তি খাবার দিতে হবে। এমতাবস্থায়, বাড়িতে তৈরী খাবার যেমন নরম খিচুড়ী, হালুয়া, ভাত, ঘনডাল, মাছ/মাংস/ডিম, সবজি, মৌসুমী ফলমূল শিশুদের খাদ্য তালিকায় ক্রমান্বয়ে যোগ করতে হবে। এ সময় শিশুর খাবার তালিকায় প্রাণীজ আমিষ অবশ্যই যোগ করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের কোন ঘাটতি তার শরীরে না হয়।

৬-২৪ মাস বয়সী শিশুদের অন্য খাবারের সাথে সাথে বুকের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

মূলনীতি ৩: দুর্যোগেও কোন ধরনের ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট (BMS) বা দুধের কৃত্রিম বিকল্প খাদ্য খাওয়াতে উৎসাহিত করা যাবেনা

সতর্ক বন্টন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্যোগে ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট সরবরাহ করতে হবে, কেবলমাত্র যাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র তাদেরকেই। অযাচিতভাবে সব শিশুদের জন্য এসব বিকল্প খাবার সরবরাহ করলে, হিতে বিপরীত হতে পারে। বিকল্প খাবার বন্টনের পাশাপাশি মানুষকে বারবার সচেতন করতে হবে যে, ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, কোন ব্রেস্টমিল্ক সাবস্টিটিউট দেয়া যাবেনা।

শুধুমাত্র যেসব ক্ষেত্রে ব্রেস্টমিল্ক সাবস্টিটিউট প্রযোজ্য:

- যেসব শিশুর মা মারা গেছেন এবং অন্য কোন ভাবে কোন মায়ের কাছ থেকে বুকের দুধ জোগাড় করা সম্ভব নয় শুধুমাত্র সেসব শিশুকে দিতে হবে সঠিক নিয়ম মেনে।

মায়ের বুকের দুধের বিকল্প খাবার বন্টনের পাশাপাশি অবশ্যই তাদের এর সঠিক ব্যবহার সর্ম্পকে জানাতে হবে-

- কাপ ব্যবহার করে কিভাবে শিশুদের জন্য খাবার প্রস্তুত করবে তা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে।
- বিকল্প খাবার রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র এবং খাওয়ানোর জন্য কাপ সরবরাহ করতে হবে।
- রান্নার জন্য পরিষ্কার/নিরাপদ পানি ও চুলা জ্বালানোর জন্য জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঠিকভাবে প্রস্তুত না করলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখলে খাবার যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি বয়ে আনবে, তা তাদের জানাতে হবে।

দুর্যোগের সময় ফিডার বা চুষনীর ব্যবহার বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। কারণ এগুলো পরিষ্কার করা কঠিন এবং ব্যবহারে পাতলা পায়খানা, পানি শূণ্যতা ও অপুষ্টি হতে পারে।

মূলনীতি ৪: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখার জন্য ৬ মাস বয়সের পর থেকেই মায়ের দুধের পাশাপাশি সহজপাচ্য, পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে

শিশুদের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা তাদের প্রথম ২ বৎসর বয়সে সবচেয়ে বেশী থাকে।

শিশু বার বার খাবে, এ কথাটি মায়ের দুধের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি বাড়তি খাবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঘরে তৈরী করা দেশীয় খাবারের দ্বারা শিশুকে স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ সবল করে গড়ে তোলা। সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যে ঘরে তৈরী খাবার হতে পারে খিচুড়ী বা পরিবারের জন্য রান্না করা খাবারের। বাড়তি খাবার যেমন দুধের পায়েস, ফিরনী, হালুয়া, সেমাই, মাছ, ডাল, ভাত, ডিম, মাংস, পুরি, পিঠা, ডালের বড়া, মাছের কাটলেট, ডাল ও মাংস দিয়ে বড়া, সব্জী বড়া, মাছের চপ ইত্যাদি হতে পারে। কিন্তু মূলকথা হল শক্তি ঘনত্ব-পর্যাপ্ত পরিমানে তেল দিয়ে শক্তি ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রানীজ আমিষ দিতে হবে ডিম/ মাছ/মাংস/কলিজা ইত্যাদি। ভাত, আলু, আটা অবশ্যই থাকবে কিন্তু পরিমান অর্ধেক এর বেশী হবে না।

মূলনীতি ৫: শিশুদের অভিভাবকদের বা সেবা প্রদানকারীদের কাছে পুষ্টিকর, সহজপাচ্য খাবার তৈরীর সব উপাদান সহজলভ্য হতে হবে

শিশুদের খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উপাদান গুলোর সঠিক সরবরাহ থাকা খুব জরুরী। কিন্তু এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঘরের বাকি সবার খাদ্যের সরবরাহ ঠিক না থাকলে, অভিভাবকেরা ঠিকমত শিশুদের যত্ন করতে পারবেনা।

দুর্যোগের সময় ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে শিশুদের পুষ্টির কথা চিন্তা করে যে উপাদানগুলো ত্রাণের তালিকায় রাখা উচিত তা হলো চিনি, শস্য বা ডাল এবং তেল। এছাড়া ফর্টিফাইড খাবারও ত্রাণের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

শিশু খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানের শুধু সরবরাহ নিশ্চিত করলেই চলবেনা, খাবার যেন স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রস্তুত করা হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, দুষিতপানি ব্যবহার করে রান্না করা হলে অনেক ধরণের খাদ্যবাহিত রোগ হতে পারে।

দুর্যোগের সময় সঠিক সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে জানাতে হবে নিরাপদ খাদ্য তৈরী প্রস্তুত ও খাদ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে। যেমন-

- রান্না না করা খাবারগুলোকে সবসময় শুকনা এবং নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে
- খাবারগুলোকে পোকা-মাকড়, ইদুঁর বা অন্য প্রাণীর আক্রমন থেকে রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে
- কাঁচা খাদ্য বস্তুর সঙ্গে রান্না করা খাবার একই স্থানে রাখা যাবেনা
- যে স্থানে শিশুদের খাওয়ানো হয় সে স্থান কোনভাবেই যেন কোন জীবজন্তু এবং মানুষের মলমূত্রের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- খাবার প্রস্তুত করার সব স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- খাবার প্রস্তুত করার আগে ভালমত হাত ধুয়ে নিতে হবে
- খাবারের সব সরঞ্জাম ভালমত পরিষ্কার করতে হবে
- খাবার প্রস্তুতিতে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে
- যদি বেশী আগে তৈরী করা খাবার খাওয়া হয়, তাহলে খাবার খাওয়ার আগে অবশ্যই গরম করে নিতে হবে
- খাবার খাওয়ার আগে শিশুরা যেন ভালমত হাত ধুয়ে নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

দুর্যোগের সময় পুষ্টিকর এবং সহজে রান্না করা যায় এমন খাদ্য সরবরাহ না করা হলে বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এর অভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় অর্ধেকের বেশী নারী ও শিশুই রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত। আয়রণ এর অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা দুর করার জন্য, যাদের এই রক্তস্বল্পতা হবার ঝুঁকি আছে তাদের আয়রণ সাপ্লিমেন্ট দেয়া যেতে পারে।

মানুষকে আয়োডিন এর অভাবজনিত রোগ যেতে রক্ষা করা যায় আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়ানোর মাধ্যমে। যেহেতু দুর্যোগের সময় শাক-সব্জি ও ফলমূলের অভাব থাকে, তাই ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' এর অভাব দেখা যায় দুর্যোগে। শিশুদের ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করতে ফর্টিফাইড খাবার বা ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট দেয়া যেতে পারে।

একজন মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যসহ পরিবার-

যেসব পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শুধুমাত্র একজন, সেসব পরিবারে শিশুদের সেবা একদমই ঠিকভাবে হয় না। এর কারণ-

- শিশুর দেখাশুনার প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবার সুযোগ তাদের কমে যায়
- টাকা পয়সা উপার্জন এবং সাংসারিক কাজ কর্মে পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব হয়না
- দুর্যোগে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুজে নেবার জন্য সাহায্য করার কেউ থাকেনা
- ঘরের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়, যেহেতে্ু সেই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য

এসব পরিবারের শিশুদের অপুষ্টিতে ভোগার সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি থাকে

মূলনীতি ৬: দুর্যোগে শিশুদের সেবা অপর্যাপ্ত হয়, তাদের অভিভাবকদের মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

শিশুদের সঠিক সেবা অভিভাবকদের শারিরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার ওপর নির্ভর করে। দুর্যোগের সময় খাদ্য ও জ্বালানী সংগ্রহে এবং মানসিক চাপে প্রায়শই শিশুদের যত্ন কম হয়।

অভিভাবকদের মানসিক চাপ কমানো ও সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- কার্যকরী খাদ্য বন্টন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, যাতে ঘরে ঘরে খাবার পৌছে যায়
- পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও বন্টন করা
- যেসব পরিবারে ছোট শিশু ও বৃদ্ধ বয়সের লোকজন আছে সেসব পরিবারের জন্য জ্বালানী সরবরাহ করা
- দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবারগুলোর অভিভাবকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা
- তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই তাদের মাঝে গ্রুপ বা দল তৈরীর ব্যাপারে উৎসাহিত করা, যাতে যেকোন কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়

গর্ভবর্তী ও প্রসূতিদের জন্য করণীয়:

যেহেতু গর্ভবতী অবস্থায় এবং প্রসূতিতে মায়ের খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই দুর্যোগের সময় তাদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের জন্য অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ করতে হবে খাদ্য বন্টন প্রক্রিয়ার সময়।

গর্ভবর্তী ও প্রসূতিদের পুষ্টির চাহিদা:

গর্ভবর্তী মহিলা:

- প্রতিদিন স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় তাদের ৩০০ কিলোক্যালরি বেশী প্রয়োজন
- যদি গর্ভবর্তী মা অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে অতিরিক্ত আরও ৫০০ কিলো ক্যালরি তাদের খাদ্য তালিকায় যোগ করা প্রয়োজন
- তাদেরকে আয়রণ ও ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে
- ম্যালেরিয়া এনডেমিক (Endemic) এলাকায় বসবাস করলে তাদের ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক খাওয়াতে হবে
- নিরাপদ প্রসব ও পয়ঃনিষ্কাশন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে

প্রসূতি মা:

- প্রসূতি মা'দের স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় প্রতিদিন ৫০০ কিলোক্যালরি বেশী প্রয়োজন
- যদি প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে তার আরও ৫০০ কিলোক্যালরি বা তার বেশী গ্রহণ করতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য আলাদা Breastfeeding Corner-এর ব্যবস্থা করতে হবে
- ২ বছরের নীচে (৬-২৩মাস) শিশুদের প্রয়োজনীয় খাবার তৈরীর সুযোগ থাকতে হবে

মূলনীতি ৭: শিশুদের রোগমুক্ত রাখতে হবে, যাতে তারা সঠিকভাবে মায়ের বুকের দুধ পান করতে পারে এবং পাশাপাশি অন্য খাবারও ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে

শিশুদের সঠিকভাবে বুকের দুধ এবং অন্যান্য খাবার গ্রহণ করতে হলে তাদের সুস্থ থাকা খুব জরুরী। শিশু কিশোরদের ইনফেকশন বা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলি যথাযথভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে-

- যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ খায়, দুর্যোগের মধ্যে তাদের মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে
- শিশুদের সব অবস্থাতেই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে
- শিশুদের সময়মত টিকা দিতে হবে
- রোগ জীবাণূ ছড়ানোর বাহক যেমন মশা, মাছি থেকে পরিত্রানের উপায় খুজে বের করতে হবে
- অসুস্থ শিশুদের সঠিকভাবে চিকিৎসা দিতে হবে

l

মূলনীতি ৮: সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অপুষ্টির শিকার শিশুদের খুঁজে বের করতে হবে এবং চিকিৎসা দিতে হবে, যাতে তাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আরও খারাপের দিকে না যায়। অপুষ্টির কারণ সঠিকভাবে খুজে বের করতে হবে এবং তার প্রতিকার করতে হবে

দুর্যোগের সময় যেসব স্বাস্থ্য কর্মী বা জনপ্রতিনিধি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সাহায্য করে, তাদের উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে মানুষকে সচেতন করে তোলা-

১) অপুষ্টির ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে মানুষকে জানানো এবং কেন চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টি দুর করা দরকার তা বোঝাতে হবে।
২) দুর্যোগগ্রস্তদের অপুষ্টির প্রাথমিক লক্ষণগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩) অপুষ্টির শিকার শিশুদের চিকিৎসার জন্য কোথায় নিয়ে যেতে হবে তা জানাতে হবে এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাবার উপরও গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৪) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য কিভাবে তৈরী করা যায় হাতে কলমে তা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে।

দুর্যোগের সময় দ্রুত ত্রানসামগ্রী বিতরণ, জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে অতিমাত্রার অপুষ্টির শিকার শিশুদেরকেও বাঁচানো সম্ভব। এসব শিশুদের মৃত্যুঝুঁকির প্রধান কারণ ভূল খাদ্যাভ্যাস এবং সংক্রামক রোগ/ ইনফেকশন যেমন পাতলা পায়খানা, আমাশয়, হাম, কানপাকা, যক্ষা এর যথাযথ চিকিৎসা না করা।

মূলনীতি ৯: দুর্যোগের চরম অবস্থায় খুব দ্রুত দুর্যোগ মোকাবেলার পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে শিশুদের পুষ্টিতে কোন ধরনের ব্যাঘাত না আসে শিশুদের অভিভাবকদের উপর ও লক্ষ্য রাখতে হবে

দুর্যোগ বা জরুরী অবস্থার শুরুর দিকে নবজাতক ও শিশুদের মৃত্যুঝুঁকি সবচেয়ে বেশী থাকে। শুরুতে সাহায্যকারী জনবল ও ত্রাণসামগ্রীর অভাব এই ঝুঁকিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এ সময় বুকের দুধ পান করানোর উপর খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে কোন শিশু (২ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব শিশু যারা মায়ের দুধ পান করে) তা থেকে বঞ্চিত না থাকে।

দুর্যোগে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার উপায়সমূহ–

১) শুরুতেই সেসব পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে যাদের ঘরে নবজাতক, ছোট শিশু, গর্ভবর্তী, প্রসূতি মা বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধি আছে
২) প্রথমে এসব পরিবারকে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও ত্রাণসামগ্রী দিতে হবে
৩) যেসব মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান তাদের জন্য আলাদা একটা স্থান বা কেন্দ্র তৈরী করে, সেখানে অভিজ্ঞ মহিলাদের দ্বারা বাচ্চাদের সঠিকভাবে দুধ পান করানোর প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিতে হবে
৪) যেসব পরিবারে মা নেই অথবা মা শিশুর যত্নে অপারগ, সেসব পরিবারে শিশুর খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং যেখানে দরকার সেখানে ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট দিতে হবে
৫) একটু বড় শিশুদের খাদ্য প্রস্তুতিতে সাহায্যের জন্য যত দ্রুত সম্ভব তাজা ও নিরাপদ খাদ্য উপাদান সরবহার করতে হবে
৬) শিশুদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করণে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নেউল্লিখিত কাজগুলো করতে হবে-
    - এলাকায় প্রচলিত ভাষায় সহজভাবে নবজাতক ও শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে দুর্যোগ আক্রান্তদের জানাতে হবে
    - সব স্বাস্থ্য কর্মী ও সাহায্যকর্মীদের বলতে হবে, সেসব মা ত্রানকেন্দ্রে শিশুসহ আসেনা তাদের শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে
    - জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধই শিশুকে দিতে হবে। যদি ৬ মাসের কম বয়সী কোন বাচ্চার মা মারা যায়, তাহলে অন্য মায়ের কাছ থেকে তাকে বুকের দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করতে হবে
    - ৬ মাসের পর থেকে দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার খাওয়ানোতে মায়েদের উৎসাহিত করতে হবে

মূলনীতি ১০: দুর্যোগে শিশুদের এবং কিশোরদের সঠিক মাত্রার পুষ্টি নিশ্চিত করতে হলে চলমান পরিবীক্ষণ বা Continuous monitoring প্রয়োজন

যে কোন দুর্যোগে শুরুতেই, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে দুর্যোগের মাত্রা/ভয়াবহতা এবং কত মানুষ আক্রান্ত তার একটা ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এর খসড়া তৈরী করে নেয়া উচিত। এতে পদক্ষেপগুলোর প্রণয়ণ সহজ হয় দুর্যোগে যত দ্রুতসম্ভব নিম্নের কাজগুলোর করা প্রয়োজন-

১) দুর্যোগ আক্রান্ত স্থানে যাওয়া
২) সেখানে গিয়ে কতদুর, কি ক্ষতি হয়েছে বুঝে দেখা
৩) পরিবারের বয়ঃজেষ্ঠ্যদের সাথে/ অভিভাবকদের সাথে কথাবলা
   -তারা কিভাবে নবজাতক ও শিশুদের খাওয়াচ্ছে সে ব্যাপারে জানা
   -শিশুদের সঠিক খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে কি কি করা প্রয়োজন তা তারা জানেন কিনা তা বোঝা
৪) শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা ঠিকমত মেটাতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে জানা

এসব জেনে নিয়ে যতদ্রুতসম্ভব, সাহায্যের ত্রাণসামগ্রী ও সেবাকর্মী নিয়ে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের পাশে দাড়ানো।

দুর্যোগে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সময়ের সাথে সাথে একে অন্যের সহায়তায় একসময় মানুষ তা কাটিয়ে ওঠে। অপুষ্টি, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসে। কিন্তু তার পরে নিয়মিত নিম্নের কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ–

১) পাঁচ বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের পুষ্টির কি অবস্থা তা জানা
২) গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মা দের পুষ্টির অবস্থা (Nutritional status) জানা
৩) যেসব শিশু মায়ের গর্ভে ৩৭ সপ্তাহ পূর্ণ করার পর জন্মেছে তাদের মধ্যে লো বার্থ ওয়েট (Low birth weight) এর প্রিভ্যালেন্স (Prevalence) জানা
৪) জন্মের পর থেকে প্রথম ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের এক্সক্লুসিভ এবং পারশিয়াল ব্রেস্ট ফিডিং এর প্রিভ্যালেন্স(Prevalence) জানা
৫) ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশূদের দুধের পাশাপাশি যে অন্যান্য খাবারের দেয়া হয় তার প্রস্তুতি ও খাওয়ানোর অভ্যাস সম্পর্কে জানা
৬) প্রতিটি পরিবারের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা জানা
৭) নবজাতক ও শিশুর মৃত্যুহার জানা

দুর্যোগকালীন সময়ে মাঠকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা/করণীয়:

- দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবার ও অপুষ্টি শিকার শিশুদের চিহিত করা, তালিকাভূক্ত করা, সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবগত করা, চিকিৎসা দেয়া এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ
- এসময়ে পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাবার সম্পর্কে আক্রান্ত পরিবারকে জানানো, তৈরির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান ও খাবার গ্রহণে উৎসাহী করা
- দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অপুষ্টিজনিত সংক্রামক রোগগুলো প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আক্রান্ত রোগী চিহিত করা ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য অবকাঠামোগুলোকে (যেমন-কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র) জরুরী স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহের উপযোগী করে তোলা

- সেবিকা, স্যাকমো,স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যানসহকারীওকমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারদের(CHCP) স্ব-স্বক্ষেত্রে দূর্যোগকালীনসময়ে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষাকরা

পাঠ-২১
অপুষ্টিজনিত রোগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

অপুষ্টিজনিত রোগ-স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভাল রাখার তথ্য ও উপায়সমূহকে ব্যক্তিগত পর্যায়, পারিবারিক পর্যায় এবং সামাজিক পর্যায়ে যথাসম্ভব মানুষের দোরগোড়ায় নূন্যতম খরচে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা। যে অবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ‘চোখে দেখলে মনে থাকে’।তাই স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপায় এবং কিভাবে অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত।

স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রত্যেক কর্মীর জন্য বক্তব্যের বিষয়

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ ডায়রিয়া বা পেটের অসুখ। এখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে পাঁটটি মূল বক্তব্য রয়েছে। এসব বক্তব্য রোগ জীবাণুর বিস্তার রোধে এবং রোগ ও মৃত্যু কমিয়ে আনতে বাড়ি ও এলাকার লোকজনকে সাহায্য করতে পারবে। উল্লেখ্য যে এসব বক্তব্য পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে এলাকার সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

যে সব এলাকায় পায়খানা ব্যবহার করা হয় না, খাবার ও অন্যান্য কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা হয় না, আবর্জনা ফেলা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার নিরাপদ ব্যবস্থা নেই সেখানে বাড়িতে জীবাণু বিস্তার রোধ করা খুবই মুশকিল।

রোগ কিভাবে ছড়ায় সে সম্পকে এলাকার সবার সঠিক ধারণা থাকতে হবে। তাই অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ এর ব্যাপারে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে গেলে ২টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

খ) সুষম খাবার খাওয়া অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডাল ভাতের সঙ্গে কিছু শাক-সবজি থাকতে হবে।

মূল বক্তব্য : পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

১। রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়- মল ত্যাগের পর ও খাবার আগে পানি ব্যবহার করে হাতে সাবান বা ছাই দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিলে।

২। ছোট-বড় সবাই নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করলে।

৩। খাবার ও সংসারের অন্যান্য কাজে নিয়মিত নিরাপদ পানি ব্যবহার করলে।

৪। খাবার সব সময় পরিচ্ছন্ন ও ঢেকে রাখলে।

৫। শিশুদের মল সাথে সাথে পায়খানায় ফেলে দিলে বা পুঁতে ফেললে এবং আবর্জনা নিয়মিত পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেললে।

মূল বক্তব্য: অপুষ্টিজনিত রোগ

আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে কিছু পরিমাণ টাটকা শাক-সবিজ জাতীয় খাবারও ছোট মাছ রাখলে অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সহায়ক তথ্য : পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

- মল ত্যাগের পর ও খাবার আগে পানি ব্যবহার করে হাতে সাবান বা ছাই দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
- সাবান অথবা ছাই ও পানি দিয়ে নিলে হাতের জীবানু দূর হয়। ফলে খাবারের মাধ্যমে জীবাণু যেতে পারে না। বাড়ীর সবার হাত ধোয়ার জন্য সাবান অথবা ছাই ও পানি সব সময় মজুদ রাখতে হবে।
- মল ত্যাগের পর, পানি ব্যবহার করে শিশুকে শৌচ করানোর পর এবং খাবার ছোয়ার আগে ভাল করে হাত সাবান বা ছাই দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- শিশুরা প্রায়ই মুখের ভিতর হাত দেয়। তাই মাঝে মাঝে, বিশেষ করে খাবার দেয়ার আগে শিশুর হাত ধোয়াতে হবে।
- দিনে অন্তত: একবার শিশুর মুখমন্ডল ধুয়ে দিতে হবে। ফলে মুখে ময়লা জমবে না এবং চোখের অসুখ হবে না।
- ছোট বড় সবাই নিয়মিত পায়খানা ব্যবহার করলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
- রোগ জীবাণু রোধের অন্যতম উপায় হলো মাটির নীচে নিরাপদে মল পুঁতে রাখা। মানুষের মলের সাথে মিশ্রিত রোগ জীবাণু থেকেই পাতলা পায়খানা ও অন্যান্য রোগ দেখা দেয়।

পানিতে, খাবারে, হাতে, থালা-বাসনে, হাড়ি-পাতিল বা যেখানে খাবার তৈরী করা হয় তাতে লেগে এসব জীবাণু সহজেই মানুষের পেটে যেতে পারে।

মল থেকে জীবাণু বিস্তার রোধ করতে হলেঃ

- পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- পায়খানা ব্যবহারে বদনা বা ঘটি হাত দিয়ে ধরার পর হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
- পায়খানা ব্যবহার একান্ত সম্ভব না হলে বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, পানি এবং বাচ্চাদের খেলার জায়গা থেকে সরে গিয়ে পায়খানা করতে হবে। মল পুঁতে ফেলতে হবে।
- সাধারণত: মনে করা হয় যে শিশুর মল কম ক্ষতিকর। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বড়দের মতই ছোটদের মলও ক্ষতিকর। কাজেই বাচ্চাদেরও পায়খানায় নিতে হবে। তা সম্ভব না হলে নির্দিষ্ট জায়গায় ছোট গর্ত করে সেখানে বাচ্চাদের পায়খানা করা শেখাতে হবে। মল সাথে সাথে ছাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মল তুলে নিয়ে পায়খানায় ফেলে দিতে অথবা পুঁতে ফেলতে হবে।
- পায়খানা নিয়মিত পরিস্কার করে ঢেকে রাখতে হবে।
- জীব জন্তুর মল ঘর-বাড়ীর এবং পানির উৎস থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাবার ও সংসারের অন্যান্য কাজে নিয়মিত নলকূপের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
- বাড়ির সব কাজেই নলকূপের পানি ব্যবহার করা উচিত। নলকূপের গোড়া ও চারপাশ পরিস্কার রাখতে হবে।
- বাসন-পত্র সব সময় নলকূপের পানি ব্যবহার করা উচিত। নলকূপের মুখে কখনই হাত বা মুখ লাগানো উচিত নয়। পানির উৎস থেকে পায়খানার দূরত্ব কমপক্ষে ৫০ ফুট হতে হবে।

খাবার ও সংসারের অন্যান্য কাজে নিয়মিত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

নলকূপের ব্যবস্থাপনা না থাকলে পানি বিশুদ্ধ রাখার উপায় জানতে হবে

- পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ফিটকিরি অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি ব্যবহার করা।
- পানির কুয়া ঢেকে রাখা। রান্না, পান, গোসল ও ধোয়ার কাজে ব্যবহারের পানি, মল ও নোংরা পানি বিশেষ করে পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসা পানি থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা।
- পানি আনা ও রাখার কাজে যে বালতি, দড়ি ও কলস ব্যবহার করা হয় সেসব পরিস্কার রাখা। যেমন- মাটিতে না রেখে বালতি ঝুলিয়ে রাখা।
- জীবজন্তু থেকে খাবার পানি সরিয়ে রাখা।

ঘরে খাবারপানি পরিস্কার রাখার উপায়

- পরিস্কার ঢাকনাওয়ালা পাত্রে খাবার পানি রাখা।
- পরিস্কার হাত বা কাপ দিয়ে অথবা পাত্র কাৎ করে পানি ঢেলে নেয়া।

- কাউকে পাত্রে হাত ডোবাতে বা সরাসরি পাত্র থেকে চুমুক দিয়ে পানি খেতে না দেয়া।
- ঘরে জীবজন্তু ঢুকতে না দেয়া।

খাবার নিরাপদ রাখার উপায়

- খাবার সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়
- খাবারের সাথে জীবাণু শরীরে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর মাংস প্রভৃতি ভালমত সিদ্ধ করে রান্না করা।
- খাবার যাতে নষ্ট হওয়ারর সময় না পায় সেজন্য রান্নার পরপরই খেয়ে নেয়া।
- পাঁচ ঘন্টার বেশী খাবার রাখতে হলে গরম অথবা ঠান্ডা অবস্থায় রাখা।
- রান্না করা খাবার খাওয়ার আগে ভালমত গরম করে নেয়া।
- হাঁস-মুরগীর কাঁচা মাংসে জীবাণু থাকে বলে তা রান্না করা মাংসের পাশে না রাখা। কাঁচা মাংস কাটার পর জায়গা পরিস্কার রাখা।
- খাবর তৈরীর জায়গা পরিস্কার রাখা।
- খাবার মাছি, ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী থেকে দূরে, পরিস্কার অবস্থায় ঢেকে রাখা।
- শিশুদের মল সাথে সাথে পায়খানায় ফেলে দেয়া বা পুঁতে ফেলা এবং ঘরের আবর্জনা নিয়মিত পুড়ে বা পুঁতে ফেলে রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মাছি রোগ জীবাণু ছড়ায়। শিশুর মলে মাছি বসে। ফেলে দেয়া খাবার, ফলমূল ও শাক-সবজির খোসা প্রভৃতি আবর্জনা মাছির বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। শিশুর মল সাথে সাথে পায়খানায় ফেলে দিতে বা পুতে ফেলতে হবে। ঘরের আবর্জনা দিনে দিনে পুতে বা পুড়ে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা গর্ত করে রাখতে হবে। (মনে রাখতে হবে, শিশুর মল বড়দের মতই ক্ষতিকর)।

অপুষ্টিজনিত রোগ

এ সম্পর্কে এই মডিউলের অন্যান্য পাঠে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সেখান থেকে একটি অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি স্বাস্থ্য শিক্ষার আলোচ্য বিষয় হিসাবে চেকলিষ্ট অনুযায়ী (চেকলিস্ট মডিউল অনুসারে) আলোচনা করা হলো-

খাদ্য সম্পর্কীয় ইতিহাস গ্রহণ প্রশ্নসমূহ

১। আপনি গতকাল সারা দিনে কি কি খেয়েছেন মনে করে বলতে পারবেন কি?

☐ ☐

হ্যাঁ না

২। সকালে কি খেয়েছেন?

রুটি ভাত অন্যান্য

৩। দুপুরে কি কি খেয়েছেন?

ভাত, রুটি, ডাল, আলু, শাক-সবজি, মরিচ/পেঁয়াজ, মাছ/মাংস/ডিম, দুধ, ফলমূল

৪। রান্নার সময় কি ভাতের মাড় ফেলে দেয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

না হলে কারণ বলুন ....

৫। শাক-সবজি রান্নার আগে কি বটি ধুয়ে তারপর কাটতে হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

না হলে কারণ বলুন ....

৬। শাক-সবজি রান্নার আগে কেটে তারপর ধুতে হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

না হলে কারণ বলুন ....

৭। শাক-সবজি রান্নার আগে কি বেশীক্ষণ ধরে সিদ্ধ করতে হয় না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

না হলে কারণ বলুন ....

৮। শাক-সবজি রান্নায় তৈল কি দিতে হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ হলে কারণ বলুন ....

না হলে কারণ বলুন ....

৯। শিশুদের জন্য খিঁচুড়ী রান্নার সময় তেল দিতে হয় কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ হলে কারণ বলুন ....

না হলে কারণ বলুন ....

পাঠ-২২
পুষ্টি বিষয়ক রেফারেল ও ফলো-আপ

রেফারেল:

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানে নিয়োজিত কমিউনিটি ও সেবা কেন্দ্রসমূহ থেকে চিকিৎসার জন্য উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী পাঠানোকে, রেফারেল বলা হয়। রেফারেল একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। প্রাথমিক

স্তরের যেসব সেবা কেন্দ্র পুষ্টি সেবা প্রদান করছে সেসব সেবা কেন্দ্র থেকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রোগী রেফার করা একটি নিয়মিত কার্যক্রম হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু সেবা প্রদানের জন্য এই রেফার করার কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্তকরণ:

অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে নিরাময় করার জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিকদের সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুদের সনাক্ত করতে হবে ও তাদের চিকিৎসার জন্য রেফার করতে হবে। শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি মনিটরিং ও প্রমোশনের (জিএমপি), মধ্যবাহুর পরিধি (মুয়াক) ও পায়ে পানি জমা (ইডিমা) পরিমাপ করার মাধ্যমে অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা হয়। নিম্ন লিখিত উপায়গুলোর মাধ্যমে শিশুদের সনাক্ত করা যেতে পারে:

- কমিউনিটি ক্লিনিকেনিয়মিত নিম্ন লিখিত সেবা প্রদানের সময়ে:
    - শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি মনিটরিং ও প্রমোশনের (জিএমপি) সেশনে
    - পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শনের সময়ে
- স্যাটেলাইট ক্লিনিকে বা ইপিআই সাইটে নিয়মিত টিকাদান ও ক্যাম্পেইন চালানোর সময়
- কমিউনিটি সভায় স্ক্রিনিং করার মাধ্যমে
- উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
- বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে

রেফারেল - এর ধাপসমূহ:

রোগী রেফার করার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। এই ধাপসমূহ আলোচনার আগে জানা দরকার যে কোন ধরণের রোগীদেরকে উচ্চতর স্তরে রেফার করা প্রয়োজন।

সাধারণত:দুইটি কারণে রোগী রেফার করা প্রয়োজন। সেগুলো হলো:

১. **সেবা কেন্দ্রের সেবাদানের পরিধি:** কোন গর্ভবতী ও প্রসবোত্তর মহিলা, নবজাতক, ২ বছর বয়সের শিশুরা এবংঅন্যান্য রোগী যদি জরুরী অবস্থায় বা রোগের এমন একটি পর্যায়ে সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত হন যে তা ঐ সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবাদানের পরিধির আওতার বাইরে তাহলে ঐ রোগীকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত কোন সেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

২. **সেবাদানকারীর অভাব এবং ওষুধপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির অপর্যাপ্ততা:** সেবা কেন্দ্রে আসা কোন রোগীর এমন একটি সেবার প্রয়োজন হতে পারে যা হয়তো ঐ সেবা কেন্দ্র থেকে দেয়া সম্ভব, কিন্তু শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত সেবাদানকারী না থাকা অথবা প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিংবা সরঞ্জামাদির অভাবে সেবাটি দেয়া সম্ভব হয় না, তাহলে ঐ রোগীকে চিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত কোন সেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

রেফারেল প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত ৪টি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপসমূহ হলো:

ধাপ ১	অপুষ্টির মাত্রা / জটিলতা ও প্রয়োজনীয় সেবা চিহ্নিতকরণ
ধাপ ২	সেবা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ধাপ ৩	সঠিক সেবাকেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও রেফার করা

ধাপ ৪	রেফার নিশ্চিত করা
প্রয়োজন অনুসারে ফলো-আপ	

মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাদানকারীগণ এই ধাপসমূহ অনুসরণ করে যথাযথভাবে রোগী রেফার করতে পারেন:

উপরোক্ত সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করার পরবর্তী ধাপ হলো রেফারেল কেন্দ্র নির্বাচন যা নিম্নের ফ্লো-চার্ট অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাদানকারীগণকোথায় রোগী পাঠাবেন বা রেফার করবেন তা এই চিত্রে দেখানো হলো ।

সরকারী সেবা কেন্দ্রে রেফার করার ফ্লো-চার্ট:

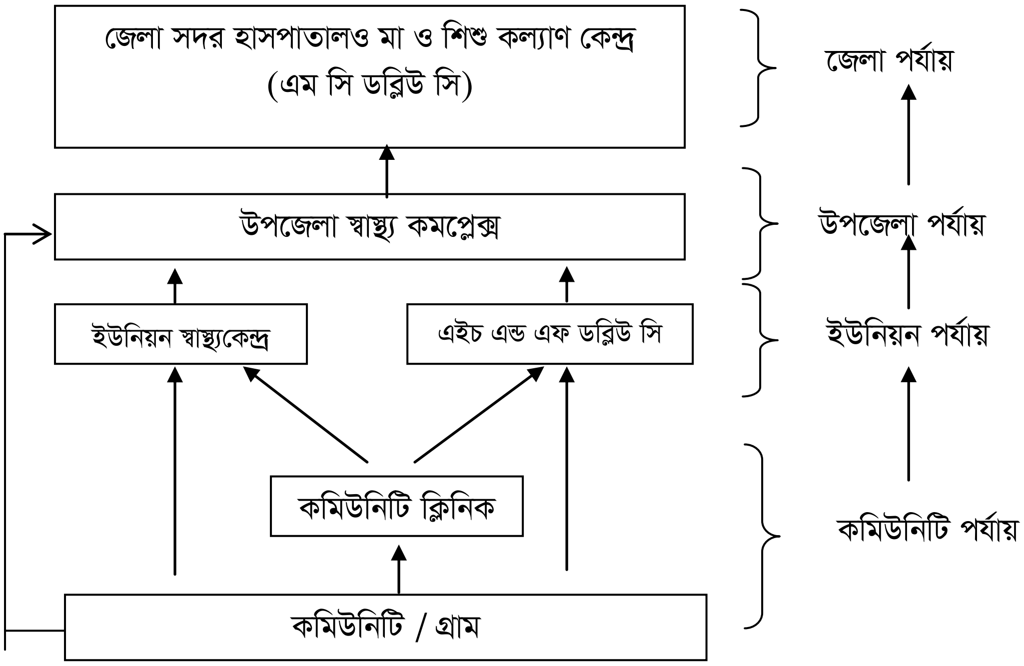

কমিউনিটি পর্যায়ে তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও অনুর্দ্ধ ৬ মাস বয়সী শিশুদের দুগ্ধদানকারী মহিলাদের(PLW) সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য রেফার করা:

টার্গেট গ্রুপ	প্রাপ্ত তথ্য	করনীয়
৬-৫৯ মাস	মধ্য বাহুর পরিধি (মুয়াক)< ১১.৫ সেন্টিমিটার (লাল)	চিকিৎসাপ্রদানকারী কমিউনিটি প্যারামেডিক : ➢ জটিলতা আছে কিনা, তা নির্ধারণ করবেন ▪ জটিলতা সহ তীব্র অপুষ্টি হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাবেন ▪ জটিলতানা থাকলে, খাবার ও ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানকরবেন
৬-৫৯ মাস	দুই পায়ের পাতায় পানি থাকলে (ইডিমা)	➢ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করবেন

৬-৫৯ মাস	মধ্য বাহুর পরিধি(মুয়াক) ১১. সেমি - < ১২.৫ সেন্টিমিটার (হলুদ)	**চিকিৎসা প্রদানকারী কমিউনিটি প্যারামেডিক :** ➢ মাঝারি মাত্রার অপুষ্টির শিশুকে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার ও ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা/ বা ঘরে তৈরি খাবার বিষয়ে ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করবেন
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলা	মধ্য বাহুর পরিধি(মুয়াক)< ২১.০ সেন্টিমিটার	**চিকিৎসা প্রদানকারী কমিউনিটি প্যারামেডিক :** ➢ গর্ভবতীর কোন জটিলতা থাকলে স্থানীয় সেবা কেন্দ্রে রেফার ➢ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার- ঘরে তৈরি খাবার বিষয়ে ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করবেন

রেফারেল কেন্দ্র নির্ধারিত করার পর সেবাদানকারীগণ একটি রেফারেল স্লিপে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রোগীর সাথে দিবেন। একই তথ্য সেবা কেন্দ্রে অবস্থিত রেফারেল বই-এ সংরক্ষিত হবে। রেফারেল স্লিপে লিখিত তথ্য সঠিক ও যথোপযুক্ত হওয়া রোগীর পরবর্তী চিকিৎসা, রেফারেল কেন্দ্র এবং যিনি রেফারেল করেছেন সবার জন্য প্রয়োজনীয়। নিম্নে একটি রেফারেল স্লিপের নমুনা দেয়া হলো:

কমিউনিটি প্যারামেডিকের কাছ থেকে স্থাণীয় সেবা কেন্দ্রেপাঠানোর রেফারাল স্লিপ:

শিশুদের জন্য রেফারাল স্লিপ: স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফারকরা
শিশুর নাম .... বয়স (মাস) .... লিঙ্গ (টিক চিহ্ন দিন) মেয়ে /পুরুষ গ্রামের নাম .... ইউনিয়ন .... শিশুর মা/পরিচর্যাকারীর নাম ....
তারিখ .... মধ্য বাহুর পরিধি(মুয়াক)<১১.৫ সে.মি (লাল) ☐ মধ্য বাহুর পরিধি(মুয়াক) ১১.৫ সে.মি–<১২.৫সে.মি (হলুদ) ☐ শিশু< ৬ মাস ☐

পায়ে পানি (ইডিমা) (টিক চিহ্ন দিন) হ্যাঁ না

যিনি রেফার করেছেন (নাম)..

কমিউনিটিপ্যারামেডিক কাছ থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর রেফারাল স্লিপ:
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলাদের রেফার করার স্লিপ :স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করা

মহিলার নাম .... বয়স (বছর)..........
গ্রামের নাম ....ইউনিয়ন ....
স্বামীর নাম ....

তারিখ ....
মধ্য বাহুর পরিধি(মুয়াক)<২১.০ সে.মি গর্ভকাল (মাস) ------------------ শিশুর বয়স (মাস) ---------------------
যিনি রেফার করেছেন (নাম)...

এই রেফারাল স্লিপ দুই কপি ব্যবহার করা হয় যাতে এক কপি শিশুর পরিচর্যাকারীকে দেয়া যায় ও অন্য কপি কমিউনিটি প্যারামেডিকের রেকর্ডে রাখা যায়।

ফলো-আপ:

অনেক সময়ই তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও অনুর্দ্ধ ৬ মাস বয়সী শিশুদের দুগ্ধদানকারী মহিলাদের (**PLW**) এবং অন্যান্য রোগীকে চিকিৎসা বা সেবা প্রদান করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আসতে বলা হয়। রোগীর অবস্থা অনুসরণের জন্য এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদানের এই প্রক্রিয়াকে **"ফলো-আপ"** বলা হয়ে থাকে। এই ফলো-আপ পুষ্টি সেবাপ্রদানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যথাযথ ফলো-আপ সম্ভব হলেই কেবল অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও অনুর্দ্ধ ৬ মাস বয়সী শিশুদের দুগ্ধদানকারী মহিলাদের (**PLW**) ওঅন্যান্য রোগীর পূর্ণ নিরাময় বা পূর্ণাঙ্গ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। তাই রেফারকৃত রোগীদের ফলো-আপ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই ফলো-আপ সম্ভব হলেই বোঝা যাবে যে, রোগীকে যে সেবার জন্য জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি সেই সেবা গ্রহণ করেছেন কিনা। এরূপ ফলো-আপের মাধ্যমে তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও অনুর্দ্ধ ৬ মাস বয়সী শিশুদের দুগ্ধদানকারী মহিলাদের(**PLW**) ওঅন্যান্য রোগীর সন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, রোগীকে সেবাকেন্দ্রের নিয়মিত সেবা গ্রহণকারী হিসাবে পাওয়া যেতে পারে এবং অপুষ্টি দূরকরা যেতে পারে । পরিপূর্ণ সেবা নিশ্চিত করা উন্নত সেবা প্রদানের অংশবিশেষ। মনে রাখতে হবে যে, নিয়মিত সেবা গ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঝড়ে পড়ার মাত্রা কমানো এবং সেবা গ্রহণ করা/ ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেবাদানকারী নিয়মিত পরবর্তী ফলো-আপ নিশ্চিত করার জন্য রোগী বা সেবাগ্রহিতার নাম ঠিকানা এবং প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বার সংরক্ষণ করবেন।

অনুপস্থিত শিশু বা যারা ঝরে পড়েছে তাদের সন্ধান করা এবং পরিচর্যাকারীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি প্যারামেডিকগণগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যেসব শিশুর ওজন বাড়ছে না বা যাদের ওজন হ্রাস পাচ্ছে তাদেরও বাড়িতে ফলোআপ করা প্রয়োজন রয়েছে। ফলোআপকে কার্যকর করার জন্য আউটরিচ সেন্টার, কমিউনিটি প্যারামেডিকও স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। কমিউনিটি প্যারামেডিকের স্থানীয় সেবা কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কাজগুলি করার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে:

- স্বাস্থ্যকর্মীকে আউটরিচ সেন্টারে সহায়তা করা
- যেসব শিশু অনুপস্থিত বা যারা ঝরে পড়েছে বা স্বাস্থ্যকর্মী যাদের ফলো-আপ করার অন্য কোনো কারণ নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের ফলো-আপ করা
- শিশুদের পরবর্তী অন্যান্য সেবা/অন্যান্য কর্মসূচিতে রেফার নিশ্চিত করা

বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন কালে কমিউনিটি প্যারামেডিকগণএকটি চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন ও একটি সাধারন বাড়ি পরিদর্শন ফরমপূরণ করবেন। ফরমটি একটি অনুলিপিসহ পূরণ করতে হবে, যার একটি কপি তীব্র ও মাঝারী অপুষ্ট শিশুর পরিচর্যাকারী সংরক্ষণ করবেন ও অন্যটি প্যারামেডিকেরকাছে থাকবে।

কখন কখন ফলো-আপ করবেন:

১. অপুষ্ট শিশু সনাক্তকরণ ও রেফারেলের পর
২. কর্মসুচিতে ভর্তি হয়ে /চিকিৎসা নেয়ার সময়
৩. চিকিৎসা শেষে বাড়ী ফিরে গেলে কমিউনিটি পযার্য়ে

রেফারেল ও ফলো-আপ সেবার সম্পর্ক:

গুণগতমান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণের দু'টো অন্যতম উপাদান হচ্ছে রেফারেল ও ফলো-আপ। একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমেই একটি সেবা কেন্দ্র থেকে অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও অনুর্দ্ধ ৬ মাস বয়সী শিশুদের দুগ্ধদানকারী মহিলাদের(**PLW**)এবং অন্যান্য রোগীর চাহিদা পূরণের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এভাবে প্রাথমিক স্তরের সেবা কেন্দ্রগুলো উচ্চতর স্তরের সেবা কেন্দ্র সমূহের জন্য সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার একই সাথে একটি যথাযথ ফলো-আপ ব্যবস্থা একটি রেফারেল পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। যথাযথ ফলো-আপের মাধ্যমে রোগীর প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব। এভাবে সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করা এবং অপুষ্টি দূর করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

- মাঠ পর্যায়ে সেবাদানকারীদের জন্য পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, হ্যান্ডআউট, জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৩

অধ্যায় ৩ ঃ আইএমসিআই

অধ্যায় ৪ ঃ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রতিবন্ধিতা

পাঠ-১
শিশু, শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও তার গুরুত্ব

শিশু

শিশু আমাদের অনেক আদরের। শিশু সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন জনের ধঅরণা। আমরা জানি, শিশু আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যত। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শূন্য থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল মানব সন্তানকেই শিশু বলে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকারও এই সনদে স্বাক্ষর করেছে এবং নীতিগতভাবে শিশুর এই বয়সটাকে (১৮ বছর) অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু এই সনদে এও বলা হয়েছে যদি কোন দেশ তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর এই বয়সসীমাকে পরিমার্জন করতে চায় তাহলে তা করতে পারে।

শিশুর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- শুধু শরীর নিয়েই একটা শিশু নয়
- তার মধ্যে রয়েছে সুপ্ত সম্ভাবনা, যা সঠিকভাবে বিকশিত হলে সমাজ ও দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- শিশুর সম্ভাবনার এই ভিত্তি জীবনের শুরুতেই রচিত হয়
- সেজন্য প্রারম্ভিক শৈশবকালটি শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ

শিশুর বৈশিষ্ট্য

- শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, কৌতুহলী, অনুসন্ধিৎসু ও আত্মকেন্দ্রিক হয়।
- শিশুরা অন্যের সঙ্গ চায়, বড়দের ভালোবাসা পেতে চায়, আদরনীয় হতে চায়, কথা ও কাজের নিজের জগৎ প্রকাশ করতে চায়।

- শিশুরা বেড়াতে পছন্দ করে ও ছোটাছুটি করতে চায়।
- শিশুরা নিজের মত করে পৃথিবী দেখে।
- শিশুদের শেখার আগ্রহ বেশী, তবে প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে এই আগ্রহ ভিন্ন
- শিশুরা বেশীক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- শিশু ভেদে বৈশিষ্ট্যসমূহের তারতম্য হতে পারে।

প্রারম্ভিক শৈশবকাল

শিশুর প্রথম জীবন বা প্রারম্ভিক শৈশবকাল বলতে গর্ভাবস্থা থেকে পাঁচ বছর বয়সকে বোঝায়। এই সময়ের মধ্যেই একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ভিত্তি তৈরী হয়। এ সময় সে যা শেখে এবং যে ভাবে শেখে তার উপর গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যত বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও সামাজিক আচরণ। সে কারণেই এ সময়কালটি শিশুর জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের এই সময়ের মধ্যেই শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

চিত্র ঃ প্রারম্ভিক শৈশবকাল

প্রারম্ভিক শৈশবকাল-এর ধারণা

- মানব জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভে।
- শিশু ভুমিষ্ট হয়ে বাড়তে থাকে শারীরিকভাবে এবং শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত দিকেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

- প্রারম্ভিক শৈশবকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়েই মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকামের ভিত্তি তৈরী হয়।
- গর্ভাবস্থা থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সময় কালকে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকাল (Early Childhood) বলা হয়।

পাঠ-২
শারীরিক বৃদ্ধির ধারণা

শারীরিক বৃদ্ধি

শরীরের বৃদ্ধি বলতে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ও আকারে বড় হওয়াকে বোঝায়।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

চিত্র ঃশিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য কর্মসূচী

বর্তমানে আমাদের দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি চালু রয়েছে-

কর্মসূচী	প্রয়োজনীয় সেবা	যে সময়ে দেয়া হয়
গর্ভকালীন যত্ন	বাড়তি খাবার, টিটি টিকা, নিরাপদ প্রসবের প্রস্তুতি, আয়রণ	মাকে গর্ভাবস্থায়

	বড়ি প্রদান, ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণগুলো চিহ্নিতকরণ	
প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী যত্ন	নিরাপদ প্রসব, জরুরী সেবা, প্রসব পরবর্তী চেকআপ	মায়ের প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী অবস্থায়
জন্ম নিবন্ধীকরণ	শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা	জন্মের পরপরই
শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো	শালদুধসহ শুধুমাত্রা বুকের দুধ খাওয়ানো	শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত
টিকা কর্মসূচী	৮টি প্রতিরোধযোগ্য রোগের জন্য	শিশুর দেড় মাস থেকে ১ বছর বয়সের মধ্যে
বাড়তি বা পরিপূরক খাবার খাওয়ানো	বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি বা পরিপূরক খাবার	শিশুর ৬ মাস বয়স পূর্ণ হবার পর
ভিটামিন এ	টিকা কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত	শিশুর ৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে হামের টিকার সাথে এবং জাতীয় টিকা দিবস পালনের সময়
চিকিৎসা সংক্রান্ত সেবা	যেমন: খাবার স্যালাইনের মাধ্যমে ডায়রিয়ার চিকিৎসা, সর্দি-কাশি এবং শ্বাস কষ্টের চিকিৎসা কর্মসূচী এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসা	অসুস্থকালীন সময়ে
আয়োডিন ঘাটতি জনিত রোগ প্রতিরোধ	আয়োডিনযুক্ত লবণ	মায়ের খাবার ও শিশুর ৭ মাস বয়স থেকে শিশুর বাড়তি খাবারের সাথে

এই কর্মসূচীগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলো মূলত: শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির চাহিদা পূরণ করছে। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য বড় ধরনের কোন কর্মসূচী আমাদের দেশে চালু নেই বললেই চলে। উপরোক্ত চালু কর্মসূচীগুলিকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে এই সেবা সম্পর্কিত ভিন্ন তথ্যাদি এবং সেবাগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। এর পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য নতুন কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।

পাঠ-৩
শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা

শরীর ও মন নিয়ে শিশুর সামগ্রিক গঠন। শরীরের হয় বৃদ্ধি আর মনের হয় বিকাশ। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি চাই মানসিক বা মনের বিকাশ।

মানসিক বিকাশ

মনের বা মানসিক বিকাশ বলতে শিশুর জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি আবেগ ও সামাজিক সম্পর্কের বিকাশকে বোঝায়। মানসিক বিকাশের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলো। এ সময়েই শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি শিশু ক্রমশ: তার বিভিন্ন অংগের ব্যবহার এবং ভাষা, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও ভাবের আদান প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করে।

মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রসমূহকে নিম্নলিখিত ৬ টি ভাগে ভাগে করা যায়

জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ: জন্মের পর থেকে শিশুর কোন কিছুর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া, বিভিন্ন জিনিস চেনা ও ব্যবহার বুঝতে পারা, বুঝতে চেষ্টা করা, ভাল-মন্দ বোঝা, মনে রাখা, চিন্তা করে কোনো কথা বলা বা কোনো সমস্যার সমাধান করা। এ সব করার ক্ষমতাই হল জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ।

শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ: জন্মের পর থেকে হাত-পা নাড়াতে পারা, ধীরে ধীরে বসতে, হাঁটতে, দৌড় দিতে পারা, কোনো কিছু ধরতে পারা, লাথি মারা ইত্যাদি হচ্ছে শিশুর শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ।

আবেগমূলক বিকাশ: খুশী হলে হাসা, ব্যথা পেলে কাঁদা, কোন কিছু চেয়ে না পেলে জেদ ধরা ইত্যাদি শিশুর আবেগের প্রকাশ। এভাবে ভলো লাগা, মন্দ লাগা, আবেগ-অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জনই হচ্ছে শিশুর আবেগমূলক বিকাশ।

সামাজিক বিকাশ: জন্মের পর থেকে বয়স অনুযায়ী শিশুর মা-বাবা, ভাই-বোনের পাশাপাশি অন্যদের সাথে মিশতে পারার ক্ষমতা এবং ধীরে ধীরে পরিবারের ও সমাজের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলতে পারার ক্ষমতাই সামাজিক বিকাশ।

আত্ম সচেতনতামূলক বিকাশ : জন্মের পর একটি শিশু পুরোপুরি অন্যের উপর নির্ভর করে বেড়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে সে কিছু কিছু কাজ নিজে করতে শেখে। যেমন- খাওয়া, জামা, জুতা পরা বা খোলা, নির্দিষ্ট স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করা ইত্যাদি। এছাড়াও এসময়েই আস্তে আস্তে তার পছন্দ-অপছন্দ, ভাল লাগা ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়।

নৈতিকতা বিকাশ: নৈতিক বিষয়গুলো বুঝতে পারা ও নিজের জীবনে প্রয়োগ করা, সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা, মানুষকে ভালবাসা।

পাঠ-৪

মানসিক বিকাশে মস্তিষ্কের ভূমিকা

মানসিক বিকাশ কিভাবে হয়

জীবনের প্রথম বছরগুলো হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এ সময়ে সে যা শেখে এবং যেভাবে শেখে তার ওপরই গড়ে ওঠে শিশুর ভবিষ্যত বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও সামাজিক আচরণ। মানসিক ও কর্মকান্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে মস্তিষ্ক। তাই মানসিক বিকাশ নির্ভর করে মস্তিস্কের বিকাশের উপর।

মস্তিষ্ক বিকাশের তথ্য

- মস্তিষ্কের কোষই হল কাজ করার মূল উপাদান।
- শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই তার মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোষের সংখ্যা সুষ্ঠভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য গর্ভবতী মায়ের সুষম খাবার, শারীরিক সুস্থতা, বিশ্রাম ও মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন।
- একটি শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার মস্তিষ্কে কোটি কোটি কোষ থাকে। জন্মের পর এই কোষের সংখ্যা আর বাড়ে না।
- মস্তিষ্কের কোষগুলোর কাজ করার অনেক সম্ভাবনা থাকলেও এরা এককভাবে কোন কাজ করতে পারে না, এজন্য প্রয়োজন এক কোষের সাথের অন্য কোষের সংযোগ।
- মস্তিষ্কের কোষের সংযোগের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই ঘটে। তবে জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যে এই সংযোগ সবচেয়ে বেশী মাত্রায় ঘটে।
- এই সংযোগের ওপরই নির্ভর করে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ। মস্কিষ্কের কোষগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটানোর জন্য মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।
- কোষের সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজন কোষকে উদ্দীপ্ত করা। আর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানো যেতে পারে, এমন পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশুর মস্কিষ্কের সব অংশের কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করা যায়। পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নের মাধ্যমেই শিশুর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে।

পাঠ-৫
মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নের গুরুত্ব

পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন

শিশুর যত্নকারী এবং শিশুর চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটানোর জন্য শিশুকে যে যত্ন দিতে হয়, তাকেই পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন বলা হয়। এই যত্নের মাধ্যমে শিশুকে গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এই পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন দিতে হবে-

- ❖ প্রতিদিন বারে বারে
- ❖ বয়স অনুযায়ী
- ❖ বিভিন্নভাবে যাতে শিশু তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ পায়।
- ❖ নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে এবং
- ❖ ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সমানভাবে

গর্ভকালে মাকে এবং জন্মের পরে বয়স অনুযায়ী শিশুদের যে যে ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন দেয়া যেতে পারে, তার একটি নমুনা তালিকা নীচে দেয়া হলো। এ ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নের যত্নের মাধ্যমে শিশুকে লালন-পালন করলেই তার পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব।

গর্ভকালে

১. মাকে পুষ্টিকর ও বাড়তি খাবার, আয়োডিনযুক্ত খাবার, আয়রণ ও ফলিক এসিড, টিটি টিকা দেয়া।
২. নিরাপদ প্রসব অথবা জরুরী প্রসূতি সেবার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
৩. মাকে হাসি খুশি ও চিন্তামুক্ত পরিবেশে রাখা, মাঝে মধ্যে বাড়ীর বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।
৪. মাকে ভারী কাজ করা থেকে বিরত রাখা।
৫. ছেলে বা মেয়ে যাই জন্ম নিক না কেনো, তাকেই সাদরে গ্রহণ করা হবে এই বলে মাকে আশ্বস্ত করা।

জন্ম থেকে ছয় মাস

১. বুকের দুধ খাওয়ানো বা শিশুর অন্যান্য পরিচর্যা করার সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা এবং তার মতো করে বিভিন্ন শব্দ করা।
২. শিশুকে মৃদু স্বরে গুনগুন করে গান/ছড়া কবিতা শোনানো।
৩. দিনের কিছু কিছু সময় শিশুকে মৃদু শব্দে উদ্দীপ্ত করা। যেমনঃ মায়ের চুড়ির আওয়াজ, মৃদু আওয়াজের ঝুনঝুনি, আঙ্গুলের তুড়ি।
৪. শিশুর সাথে মুখ ঢেকে “টুকি” বা লুকোচুরি খেলা করা।
৫. শিশুর হাত পা নেড়ে হালকা ব্যায়াম করানোর সময় তার সাথে আনন্দসূচক শব্দ করে কথা বলা।
৬. ঝুলন্ত কোনো খেলনা শিশুরা নাগালের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়া যাতে সে ধরতে পারে অথবা পা দিয়ে লাথি দিতে পারে।

সাত মাস থেকে দেড় বছর

১. শিশুকে আশে-পাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানানোর জন্য পরিচিত জিনিসগুলোর নাম বলা এবং তা দেখাতে বলা।
২. শিশুকে হাত পা ব্যবহার করে খেলতে দেয়া এবং তার সাথে খেলা।
৩. শিশুকে ছোট ছোট প্রশ্ন করা এবং প্রয়োজনে জবাব দেয়া।
৪. খাবারের সময় শিশুটিকে পরিবারের সবার সাথে নিয়ে খেতে বসা ও আনুসাংগিক কথা বলা।
৫. শিশুকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নামগুলো বারে বারে বলা ও বলতে উৎসাহিত করা।
৬. শিশু কোন কিছু দেখে ভয় পেলে তার ভয় ভাঙ্গিয়ে দেয়া।
৭. শিশুকে দাঁত মাজা, হাত ধোয়া, নিজে নিজে পোষাক পরা ইত্যাদিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে সাহায্য করা।
৮. শিশুকে হাঁটতে সাহায্য করা এবং কিছু ধরে হাঁটতে বা দাঁড়াতে সাহায্য করা।
৯. শিশুকে ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করতে দেয়া যেমনঃ ছোট বাধা পেরিয়ে খেলনা উদ্ধার করা বা মায়ের কাছে যাওয়া।

দেড় বছর থেকে ৩ বছর

১. শিশুকে অন্য শিশুর সাথে খেলার সুযোগ করে দেয়া এবং নিজেও শিশুর সাতে খেলায় অংশ নেয়া।
২. নিরাপদ পরিবেশে কিছু বেয়ে উঠতে সাহায্য করা বা ছুটাছুটি করতে উৎসাহিত করা।
৩. ছবির বই নাড়াচাড়া করতে দেয়া এবং কাগজে বা মাটিতে আঁকাআঁকি করতে দেয়।
৪. দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু, যেমন- বল, হাতের চুড়ি, ফল, বই এসব ব্যবহার করে বিভিন্ন রং ও আকৃতি শেখানো।
৫. শিশু ভুল উচ্চারণ করলে বা শব্দ বললে তাকে সঠিক উচ্চারণ বা শব্দটি বলে দেয়া।
৬. শিশুকে গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ শেখানো।
৭. শিশুকে পরিবারের ছোট ছোট কাজ করতে উৎসাহিত করা এবং প্রশংসা করা।
৮. শিশুকে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা।
৯. শিশুকে প্রস্রাব পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করতে শেখানো।
১০. শিশুকে যত্নকারীর তত্ত্বাবধানে নিজের হাতে খেতে দেয়।

৩ থেকে ৫ বছর

১. শিশুর পছন্দের গান, ছড়া, কবিতা তার কাছে শুনতে চাওয়া বা গেয়ে শোনানো।
২. কথা বলা, গান গাওয়া, বই পড়া ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর ভাষা শেখাকে উৎসাহিত করা।
৩. কোনো কিছু পছন্দ করা অথবা দায়িত্ব নেবার জন্য সুযোগ করে দেয়া।

৪. শিশুর নিজেকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া (যেমনঃ ছবি আঁকা, কাগজ, মাটি, পুরানো কাপড় দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা)।

৫. শিশুকে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করা, সাহায্য করা অথবা কোন কিছু ভাগ করে নেয়া ইত্যাদি শেখার সুযোগ করে দেয়া।

৬. শিশুকে নিজে দাঁত মাজা, হাত ধোয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কাপড় পরতে ও খুলতে, বোতাম লাগাতে ও খুলতে উৎসাহিত করা।

৭. শিশুকে বড়দের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয় (যেমনঃ সালাম বা আদাব দেয়া, মেহমান এলে বসতে বলা) তা শেখানো এবং পালন করতে উৎসাহিত করা।

৮. শিশুকে ঘরের বাইরের অন্য শিশুর সাথে খেলার সুযোগ করে দেয়া।

পাঠ-৬
শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

আমাদের দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম চালু রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে বিদ্যমান কর্মসূচীগুলো মূলতঃ শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার চাহিদাই মেটাচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের শিশুকে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের সবগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেভাবে দেখতে চাই, সে অনুযায়ী সব ধরনের কর্মসূচী আমাদের নেই ফলে শিশুরা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না। এই লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মসূচীগুলোকে আরো ফলপ্রসূ করে জনগণের কাছে পৌতে দিতে হবে এবং মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় সহায়তার লক্ষ্যে শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন নেবার জন্য পরিবার ও সমাজের প্রত্যেককেই গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন:

ক. নিজ নিজ পরিবারে

- ❖ গর্ভবতী মায়ের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণ সুষম খাবার ও পরিমিত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মা যেন সব সময় হাসি খুশী ও চিন্তা মুক্ত থাকেন, সেদিকে পরিবারের সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে।
- ❖ শিশুকে প্রতিদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান, ছড়া, গল্প শোনানো যেতে পারে। তার সাথে বিভিন্ন ধরনের আনন্দদায়ক খেলা করা যেতে পারে অথবা নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- ❖ দৈনন্দিন ছোট-খাট কাজে শিশুকে অংশগ্রহণে উৎসাহী করা যেতে পারে।
- ❖ পরিবারের বাইরের লোকদের সাথে এবং অন্য শিশুদের সাথে মেশার সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে।

খ. অন্যান্য ক্ষেত্রে

- ❖ প্রত্যেকে যেন অন্তত: একজন বাবা, মা অথবা শিশুর আপন জনকে শিশুর প্রথম জীবনের বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে জানাতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে উৎসাহী করা যেতে পারে।
- ❖ শিশুর সেবা যত্ন ও লালন পালন উভয় কাজে পরিবারের পুরুষদের ও অন্যান্যদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেয়া ও সমর্থন করা যেতে পারে।
- ❖ কর্মজীবি বাবা-মায়ের শিশুদের জন্যে কর্মক্ষেত্রে শিশুদের খেলাধুলা ও যত্নের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- ❖ নিজের এলাকায় শিশুদের খেলাধুলার জন্যে একটি বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ❖ বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলাধুলার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পরামর্শ, সহায়তা ও উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।
- ❖ শিশুর প্রথম জীবনের বিকাশ বা প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ও প্রসারে সহায়তা করা যেতে পারে।

পাঠ-৭
শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে শরীর, মন ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক

শিশুর পরিবেশ

শিশু কোন একক সত্তা নয়। সে একটি পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুর সঠিক শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য তার পরিবেশ হতে হবে নিরাপদ ও সহায়ক।

শরীর, মন ও পরিবেশের সম্পর্ক

শিশুর চারপাশে যারা থাকেন এবং শিশুর যত্ন নেন, তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে শিশুর সামাজিক পরিবেশ। যেমনঃ বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। এমনকি বাড়ীর গৃহ-পরিচারক/গৃহ-পরিচারিকারাও শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

এছাড়াও রয়েছে বস্তুগত পরিবেশ যেমনঃ শিশুর বিছানা-পাত্র, ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, খেলনা, দোলনা, গাছ-পালা ইত্যাদি। চারপাশের এই বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশের সাথে শিশুর প্রতিনিয়তই পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটছে এবং এই পারস্পরিক ক্রিয়াই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে প্রভাব ফেলে এবং শিশুটি বেড়ে ওঠে।

শিশুর চারপাশের এই সামাজিক ও বস্তুগত পরিবেশ যাতে শিশুর জন্যে নিরাপদ ও সহায়ক হয় এবং একই সাথে শিশুকে যাতে ক্ষতিকর পরিবেশ ও বিপদজনক বিষয়গুলো থেকে দূরে রাখা যায়, আমাদের সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

পাঠ-৮
শিশুর জন্য নিরাপদ ও সহায়ক এবং ক্ষতিকারক পরিবেশ ও বিপদজনক বিষয়

নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ

আমরা চাই শিশুরা কৌতূহলী হোক এবং বিভিন্ন বিষয় কিভাবে ঘটছে তা লিখতে বা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করুক। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বা মানসিক বিকাশ ঘটতে সহায়তা করা। যেমন:

- গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সঠিক যত্ন নেয়া।
- গর্ভবতী মাকে ভারী কাজ থেকে বিরত রাখা ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখা
- নিরাপদ প্রসব ও জরুরী প্রসূতি সেবার জন্য পূর্বপুস্তুতি রাখা
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে সাহায্য করা
- শিশুর জন্মের পর পরই শাল দুধ, ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ ও পরবর্তীতে পরিপূরক খাবার দেয়া
- সময়মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা গ্রহণ শিশুকে, যেমন: ১০ টি রোগের টিকা দেয়া
- অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- পরিবারের সবার মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা
- শিশুর মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া

- শিশুর প্রতি পরিবারের সবার খেয়াল রাখা
- অন্য শিশুদের সাথে মিশতে বা খেলতে দেয়া
- নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা
- শিশুর জন্যে পর্যাপ্ত খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা
- শিশুর বয়স উপযোগী শেখার পরিবেশ সৃষ্টি করা
- শিশুর সৃজনশীল কর্মকান্ডের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং
- ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই একই রকম যত্ন নেয়া ও আচরণ করা

ক্ষতিকর পরিবেশ ও বিপদজনক বিষয়

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য নিরাপদ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার পাশাপাশি ক্ষতিকর পরিবেশ ও বিপদজনক বিভিন্ন কারণে যাতে শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটাও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। যেমনঃ

- অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণ
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মায়ের প্রসব
- গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন অসুস্থতায় হাতুড়ে ডাক্তার/কবিরাজ/ওঝার কাছে ঝাড়ফুঁক/চিকিৎসা
- মেয়ে সন্তান প্রসবের জন্য মাকে দায়ী করা
- শিশুকে সম্পূর্ণভাবে গৃহ-পরিচারক/পরিচারিকার ওপর নির্ভরশীল রাখা
- অন্য শিশুদের সাথে মিশতে বা খেলতে না দেয়া
- শিশুর উপস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের মাঝে মনোমালিন্য বা ঝগড়া করা
- শিশুর বয়স উপযোগী কাজের বাইরে অতিরিক্ত কিছু করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা
- শিশুকে বিদ্রুপ করা, ভর্ৎসনা করা, মারধোর করা
- শিশুর ভালো কাজের প্রশংসা না করা
- শিশুকে অহেতুক ভয় দেখানো
- শিশুর সামনে মিথ্যা কথা বলা, অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করা ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়া
- শিশুকে বিপদজনক দ্রব্যাদি, যেমনঃ ঔষধ, দা, বটি, চুলা, দাহ্যপদার্থ যেমনঃ কেরোসিন, পেট্রোল ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ যেমনঃ ডোবা, খাল পুকুর ইত্যাদি থেকে সাবধানে রাখা।

পাঠ-৯
শিশুর শেখার প্রক্রিয়া

শেখার প্রক্রিয়া

জন্মের পর থেকে শিশু দ্রুত শিখতে থাকে। যখন একটি শিশু উন্নত পুষ্টি ও যথাযথ স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি আদর, মনোযোগ এবং উদ্দীপনা পায় তখন সে আরও দ্রুত শেখে। এই ব্যাপারে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং অনেক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পর্শ, শোনা, ঘ্রাণ, দেখা এবং স্বাদ এসব শেখার উপকরণ দিয়েই একটি শিশু তার চারপাশের পৃথিবীকে আবিষ্কার করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে শিশুরা যেসব উপায়ে শেখে সেগুলি হল:

- খেলার মাধ্যমে
- দেখে
- শুনে
- ধরে
- অনুমান করে
- ঠেকে গিয়ে
- ঝুঁকি নিয়ে
- ভুল করে
- শ্রেণী বিন্যাস করে
- প্রশ্ন করে
- বার বার চেষ্টা করে
- ছবির মাধ্যমে
- নির্দেশনা থেকে
- অন্যের সঙ্গে মেশার মাধ্যমে
- অনুকরণ করে (বড়দের ও অন্য শিশুদের অনুকরণ করে)
- কাজ করে
- স্বাদ নিয়ে

- কল্পনা করে
- তুলনা করে
- আনন্দের মাধ্যমে
- সক্রিয় অংশগ্রহণ করে
- নাড়া-চড়া করার মাধ্যমে
- গল্পের সাথে সমন্বয় করে
- অনুসন্ধান করে

পাঠ-১০
শিশু বিকাশের জন্য খেলার গুরুত্ব

শিশুর বিকাশের জন্য খেলার গুরুত্ব

একটি ছোট শিশুর প্রধান কাজই হচ্ছে খেলাধুলা করা। শিশুরা যখন খেলাধুলা করে তখন তাদের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশ ঘটে। তারা বিভিন্ন ধারণাও লাভ করে। সমস্যার সমাধান করতে ও সহযোগিতা প্রদান করতে শেখে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা ও সৃজনশীলতার চর্চা করে। এসব কিছুই তাদের শিখনের জন্য প্রয়োজন। শব্দ, অক্ষর ও সংখ্যা মুখস্থ করার চেয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে শেখা শিশুদের জন্য অধিক উপযোগী। আসলে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের মস্তিষ্ক পুঁথিগত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে না। এ সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করলে তা শিশুদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশী। শিশুদের শেখার স্বাভাবিক আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবেগগত দিক থেকে তাদের ক্ষতিও করতে পারে। এ বয়সে শিশুরা খেলার মাধ্যমেই সব চেয়ে ভাল শেখে। শিশুদের খেলার জন্য স্থানটি কি ধরনের হতে হবে তার ধারণা নীচে দেওয়া হলো।

ঘরের ভেতরে খেলার স্থান ও খেলনা

বাসায়, কর্মস্থলে/ ফ্যাক্টরীতে, ক্লিনিকে, হাসপাতালে রোগী বসার জায়গায় অথবা বিদ্যালয়ের ভেতরে শিশুর জন্য একটি খেলাধুলার স্থান তৈরী করা যেতে। শিশুরা খেলনা ও বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তারা কোন কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে, তুলতে, দুভাগ করতে, ছুড়ে মারতে, কেড়ে নিতে, চুষতে, লাথি মারতে, কোন জিনিস জোরে ফেলে দিতে ও ভেঙ্গে দিতে ও ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে বা করতে উৎসাহ বোধ করে। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার মাধ্যমে শিশু তার হাত, পা, মুখ নাড়াতে, ঘোরাতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

শিশুদের সামনে যে কোন বস্তু ও খেলনা দেবার আগে সেটা শিশুর জন্য নিরাপদ কি না দেখে দিতে হবে। শিশু যত্নকারীদের নবজাতক ও হাঁটতে শিখেছে এমন শিশুদেরকে যে কোন জিনিস দেয়ার সময় একটু চিন্তা করে নিতে হবে যে জিনিসগুলো তাকে দেয়া যায় কি না। জিনিসগুলো বেশী ছোট হলে শিশু তা গিলে ফেলতে পারে। এ ছাড়াও যে জিনিসগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে, ধারালো ও ধাতব পদার্থের তৈরী সেগুলো শিশুর নাগালের বাইরে

রাখতে হবে। শিশুরা যখন বল ছুড়ে মারে বা খেলা শুরু করে তখন তাদের কাছে কারও থাকা উচিত কারণ তারা ঠিকমতো দৌড়াতে পারে না ফলে বল ছুঁড়ে তা রাস্তা থেকে নিয়ে আসতে গিয়ে সাইকেল, স্কুটার বা গাড়ীর সাথে ধাক্কা খেতে পারে। প্লাষ্টিকের ব্যাগ, লম্বা রশি ইত্যাদিও শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হয় নবজাতক ও শিশুর কাছে সবসময় একজন যত্নকারী থাকা। সাধারণতঃ অনেকেই শিশুদের বাড়ীতে তৈরী খেলনা দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত যে নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে সে বিষয়গুলো অনুসরণ করে খেলনা তৈরী করতে বলতে হবে। শিশুদের খেলনার তালিকার মধ্যে ০-৩ বছরের শিশুর জন্য যে ধরনের খেলনা সামগ্রী সহজেই বেশীর ভাগ মানুষ তৈরী করতে বা কিনতে পারে তেমন খেলনা রাখতে হবে। কিন্তু এই খেলনা দেয়ার আগে এগুলো শিশুর জন্য কতটা নিরাপদ তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

- ❖ নবজাতক শিশুর মাথার উপরে রঙ্গিন বা উজ্জ্বল রংয়ের কোন খেলনা বা ঝুনঝুনি শক্ত করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া যেতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেগুলো যেন এতো কাছে না থাকে যে শিশুরা সেগুলো টেনে নামিয়ে ফেলতে পারে।
- ❖ শিশুর এক মাস বয়স থেকে শিশুর কাছে এমন বস্তু রাখা উচিত যা নাড়ালে শব্দ হয়।
- ❖ শিশুর তিন মাস বয়সের সময় থেকে তৈরী বাদ্যযন্ত্র এবং শব্দ করে এমন জিনিস শিশুকে দেয়া যেতে পারে, যেমনঃ এক খন্ড বাঁশ এর ভেতরে কয়েক টুকরো ছোট পাথর পুরে দুই মুখ ভাল করে এটে দিয়ে ঝুনঝুনি তৈরী করা যায়। টিন অথবা ছোট একটি প্লাষি।টকের পাত্রে চাল, ইটের টুকরো বা বীজ ভরে এবং তার মুখ ভালভাবে এটে দিয়েও ঘর্ষণের শব্দের খেলনা বানানো যেতে পারে। জোরে আঘাত করে শব্দ করার জন্য নারিকেলের খোল ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা ঘরে তৈরী ঢোলও বানানো যেতে পারে।
- ❖ শিশুর তিন মাস বয়সের সময় থেকে তাকে শক্ত, নরম স্পঞ্জের তৈরী অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বস্তুর সাথে স্পর্শের মাধ্যমে পরিচিত করানো উচিত।
- ❖ শিশুর তিন মাস বয়সের সময় নরম প্লাষ্টিকের বল, কাপড়ের বা দড়ির বল শিশুর সামনে ঝুলিয়ে দেয়া যেতে পারে। যাতে সে এগুলোতে পা দিয়ে লাথি মারতে পারে।
- ❖ ৬ মাস পর্যন্ত শিশুদের সাথে বলা, বিভিন্ন শব্দ করা, গান/ছড়া/কবিতা শোনানো, ঝুনঝুনির শব্দ করতে হবে, যা তার মস্তিস্কের কোষ উদ্দীপ্ত করে, তার গঠনে সাহায্য করে।
- ❖ ৬ মাস বয়স থেকে শিশুকে প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় এমন বস্তুর অনুভূতির সাথে পরিচিত করানো উচিত, যেমনঃ চামচ, ব্রাশ, প্লাষ্টিকের কাপ, ছোট পাত্র, গরম-ঠান্ডা ইত্যাদি। এক বছর বয়সের সময় শিশুকে কাপড়, বাক্স, পানি, মাটি, প্লাষ্টিকের বাক্স, আর্ট ম্যাট এগুলোর সাথে পরিচিত করানো উচিত। পাশাপাশি তার সাথে খেলা করা এবং প্রশ্ন করা উত্তর দেয়া উচিত।
- ❖ এক বছর বয়স থেকে শিশুকে কাপ, কাপের ঢাকনা, বাক্স, বাক্সের ঢাকনা, বিভিন্ন মাপের গামলা, বিভিন্ন ধরনের পাত্রের সাথে পরিচিত করানো উচিত।

- ❖ দুই বছর বয়স থেকে শিশুকে বিভিন্ন মাপের বাক্স, নারকেল ও তার খোসা, পেপারের ব্যাগ বিভিন্ন ধরনের পাতা, বড় পাথর, বড় লাঠি ইত্যাদির সাথে পরিচিত করানোর পাশাপাশি কিভাবে দরজা, জানালা বা অন্যকোন কিছু ঘুরাতে হয়, বন্ধ করতে হয়, কিভাবে কোন কিছু অনুভব করা যায়, হামাগুড়ি দিয়ে চারিদিকে কিভাবে ঘুরতে হয় এসব বিষয়ে শেখানো উচিত।
- ❖ দুই-তিন বছর বয়স থেকে শিশুকে পুরানো কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরী, রান্নার বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে খেলার জন্য মাটি দিয়ে ছোট ছোট গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরী করে দেয়া যেতে পারে।
- ❖ শিশুকে নাম বলা, সংখ্যা গোনাতে উৎসাহিত করতে হবে। ছড়া, গান, কবিতা বলতে/শুনতে চাইতে হবে।
- ❖ তিন বছর বয়সের সময় শিশুকে পুরানো গাড়ীর টায়ার, তালা, বাঁশের দোলনা, সাধারণ খেলার সরঞ্জাম দিয়ে খেলতে দেয়া উচিত।
- ❖ শিশু যখন কোন খেলা খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করবে তখন বড় শিশুরা তাকে বাড়ীতে তৈরী পুতুল, পাটের বল দিয়ে অন্যদের সাথে মিলে মিশে যাতে খেলে সে ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।
- ❖ ঘরের কোনো দেয়ালের একটি অংশে কালো ও সাদা বিভিন্ন নকশা ও জিনিস ও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ❖ দেয়ালের অংশবিশেষ এবং ঘরের মেঝে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির উপকরণ দিয়ে ঢেকে রাখা যাতে শিশুরা তাদের হাত ও শরীর দিয়ে স্পর্শ করে সেগুলো অনুভব করতে পারে। বালিশ, পাট ও সিল্কের উপকরণ ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ❖ শিশুর খেলার জায়গাটিতে একটি বড় আয়না রাখা যেতে পারে। শিশুরা আয়নার নিজেদের চেহানার দেখতে খুব পছন্দ করে। এ কাজের জন্য টিনের প্লেট বা চকচকে অন্য কিছুও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘরের বাইরে খেলার আঙ্গিনা

খেলাধুলার স্থানটি হতে হবে শিশুদের জন্য নিরাপদ। তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কোন বয়স্ক ব্যক্তি বা কিশোর-কিশোরীর ওপর ন্যস্ত করতে হবে। স্থানটিতে যাতে কাঁচ, টিনের কৌটা বা লোহার পাতের মত কোনো ধারালো জিনিস না থাকে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ঘরের বাইরে খেলাধুলার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাড়ীর বাইরে ছোট একটা জায়গা কিংবা কাছাকাছি কোন গাছের ছায়াঘেরা জায়গাও হতে পারে শিশুদের 'খেলাধুলার স্থান'। তবে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় থাকতে হবে। যেমন, শিশুদের দৌড়-লাফের জন্য জায়গা, ছায়া, গাছের চড়া এবং অনুভূতি লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার গাছ এবং পানি, বালি অথবা কাদা নিয়ে খেলার জায়গা। এসব কর্মকান্ড ২ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য অধিক উপযোগী। তবে দুই বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য নতুন অনেক কিছু যোগ করা যেতে পারে। দুই বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নতুন নতুন অনেক কিছু দেখা, অনুভব করা এবং শোনা। তাদের জন্য পুরো পৃথিবীটাই একটা খেলার জায়গা।

এখানে কয়েকটি কর্মকান্ড এবং একটি খেলাধুলার স্থানের কিছু উপাদান সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সহজে পাওয়া যায় এমন সব উপকরণ ব্যবহার করে যাতে সহজ জিনিস তৈরী করা যায়, সে জন্য নিচের ধারণা ও ব্যাখ্যাগুলো নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

❖ গড়ানো, ছোঁড়া এবং ধরার জন্য কয়েকটি বল। যে বলের ওপর পেট রেখে শিশুরা শুয়ে পড়তে এবং ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে গড়াতে পারে এমন বড় আকৃতির বলও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা শিশুদের ভারসাম্য রক্ষা করা শিখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এরকম বল নিয়ে খেলা মাত্র কয়েক মাসের শিশুকেও তার মাথা তুলতে উৎসাহিত করে। ফলে শিশুর পিঠ ও ঘাড়ের মাংসপেশী শক্তিশালী হয়।

❖ একটি বড় গাছের শাখা অথবা দুটি গাছ ব্যবহার করে দোলনা ঝুলানো যেতে পারে। গাড়ীর পুরানো টায়ার অথবা শাড়ী দিয়েও শিশুদের জন্য দোলনা বানানো যায়।

❖ বড় বড় পুরোনো কয়েকটি টায়ার শিশুদের বসা, চড়া ও লাফানো অথবা গড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

❖ ইট অথবা বড় বড় পাথরের সারি বানাতে এবং শিশুদেরকে 'ব্যালেন্স বীম' এর ওপর দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করা যেতে পারে।

❖ খেলাধুলার স্থানে কয়েকটি গাছ থাকলে শিশুদেরকে এসব গাছ অনুভব করতে, জড়িয়ে ধরতে, গাছের পাতা পরীক্ষা করতে ও গাছের নিচে সবতে এবং বড় শিশু হলে তাদেরকে গাছে চড়তে সাহায্য করা যেতে পারে।

❖ পানি, বালি, কাদা নিয়ে খেলার জন্য সীমানাসহ একটি জায়গা ঠিক করা যেতে পারে। শিশুদেরকে কয়েকটি প্লাষ্টিকের কাপ ও মাথার দিক কাটা কয়েকটি প্লাষ্টিকের কাপ ও মাথার দিক কাটা কয়েকটা প্লাষ্টিকের বোতল দিয়েপানি ভরতে অথবা কোনো কিছু তৈরী করতে দেয়া যেতে পারে।

❖ লাফিয়ে পার হওয়া, দড়ি লাফ, দড়ি টানা এবং গিরা বাঁধা শেখার জন্য দড়ি দিয়ে খেলার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

❖ শিশুদের সংগে 'লুকোচুরি' খেলা। ছোট ছোট শিশুরা শুয়ে অথবা বসে যখন বড়দের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন কোন গাছ অথবা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে তাদের সংগে উকি দিয়ে সরে যাওয়ার লুকোচুরি খেলা যেতে পারে।

❖ একটি নিরিবিলি স্থান নির্বাচন করা যেখানে শিশুরা ও শিশুর যত্নকারী মাটির ওপর বসতে পারে। এখানে ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে শিশুদের চারিদিকের সব জিনিস লক্ষ্য করতে বলা যেতে পারে- যেমন: বাসাতে গাছের পাতা কেমন করে নড়ে, পাখিদের কিচির মিচির ইত্যাদি।

❖ একটি কাল্পনিক মেরী-গো তৈরী করা। বড় শিশুরা একটি ছোট শিশুকে তার পিঠের ওপর নিয়ে প্রত্যেক একটি বৃত্তের চারিদিকে নাগর দোলার মত ঘুরে, ওপরে উঠে ও নীচে নেমে খেলতে পারে।

- ❖ শরীর ও কণ্ঠস্বর ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন জীব জন্তুর অভিনয় করে শিশুদের সঙ্গে খেলা করা যেতে পারে। বিভিন্ন যানবাহনের মতো প্রত্যেকে হতে পারে মটর গাড়ী, ট্রেন, ট্রাক্টর, রিক্সা অথবা নৌকা। অথবা একই যানবাহনের বিভিন্ন অংশ হতে শিশুদেরকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। যেমনঃ চার জন গাড়ীর চাকা হবে, একজন ড্রাইভার হবে, একজন যাত্রী হবে ইত্যাদি।
- ❖ কাঠি অথবা পাথর দিয়ে মাটিতে ছবি আকা। ছোট শিশুরা এগুলো নিয়ে খেলার সময় সর্তক থাকতে হবে। শিশুরা যাতে পাথরের টুকরো মুখে না দেয়, সে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে। কেননা এ ধরনের টুকরা শিশুর শ্বাসরোধ করতে পারে। শিশুরা যাতে হাতে লাঠি নিয়ে কখনেই না দৌড়ায় এবং লাঠি দিয়ে কাউকে আঘাত না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

শিশুর সাথে বিভিন্ন খেলা ঃ বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন খেলা/কাজের নমুনা খেলা

০-১ বৎসরের শিশুদের সাথে যে সব খেলা/ কাজ করা যায়

- ❖ শিশু শোয়া অবস্থায় শিশুর চোখের উপর কোন রঙিন বস্তু (বেলুন, কাপড়, বল ইত্যাদি) ডানে/বামে ও উপর/নীচে ঘোরানো। শিশুর চোখ বস্তুটিকে অনুসরণ করবে। (বয়সঃ ১৫ দিন থেকে ৩ মাস)
- ❖ শিশুর চারদিক থেকে বিভিন্ন গতিতে অর্থাৎ দ্রুত, ধীরে ও মাঝারি গতিতে ঝুনঝুনি বাজানো। (বয়সঃ ২/৩ মাস-১ বৎসর)
- ❖ প্রথমে শিশুকে নিয়ে কোন খোলা জায়গায় বসা এবং অফর কেউ শিশুর নাম ধরে বিভিন্ন দিক থেকে ডাকা। যেমন- সামনে/ পেছনে এবং ডানে/বামে। শিশু যখন মাথা ঘুরিয়ে শব্দের উৎস খুঁজবে তখন তাকে উৎসাহিত করা (বয়সঃ ০-৬ মাস)
- ❖ শিশুকে একজন কোলে নিয়ে রাখা ও অপরজন প্রথম জনের পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে দুই পাশ থেকে ডাকা। কখনো ডান দিক থেকে, আবার কখনও বাম দিক থেকে। শিশু যখন আশা করবে সে এবারে ডানদিকে থাকবে, তখন সাথে সাথে বাম দিক থেকে ডাকা। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে দিক পরিবর্তন করে ডাকা ও শিশুকে হেসে উৎসাহিত করা।
- ❖ শিশুর সামনে বসে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা, আবার সরিয়ে ফেলা ও মজার কোন শব্দ করা (যেমন- উকি দিয়ে আবার মুখ ঢাকা)। শিশুকে কাপড় সরিয়ে তার মুখ দেখতে উৎসাহিত করা।
- ❖ শিশুর যে কোন খেলনা বা খাবার লুকিয়ে অথবা ঢেকে রেখে তা খুজে বের করতে দেয়া।
- ❖ শিশুকে নিজের থেকে কিছুটা দূরে বসিয়ে তার দিকে নরম ছোট বল গড়িয়ে দেয়া ও তার দিকে গড়িয়ে ফেরত পাঠাতে উৎসাহিত করা।
- ❖ সোজা করে পা ছড়িয়ে বসে পায়ের পাতায় বালিশ রেখে শিশুকে শোয়ানো ও বিভিন্নভাবে দোল দিয়ে ছড়া গান গাওয়া।
- ❖ শিশুকে তার নাক, চোখ, কান, মাথা, হাত ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাতে বলা।

- ❖ শিশুকে দুই শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্ন করা (যেমন- আব্বু কই, বিড়াল কই ইত্যাদি)। অথবা মা, বাবা, ভাই, বোনদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা ওটা কে?
- ❖ যে কোন শব্দ করে এমন খেলনা শিশুর সামনে বাজানো যা শিশু ধরতে পারে। ধরে শিশু নাড়াচাড়া করার সময় হেসে তাকে উৎসাহ দেয়া।
- ❖ শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে শিশুকে কোন কথা না বলে চোখ, মুখ, হাত, মাথা নাড়িয়ে কতগুলো কথা বুঝানো এবং শিশুকে সে সব ইঙ্গিত বুঝতে শেখানো। যেমন-
  - দুই হাত তুলে শিশুকে কোলে তোলার ভঙ্গী করা।
  - এক হাত বা দুই হাত তুলে তাকে কাছে আসতে বলা।
  - এক আঙ্গুল তুলৈ কোন জিনিস দেখিয়ে তা না ধরার জন্য (মানা করা) বুঝানো।
  - গ্লাস বা বাটি দেখিয়ে মুখের কাছে তুলে খাওয়া বুঝানো।
  - কারো কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে বুঝানো।

১-৩ বৎসরের শিশুদের সাথে যে সব খেলা/ কাজ করা যায়

- ❖ শিশুকে বিভিন্ন রং, আকার ও আকৃতির জিনিস দিয়ে ইচ্ছামত খেলার সুযোগ করে দেয়া (১-২ বৎসর)।
- ❖ শিশুকে প্রিয় ফল বা খেলনা হাতে নিয়ে শিশুকে তা নেবার জন্য উৎসাহিত করা ও শিশু এগিয়ে এলে ধীরে ধীরে ৩/৪ পা পিছিয়ে যাওয়া। তারপর হেসে শিশুকে আলিঙ্গন করে আদর করে জিনিসটি দেয়া। (১-২ বৎসর)
- ❖ শিশুকে উপর নীচে, ভেতর, বাহির ইত্যাদি নির্দেশনা দেয়া। (২-৩ বৎসর) যেমন:
  - বলটি টেবিলের নিচে রাখো।
  - চামচটি কাপের ভেতরে রাখো।
  - কাপড়টি জিনিসের উপরে বিছিয়ে দাও।
  - পুতুলটি বাক্সের বাহিরে রাখ।
- ❖ লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রং এবং জিনিস মিশিয়ে দিয়ে রং অনুযায়ী পৃথক করতে দেয়া।
- ❖ শিশুকে বিভিন্ন জিনিস, প্রাণী ও মানুষের নাম জিজ্ঞাসা করা। (২-৩ বৎসর) যেমন- ওটা কি? ও কে? এটা কি? ইত্যাদি।
- ❖ বাঁশের কঞ্চি বা গাছের চিকন কাঠি শিশুর হাতে দিয়ে মাটিতে ঘষা দিয়ে যা খুশি তা আঁকতে উৎসাহিত করা। (২-৩ বৎসর)।

৩-৫ বৎসরের শিশুদের সাথে যে সব খেলা/ কাজ করা যায়

- ❖ ছোট বয়সী উপযোগী কোন গল্প বলা ও শিশুকে কোন গল্প বলতে উৎসাহিত করা। মনোযোগ দিয়ে শোনা ও উপযুক্ত শব্দ বলে উৎসাহিত করা। (৩-৪) বৎসর।
- ❖ বিভিন্ন মানের ছোট ছোট বিচি (ফলের), বোতল, মুখ ইত্যাদি ব্যবহার করে শিশুকে বিভিন্ন আকৃতি ও নকশা করে উৎসাহিত করা। শিশু নিজে নিজে যা করবে সেই কাজকে উৎসাহিত করা (৩-৪) বৎসর।
- ❖ মাটিতে কাঠি দিয়ে বা ভাঙ্গা কোনো কিছুর একপ্রান্ত দিয়ে আঁকাআঁকি করতে উৎসাহিত করা।
- ❖ শিশুকে অন্যান্য শিশুদের দলে রেখে বলা, "আমি যখন গান গাইব তখন সবাই ইচ্ছামত নাচবে কিন্তু যখন আমি গান থামিয়ে দেব তখন সবাই যে যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়াচড়া করা যাবে না। যদি কেহ নড়ে তার নাম বলা হবে এবং সে আর খেলায় থাকতে পারবে না।" কিছুক্ষণ এই খেলা করা। লক্ষ্য রাখতে হবে গান গাওয়ার সময় নিজস্ব তৈরী কিছু জিনিস দিয়ে বাজনা বাজানো। (৪-৫ বৎসর)।
- ❖ শিশুকে হাত ধরে বলা, "আমি যা যা বলবো সেই অনযায়ী আমরা দুজন কাজ করবো।" যেমনঃ
    - ২ ধাপ সামনে যাবো (জোড়া বলা ও কাজ করা)।
    - ৩ ধাপ পেছনো যাবো
    - ২ ধাপ ডানে যাবো
    - ২ ধাপ বামে যাবো
    - ৪ ধাপ সামনে যাবো

  এবার এই ধরনের নির্দেশনা দিতে শিশুকে উৎসাহিত করা ও নিজে তা পালন করা। শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এই খেলাটি খেলা যায়। (৪-৫ বৎসর)।

- ❖ শিশুকে বালি, মাটি, গাছের বিভিন্ন আকারের পাতা, কলা গাছের ডগা ইত্যাদি দিয়ে খেলনা তৈরী করায় উৎসাহ দেয়া, যেমনঃ পুতুল, ঘোড়া, আম, বাঁশি, ঘড়ি ইত্যাদি। শিশুকে সাথে নিয়ে প্রথমে বানিয়ে দেখানো এবং পরে তাকে দিয়ে বানানো। (৪-৫ বৎসর)
- ❖ একটি বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস (খসখসে, নরম, মসৃণ, গোল, ত্রিভূজাকৃতি, লম্বাকৃতি, মাঝখানে ছিদ্র করা ইত্যাদি) রেখে শিশুকে চোখ বন্ধ করে তার ভেতর থেকে একটি জিনিস ধরতে বলো ও জিনিসটি কেমন, তা বলতে চেষ্টা করতে বলো।

বড় শিশুদের জন্য আরো কিছু খেলা

এক ধামা চাল একটা পটল

সবাই হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। অতপর সবাই ঘুরে একজনের পেচনে আরেকজন এ অবস্থানে আসবে। একহাত সামনে ও একহাত পেছনে রেখে চলবে "এক ধামা চাল একটা পটল" বলেই পায়ে তাল দিয়ে হাতের ও পায়ের অবস্থান বদলাবে। এভাবে সবাই মুখে বলবে ও পায়ে তাল দিয়ে হাত ও পায়ের অবস্থান বদলে গোল

হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকবে। এ খেলায় পেশী সঞ্চালন বাড়বে, মনোযোগের দক্ষতা ও দলীয় সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

এসে কানে কানে বলি

সবাই হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন জায়গা থেকে একজন একটি শব্দ মনোনীত করে তার পরের জনের কানে কানে শব্দটি বলবে। তিনি যে শব্দটি শুনেছে হুবহু সেই শব্দটি পরের জনের কানে কানে শব্দটি বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে। একেবারে শেষের জন যে শব্দটি শুনবে সেই শব্দটি এসে বোর্ডে লিখবে বা মুখে বলবে। এ খেলায় মনোযোগের দক্ষতা বাড়বে, চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে এবং দলীয় সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

গান গাই ও নাচি

সবাই হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন একজন চল চল চল ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল/ যে কোন ছড়া গান গাইবে ও গানের সাথে অঙ্গভঙ্গী করবে। বাকীরাও তার সাথে সাথে গাইবে ও ঐ একই গান গাইবে ভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে ও বাকীরা তাকে অনুসরণ করবে। এভাবে বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণ করতে পারে। এ খেলায় পেশী সঞ্চালন হবে ও সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

গান গাই ও তালি বাজাই

সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন তালে তালি বাজিয়ে ছড়া গান গাইবে। এ খেলায় পেশী সঞ্চালন হবে ও সৃজনশীল চিন্তা করার দক্ষতা বাড়বে।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে লেখা

সবাই হাত ধরে গোল হয়ে বসে পড়বে। তারপর ঘুরে একজন আরেকজনের সামনে পেছনে হয়ে (গোল ঠিক রেখে) বসবে। তারপর যে কোন একজন আরেকজনের পেছনে পিঠের উপর আঙ্গুল ছুঁয়ে যে কোন বর্ণ বা আকার বা সংখ্যা লিখবে। এভাবে যার পিঠে লেখা হয়েছে সে যা উপলব্ধি করেছে সেটাই পরের জনের পিঠে লিখবে। এভাবে চলতে থাকবে। একেবারে শেষের জন জোরে বলবে সে কি বুঝেছে। এ খেলায় মনোযোগের দক্ষতা বাড়বে, সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে ও পেশী সঞ্চালন হবে।

দল নেতা বাছাইয়ের খেলা

সবাই হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। তারপর যে কোন একজন গোলের বাহিরে আড়ালে যাবে। এবার সবাই মিলে একজনকে দলনেতা বানাবে, যে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করবে ও দ্রুত তা বদলাবে। বাকীরা সবাই তার মত অঙ্গ-ভঙ্গী করবে। খেলা শুরু হবার পর যে আড়ালে ছিলো তাকে এসে বলতে হবে কে দলনেতা। দলনেতা বলতে পারলে যে এই দলে চলে আসবে ও দলনেতা আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েকজন

আড়ালে যাবে ও খেলাটি চলবে। এ খেলায় মনোযোগের দক্ষতা বাড়বে, দলীয় সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে, পেশী সঞ্চালন হবে এবং এভাবে চিন্তা শক্তির স্ফুরণ হবে।

জায়গা বদলের খেলা

সবাই যার যার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াবে এবং একজন মাঝখানে আসবে ও বাকীরা যার যার (চেয়ার না থাকলে) জায়গায় চতুর্দিকে চক/কাঠি দিয়ে গোল করে দাগ কাটবে। এবার একজন ছাড়া বাকীরা যার যার জায়গায় দাঁড়াবে। যে মাঝখানে সে বলবে যার যার জামা সাদা রং তারা জায়গা বদলাও। যাদের জামা সাদা রং এর তারা জায়গা বদলাবে এবং জায়গা বদলের সময় যে বলেছে, সে যে কোন জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করবে। এবারে যে কোন জায়গা পাবে না সে পুনরায় নির্দেশ দেবে। নির্দেশসমূহ এরূপ হতে পারে-চুলের ক্লিপ, কানের দুল, জামার রং ইত্যাদি। এ খেলায় প্রতিযোগিতার মনোভাব বাড়বে, নিয়ম ও নির্দেশনা অনুসরণের দক্ষতা বাড়বে এবং মনোযোগের দক্ষতা বাড়বে।

আমি বলি

সবাই গোল হয়ে দাঁড়াবে। একজন মাঝখানে আসবে ও নির্দেশনা দেবে। যেমন- "আমি বলি মাথায় হাত" সবাই মাথায় হাত দেবে। অর্থাৎ যে কোন নির্দেশনা দেবার আগে "আমি বলি" কথাটা বলতে হবে। না বলে নির্দেশনা দিলে যারা তা পালন করবে তারা গোল থেকে বের হয়ে যাবে। এভাবে অনেকেই বের হয়ে যাবে। কয়েকজন থেকে যাবে। এ খেলায় মনোযোগের দক্ষতা বাড়বে ও নিয়ম ও নির্দেশনা অনুসরণের দক্ষতা বাড়বে।

চলো গল্প বানাই

সবাই গোল হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন একজন একটি গল্প শুরু করে কিছুটা বলে থেমে যাবে। পরবর্তীতে যে আছে সে আবার সেখান থেকে গল্প কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে সবাই মিলে কিছু কিছু যোগ করে গল্প শেষ করবে। এ খেলায় সৃজনশীল চিন্তা করার দক্ষতা বাড়বে, ভাষার দক্ষতা বাড়বে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

পাঠ-১১
শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু যত্নকারীদের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাব্য মাধ্যম

ইসিডি বিষয়ক বার্তা নিয়ে যত্নদানকারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সম্ভাব্য মাধ্যম

সরকারি সংস্থার মাঠকর্মী	কম্যুনিটি/ধর্মীয় নেতা	স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত পরিষদের সদস্য/সনস্যা
বেসরকারী সংস্থার মাঠকর্মী	যত্নদানকারী/পরিবার	শিক্ষক
রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, লোকগীতি, লোকনাট্য	ছাত্র-ছাত্রী/কিশোর-কিশোরী/গার্ল গাইড/বয় স্কাউট	চিকিৎসক- (ধাত্রী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ/ শিশু বিশেষজ্ঞ, ধাত্রী, নার্স

পাঠ-১২
প্রতিবন্ধিতা ও এর গুরুত্ব এবংকমিউনিটি প্যারামেডিকের ভূমিকা

প্রতিবন্ধিতা কি?

মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই। এ মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে, জীবনধারণ করবে এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উত্তরসুরী রেখে একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। এটাই পৃথিবীর বা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু মানুষ জন্মগতভাবে বা জন্মের পর থেকে শারীরিক, মানসিক কিংবা অন্য কোন সমস্যা বা অসমর্থতার কারণে এ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পরিচালনা করতে বাধাগ্রস্থ বা অসমর্থ হয়। এ অসমর্থতাকে প্রতিবন্ধিতা এবং যে বা যারা অসমর্থ তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলে।

সহজ কথায় বলা যেতে পারে শরীরের অঙ্গের কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ততার ফলে যদি কোন ব্যক্তির চলাফেরায়, নড়াচড়ায়, দেখায়, শুনায় বা বুঝায় সমস্যা থাকে তাহলে সে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হয়, যেমন- চোখ অন্ধ হলে ব্যক্তির চলাফেরার সমস্যা হয় বা পা অবশ হওয়ার ফলে ব্যক্তিটি আর নড়াচড়া করতে পারে না। সমাজে তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। বিশ্বা স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সূত্রমতে, দেখা যায় প্রতি দশজনে এক জন মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। এর মধ্যে শিশু প্রতিবন্ধিতাও অন্তর্ভূক্ত। প্রতিবন্ধী শব্দটির সার্বজনীন সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবন্ধিতা বলতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাকে বুঝিয়ে থাকে। আবার ডিজেবল্ড পিপল্‌স ইন্টারন্যাশনাল বলছে "প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সৃষ্ট একটি সমস্যা।

যখন একজন ব্যক্তি অন্য দশ জনের মতো কোন কাজ একই উপায়ে করতে সক্ষম হয় না, তখন সমাজের সবাই তাকে অবহেলা করে। ফলে সে মানুষটি তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন- প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং জীবনে পরবর্তী পর্যায়ে হয় নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার। ফলে তারা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ তে বলা হয়েছেঃ প্রতিবন্ধী অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি-

১. জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং
২. স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সারা বিশ্ব ব্যাপি ও জাতীয়ভাবে বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচীর ফলস্বরূপ আজ মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। বর্তমানে অনেক শিশুই ভূমিষ্ট হওয়ার পর অসময় মৃত্যু থেকে রক্ষ পায় ও বেঁচে থাকে। আনন্দের বিষয় এই যে, বেঁচে যাওয়া এই শিশুদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

নবজাতকের বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে যে, সকল নবজাতক বেঁচে থাকে তারা কি আদতেই শারীরিকভাবে ত্রুটিমুক্ত এবং তারা আসলে কি মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে কর্মক্ষম হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে? তাই বলা যেতে পারে যে শুধু বেঁচে থাকার চাইতে মানসিক ও শারীরিক ভাবে সুস্থ সবল হিসেবে বেঁচে থাকাই সকলের কাম্য।

অন্যান্য দেশের মত বর্তমানে আমাদের দেশেও একটি শিশুর জীবনের গুণগত মানকে অনেক বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, গবেষকরা বিভিন্ন গবেষণা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজে শিশুদের পতিবন্ধিতার হার জানার জন্য কাজ করছেন। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ২-৯ বছর বয়সী ১০,০০০ শিশুর মধ্যে একটি সমীক্ষায় ৮.২% শিশুদের মধ্যে এক বা একাধিক রকমের প্রতিবন্ধিতা পাওয়া গেছে। ২০০১ সালে অন্য আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৬.৫% শিশুরা কোন না কোন রকম প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন। ২০০5 সালের আর একটি জরিপে ৫ বছর ও তার কম বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ২ জন শিশুকে প্রতিবন্ধী পাওয়া গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগই কোন না কোন রকম প্রতিবন্ধিতার শিকার। এর মধ্যে শিশু প্রতিবন্ধিতাও অর্ন্তভূক্ত।

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ পরিবার, সমাজ তথাপি দেশের জন্য বোঝা স্বরূপ। কর্মক্ষম জনশক্তি দেশের মেরুদন্ড। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষকে কর্মক্ষম জনশক্তি বানাতে সময়োপযোগী উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও, প্রতিটি ব্যক্তির কাছে তার নিজ জীবনের মূল্য আছে। যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা একজন ব্যক্তির জন্য লজ্জা ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময়ই আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হয়। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঠাট্টা, তামাশার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে, আর সমাজ যখন আক্রান্ত ব্যক্তিকে করুণার চোখে দেখে তখন আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তা আরও দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায়। একটি শিশু প্রতিবন্ধী শুধুমাত্র তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ধরনের শিক্ষার সুযোগ না পেলে, তার নিজের সুপ্ত বুদ্ধিমত্তা প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

শিশু প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে কমিউনিটি প্যারামেডিক এর ভূমিকা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী বা কমিউনিটি প্যারামেডিক যারা প্রতিদিন বাড়ী পরিদর্শনের সুযোগ পান তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল স্বাস্থ্য কর্মীরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ পালন করতে পারেনঃ

১। শিশু প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ঃ যেহেতু কমিউনিটি প্যারামেডিকরা বাড়ী বা স্বাস্থ্য ক্লিনিকে কাজ করেন তাই তারা খুব কম বয়সী শিশু দেখার সুযোগ পান। তাই তার শিশু জীবনের প্রথম দিকেই প্রতিবন্ধিতা সনাক্ত করার সুযোগ পান। নবজাতক বা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্য থেকে একজন জ্ঞানী ও দক্ষ কমিউনিটি প্যারামেডিক শিশু প্রতিবন্ধিতা তাড়াতাড়ি সনাক্ত করতে পারেন এবং বাবা-মা ও পরিবারকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন। প্রতিবন্ধিতা যত তাড়াতাড়ি সনাক্ত করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে এমনকি অনেক খারাপ ফলাফলও হ্রাস করা যেতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপ, শিশুকে একটি সুস্থ শৈশব ও উন্নত ভবিষ্যত লাভে সাহায্য করতে পারে।

২। একজন প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা-মাতা স্বাভাবতই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং আশা ছেড়ে দেন। একজন জ্ঞানী বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিকই পারেন সব ধরনের ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার দূর করতে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম মা-বাবার মধ্যে মন-মালিন্য সৃষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়। পিতা-মাতা যখন তাদের শিশুর প্রতিবন্ধিতার জন্য একজন অপরজনকে দায়ী করতে থাকেন তখন একজন দক্ষ কমিউনিটি প্যারামেডিক "শান্তিদূত" হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৩। যে সকল প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধযোগ্য, সে ব্যাপারে নিজে সতর্ক থেকে ও অন্যান্যদের সতর্ক করে, প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা কমাতে পারেন। গর্ভকালীন যত্ন ও প্রসবকালীন সাবধানতা অবলম্বন করে তারা, মা-বাবা পরিবারকে একজন সুস্থ সবল শিশু উপহার দিয়ে সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করতে পারেন।

পাঠ-১৩
প্রতিবন্ধিতার ধরন ও কারণ

প্রতিবন্ধিতার ধরন

প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আবার এ সকল প্রতিবন্ধিতার মাত্রাও ভিন্ন। কিছু কিছু প্রতিবন্ধিতা এমন যা আক্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ কৌশলে অতিক্রম করতে পারে। অথবা সহজ উপায়ে বিশেষ যন্ত্র বা (Aid) ব্যবস্থা দিয়ে অতিক্রম করা যায়। তবে এমন কিছু প্রতিবন্ধিতাও রয়েছে যার কোন প্রতিকার বা চিকিৎসা নাই।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা দেখা যায়। তবে সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. **শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ঃ** শরীরের কোন অংশের বা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- হাত পা, মুখ, মাথা ইত্যাদির কোন অসামঞ্জস্যতা বা অনুপস্থিতির কারণে স্বাভাবিক মানুষের মত তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয় তাদেরকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলে।
২. **দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ঃ** চোখের সমস্যার কারণে দেখতে না পাওয়া বা আংশিক দেখতে পাওয়া অথবা কম দেখতে পাওয়াকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলে।
৩. **বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা ঃ** সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া কথা বলতে না পারা বা শুনতে না পারার কারণে সৃষ্টি সমস্যাকে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা বলে।
৪. **মানসিক প্রতিবন্ধিতা ঃ** মস্তিক বা স্নায়ুতন্ত্রের ধীরে বিকাশজনিত এবং সমস্যাজনিত কারণে একজন শিশু বা ব্যক্তির বোদগম্যতা হ্রাস পায় বা থাকে না তখন তাকে মানসিক প্রতিবন্ধিতা বলে। তাছাড়া এটা বুদ্ধির স্তরের উপর নির্ভর করে। যার বুদ্ধির স্তর যত কম তার তত বেশি মানসিক প্রতিবন্ধিতা।
৫. **বহুমুখী প্রতিবন্ধিতা ঃ** একই সাথে একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে তাকে বহুমুখী প্রতিবন্ধিতা বলে।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধিতা সমস্যার ব্যাপকতা

দেশ জুড়ে প্রতিবন্ধিতার মত জটিল সমস্যা সম্পর্কে জরিপ করা একটি কঠিন কাজ। তবে কিছু সমীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সালের, ২-৯ বছর বয়সী ১০,০০০ শিশুদের মধ্যে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৮.২% শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। এই শিশুদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রতিবন্ধিতাই আছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার তুলনায় বেশি পাওয়া গেছে। এছাড়া বাক-প্রতিবন্ধিতাও নেহায়ত কম নয়।

গ্রাম ভিত্তিক ২০০১-২০০২ সালের আর একটি সমীক্ষায় ১৯৮৮ সনের তুলনায় শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া গেছে।

পরবর্তীকালে, ২০০৪ সনের আর একটি সমীক্ষায় পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাই বেশী পাওয়া গেছে। তবে এই সমীক্ষায়ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার তুলনায় শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা বেশী পাওয়া গেছে। চিহ্নিত প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে বাক-প্রতিবন্ধিতা সংখ্যা ছিল পায় দশ ভাগের এক ভাগ (১০%)। অনেক প্রতিবন্ধি শিশুর মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিবন্ধিতা লক্ষ্য করা যায়।

মনে রাখতে হবে যে, যে রকম প্রতিবন্ধিতাই হোক না কেন নিরাময় না পেলে এই শিশুরা সমাজের স্বাভাবিক স্রোতধারা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এবং এভাবে পিছিয়ে পড়া এই দল অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিবন্ধিতার কারণ

বিভিন্ন কারণে মানুষ প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। শিশু সময় থেকেও প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মাতে পারে। আবার কেউ কেউ জন্মের পর বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমনঃ

প্রাকৃতিক সৃষ্ট কারণঃ

ক. জন্মগত, খ. বংশগত, গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘ. পরিবেশ পরিবর্তনজনিত কুফলতা, ঙ. দুর্ঘটনা জনিত ও চ. রোগ (রিকেট্স, পোলিও ইত্যাদি)

মানব সৃষ্ট কারণঃ

ক. যুদ্ধ বিগ্রহ, খ. মারামারি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা, গ. অপুষ্টিজনিত, ঘ. ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম ঘাটতিজনিত ও ঙ. আয়োডিনের অভাবজনিত।

তাছাড়া বেশ কিছু কারণ দারিদ্রতা এবং অসচেতনার সাথে সম্পর্কযুক্তঃ যেমন-

ক. গর্ভকালীন মায়েরা যদি পর্যাপ্ত খাবার না পায়।

খ. শিশু কিশোরেরা যদি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার না পায়।

গ. ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।

ঘ. মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুনর্বাসন সেবার অনুপস্থিতি।

ঙ. ঘরবাড়িতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সম্পন্ন দরজা জানালা না থাকা।

চ. পুষ্টি জ্ঞানের অভাব।

ছ. বাল্য বিবাহ ও অল্প বয়সে মা হওয়া।

শিশুদের প্রতিবন্ধিতার কারণ ঃ

শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। আবার একটি কারণই একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতাও সৃষ্টি করতে পারে। যেমনঃ German Measles দ্বারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, হৃদপিন্ডের গঠনের ত্রুটি হতে পারে।

শিশুর প্রতিবন্ধিতার কারণগুলোকে তিন ভাগে আলোচনা করা যায়ঃ

ক. শিশু জন্মের পূর্ব বা গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ ঃ জন্মের পূর্বে বা গর্ভাবস্থায় যে সব কারণে প্রতিবন্ধিতা হতে পারে সেগুলো হলো-

১. গর্ভাবস্থায় কড়া ঔষধ, যেমন- স্ট্রেপটোমাইসিন, কুইনাইন ইত্যাদি সেবন। এসব ঔষধ সেবন করলে শিশু শ্রবণ, দৃষ্টি, শারীরিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে। এছাড়া গর্ভভতী মা ভুল ঔষধ সেবন করলেও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

২. গর্ভাবস্থায় মা যদি পরিমিত পুষ্টিকর খাবার না খায়, তাহলে মায়ের শরীরে আয়োডিন, ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম এর অভাব দেখা দিতে পারে। আয়োডিন এর অভাবে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা অন্য কোন সমস্যা নিয়ে জন্মাতে পারে।

৩. গর্ভবতী মা, মাদকাসক্ত, ধুমপায়ী বা তামাক জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হলে।

৪. গর্ভাবস্থায় মায়ের ডায়াবেটিস, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগ হলো।

৫. গর্ভাবস্থায় গর্ভপাতের ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

৬. ১৮ বছর বয়সের নিচে বা ৩৫ বৎসর পর গর্ভবতী হলে।

৭. প্রজনন সংক্রমণ, যেমন- সিফিলসে আক্রান্ত হলে।

৮. স্বামী এবং স্ত্রী মধ্যে ঘনিষ্ট রক্ত সম্পর্ক থাকলে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি আপন চাচাতো, মামাতো, খালাতো প্রভৃতি ভাইবোনের সম্পর্ক থাকলে।

৯. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রক্তের গ্রুপের এর বৈপরীত্য থাকে (RH Factor পজিটিভ ও নেগেটিভ)।

১০. গর্ভাবস্থায় এক্সরে করলে বা গর্ভবতী মা পারমানবিক দুর্ঘটনা কবলিত (রাসায়নিক তেজস্ক্রিয়তা বা বিষক্রিয়া) এলাকায় বসবাস করলে।

খ. প্রসবকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ ঃ প্রসবকালীন সময়ে কিছু সমস্যার কারণে ও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে, যেমন-

১. শিশু ৯ মাস ৭ দিনের অনেক আগে বা খুব কম ওজন নিয়ে জন্ম নিলে তার শারীরিক গঠন অসম্পূর্ণ থাকে।

২. প্রসববেদনা যদি খুব দীর্ঘ হয় সে ক্ষেত্রে অক্সিজেনের অভাবে শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৩. ফরসেপ ডেলিভারী এর কারণেরও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। বিশেষ করে এর কারণে শিশুর সেরিব্রাল পলসি হতে পারে।

৪. শিশু যদি মায়ের গর্ভে অস্বাভাবিক অবস্থানে থাকে বা শিশুর গলায় যদি নাড়ী পেঁচিয়ে থাকে তাহলেও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

৫. ধাত্রী যদি অদক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে তার দ্বারা সৃষ্ট কোন সমস্যার জন্য শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে এবং

৬. নবজাতকের কিছু কিছু রোগ, যেমন- জন্ডিস, ধনুষ্টংকার, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড বা অন্য যে কোন কারণে যদি উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর হয় তাহলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

গ. জন্মের পর প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ ঃ জন্মের পর মানুষ বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমন-

১. জন্মের পর অপুষ্টি প্রতিবন্ধিতার একটি বড় কারণ। আয়োডিন এর অভাবে শিশু বুদ্ধি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা বা এর থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হতে পারে, ক্যালসিয়াম এর অভাবে শিশুর হাড় দুর্বল হতে পারে। যা থেকে রিকেট বা হাড় মুড় মুড়ি রোগ হতে পারে। এগুলো থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি হয়।

২. কিছু কিছু অসুস্থতা, যেমন- পোলিও, হাম, বসন্ত, ডায়রিয়া প্রভৃতি কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হতে পারে।

৩. দুর্ঘটনায়, কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া ইত্যাদির ফলেও প্রতিবন্ধিতা হতে পারে।

৪. ভুল ঔষধ বা কড়া ঔষধও প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে।

৫. কীটনাশক বা অন্য কোন বিষ প্রভৃতি থেকে ও পরিবেশ দুষণের কারণে বিভিন্ন অসুখ-এর ফলে প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি হতে পারে।

৬. টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কারণে, উচ্চমাত্রার জ্বরের কারণে।

৭. মস্তিষ্কের আঘাত বা মস্তিষ্কের টিউমারের কারণে।

এ সকল কারণ ছাড়াও প্রতিবন্ধিতার কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো আজও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

পাঠ-১৪
প্রতিবন্ধি শিশুদের সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা

প্রতিবন্ধি শিশুদের সনাক্তকরণ

ছোট শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণের প্রধান উপায় হলো শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ধাপসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান।

একটি স্বাভাবিক সুস্থ্ শিশুর কোন বয়সে কি কি শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সে কোন বয়সে কি কি দক্ষতা অর্জন করে সে বিষয় জানা থাকলে যে কোন শিশুকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলা যাবে যে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করছে, না পিছিয়ে আছে এবং তার কোন রকম ক্রটি বা অঙ্গহানী আছে কি না। পরবর্তী পৃষ্ঠা গুলোতে একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ্ শিশুর বিকাশের চার্ট দেয়া হলো। যে কোন শিশুকে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে একটি বা একাধিক দক্ষতা অর্জন করতে শিশু ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে ঐ শিশুকে অতিসত্বর বিশেষভাবে আবার পরীক্ষা করতে হবে।

নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে দক্ষতার তুলনায় বিকলাঙ্গতার জন্য পরীক্ষা করা হয়। বাড়ি পরিদর্শনের সময় অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা মাতৃমঙ্গল ক্লিনিকে নবজাতকের শারীরিক পরীক্ষা করে প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টিকারী বিকলাঙ্গতার জন্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যে সকল বিকলাঙ্গতা থাকলে নবজাতক পরবর্তীতে প্রতিবন্ধী হতে পারে সেগুলো

নিম্নে দেয়া হলো। কমিউনিটি প্যারামেডিকদের সকল নবজাতক শিশুকে পরীক্ষা করার সময় এ সকল বিকলাঙ্গতার বিষয় মনে রেখে বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

নবজাতকের প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ

১) নবজাতকের হাত পা শিথিল/নিয়ন্ত্রণহীন।

২) মুখমন্ডল অস্বাভাবিক, ঘাড় খাট, চোখ নীচে নামানো, জিহ্বাপুরু।

৩) চোখের মণির অবস্থান অস্বাভাবিক।

৪) চোখ ফোলা বা একটি স্থায়ীভাবে বদ্ধ।

৫) চুষতে সমস্যা বা অনীহা।

৬) উপরের ঠোঁট দেখতে কাটা।

৭) দেহের তুলনায় মাথা বড়।

৮) এক পাশের হাত, পা দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়।

৯) হাত বা পা বাঁকা।

১০) মেরুদন্ডে ফোঁড়ার মত মাংসপিন্ড, পা অস্বাভাবিক এবং অনুভূতিহীন।

১১) নাভী ফোলা, কাঁদলে আরো বেশী ফোলে।

১২) অন্ডকোষ বড় এবং ফোলা।

বিভিন্ন বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ এর উপায় বিভিন্ন। আবার শারীরিক কারণে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণের কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও মানসিক প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ততো সহজ নয়। তবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে দেখলে শিশুর সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া মা, বাবা ও শিশুর যত্নকারী ব্যক্তিদেরকে বিশেষ কিছু প্রশ্ন সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

এ সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরো কিছু পরীক্ষার জন্য শিশুদেরকে বাছাই করে যেখানে বিশেষ পরীক্ষার এবং প্রয়োজনীয় সেবার ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে রেফার করা যায়।

নিচে সনাক্তকরণের কিছু উপায় দেয়া হলো। একটি স্বাভাবিক শিশু বয়স বাড়ার সাতে সাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে। এই উন্নতি তার বিভিন্ন দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। একজন স্বাস্থ্যকর্মী তথা কমিউনিটি প্যারামেডিক এর এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকলে শিশুর ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। বিভিন্ন বয়সে স্বাভাবিক শিশুদের কি কি দক্ষতা থাকে নিম্নে তা দেয়া হলো। এ সকল দক্ষতা না থাকলে অথবা অর্জন করতে বিলম্ব হলে, শিশুকে বিশেষ পরীক্ষা ও পরামর্শের জন্য বাছাই করা যেতে পারে।

৩ মাসের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. উপুড় হয়ে মাথা উঁচু করতে পারবে।

২. কোন কিছু চুষতে দিলে জোরালোভাবে চুষবে।

৩. চোখে টর্চের আলো ফেললে চোখ পিট পিট করবে।

৪. হাসতে হাসতে কিছু বললে শিশুও হাসবে।

৫. হাত-পা অবাধে নাড়াচাড়া করতে পারবে।

৬. দুই হাত দিয়ে খেলতে পারবে।

৭. খেলনা দিলে ধরতে পারবে।

৮. কোন শব্দ হলে শব্দ কোথা থেকে আসছে দেখার চেষ্টা করবে।

৬ মাসের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. খেলনা একদিক থেকে অন্যদিকে নিলে শিশু খেলনা অনুসরণ করে ঘুরে তাকাবে।

২. শিশুকে বসালে কিছু সময় মাথা শক্ত করে রাখবে।

৩. চোখের সামনে থেকে খেলনা সরালে তা ধরার জন্য শিশু গড়াবে।

৪. শিশুর সামনে খেলনা রাখলে মাথা উচু করে খেলবে।

৫. মায়ের কোলে বসিয়ে কাছে খেলনা রাখলে তা নিয়ে খেলবে।

৬. মা শিশুকে ডাকলে মার দিকে তাকাবে।

৭. সমতল স্থলে দাঁড় করালে পায়ের উপর ভর দেয়ার চেষ্টা করবে।

৮. শিশুর দু'বাহুর নীচে ধরে উপর নীচ করলে আনন্দ উপভোগ করে।

১ বৎসরের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. হামাগুড়ি দিতে এবং বসে খেলতে পারে।

২. একটার পর আর একটা খেলনা দিলে প্রথমটা অন্য হাতে রেখে নতুনটা নিবে।

৩. কোন চাকা ওয়ালা খেলনা দিলে ধাক্কা দিয়ে খেলবে।

৪. কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা জানাতে পারবে, যেমন- পানি, খেলনা।

৫. নিজে নিজে কোন কিছু খেতে পারবে, যেমন- বিস্কুট।

৬. গ্লাস ধরে নিজেই পানি খেতে পারবে।

৭. ছোট ছোট শব্দ অনুকরণ করতে পারবে, যেমন- মা, বাবা।

৮. কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারবে।

২ বৎসরের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. চামচ দিলে ব্যবহার করতে পারবে।

২. বয়স্কদের কাজ অনুকরণ করবে, যেমন- ঝাড়ু দেয়া।
৩. নিজে নিজে হাত ধুতে পারবে।
৪. দুই বা ততোধিক শব্দ ব্যবহার করে কথা বলবে।
৫. কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বলতে পারবে।
৬. কয়েকটি কাঠের টুকরা দিয়ে স্তম্ভ বানাতে দেখে শিশুও তা করতে পারবে।
৭. তার সামনে বোতলে কোন জিনিস ঢুকিয়ে বের করলে সেও তা করবে।
৮. শিশুর নাম ধরে ডাকলে হেঁটে আসবে।
৯. শিশুর দিকে বল ছুড়ে দিলে সেও ছুড়ে দিবে।

৩ ও ৪ বৎসরের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. শিশু নিজে নিজে খেতে পারবে।
২. নিজের নাম এবং সে ছেলে না মেয়ে তা বলতে পারবে।
৩. ছবি দেখে বস্তুর নাম বলতে পারবে।
৪. সহজ কোন আকৃতি অনুকরণ করতে পারবে।
৫. দেহের ৪টি অঙ্গের নাম বলতে পারবে। যেমন- হাত-পা, নাক, কান ইত্যাদি।
৬. সামনে বল রেখে লাথি মারতে পারবে।
৭. দেখে শুনে পা ফেলে হাঁটতে ও দৌঁড়াতে পারবে।
৮. শিশু ২ পায়ে লাফাতে পারবে।

৫ বৎসরের শিশুর পর্যবেক্ষণ

১. একা একা কাপড় খুলতে ও পরতে পারবে।
২. রং এর নাম বলতে পারবে।
৩. সম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারবে।
৪. আস্তে আস্তে কানের কাছে কথা বললে সে বুঝতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৫. কোন নির্দেশ দিলে পালন করতে পারবে, যেমন- লাইন করে বোতাম ও পাথর সাজানো।
৬. মানুষের ছবি আঁকতে পারবে।
৭. এক চোখ ঢেকে অন্য চোখে দেখতে দিলে দেখতে পারবে।
৮. চোখের কিনারার পিছন দিক থেকে কিছু এগিয়ে আনলে শিশু তা দেখতে পাবে।
৯. অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে।
১০. শিশু ৩/৪ বার ১ পায়ে লাফাতে পারবে।

Ref. প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ সহায়ক কার্ড, সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

আচরণগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিহ্ন

একজন সচেতন মা বা সেবাদানকারীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নের সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কালক্ষেপন না করে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধী শিশুর সঠিক ব্যবস্থা আরম্ভ করা সম্ভব।

বয়স	অস্বাভাবিক চিহ্ন
এক মাস বয়সে	• দুর্বলভাবে দুধ টানা বা মোটেই না টানা • হাত পা দুর্বলভাবে নাড়াচাড়া করা বা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় • তীব্র আলো বা জোরে শব্দ শুনে কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করা • বিনা কারণে দীর্ঘ সময় ধরে কান্না করা • পানি শূন্যতা সৃষ্টিকারী তীব্র বমি বা ডায়রিয়া
৩ মাস বয়সে	• কোন শব্দ না করা • কোন খেলনা বা জিনিস চোখের সামনে ধরে একদিক থেকে অন্য দিকে সরালে তার দিকে না তাকানো • পরিচিত চেহারা বা জিনিস, যেমন- খাবার দেখলে কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করা।
৬ মাসের বয়সের মধ্যে	• হাত, পা শক্ত হয়ে যাওয়া/নাড়াতে না পারা • অবিরত মাথা নাড়তে থাকা • কোন শব্দ শুনে বা পরিচিত চেহারা দেখে বা মায়ের দুধ দেখেও কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শণ না করা • খাবার বা মায়ের দুধের প্রতি অনিহা • ঘাড় সোজা করে ধরে রাখতে অপারগতা
৯ মাস বয়সের মধ্যে	• এক হাত থেকে খেলনা অন্য হাতে নিতে না পারা • সোজা হয়ে বসে থাকতে অসুবিধা • মুখে কোন শব্দ না করা • যত্নকারীর প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করা
১২ মাস বয়সে	• অন্যদের দেখে কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করা • চলমান জিনিস লক্ষ্য না করা • নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকা • ক্ষুধা মন্দা/ খাবার প্রত্যাখ্যান করা
২ বছর বয়সে	• অন্যদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা • হাঁটার সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে অপারগতা • হঠাৎ আচরণের পরিবর্তন • ক্ষুধা মন্দা
৩ বছর বয়সে	• খেলায় অনিচ্ছা/অনাগ্রহী • প্রায় প্রায় পড়ে যাওয়া • ছোট ছোট জিনিস ধরতে বা নাড়তে অসুবিধা

	• আদেশ বুঝতে অপারগতা • একাধিক শব্দ বলতে অপারগতা • খাবারের প্রতি অনীহা

তাছাড়া মা ও অভিভাবককে নিম্নের প্রশ্নগুলো করেও বেশকিছু প্রতিবন্ধীতা সনাক্ত করা সম্ভভ।

TEN QUESTIONS PLUS (TQP)-11

(প্রতিবন্ধী শিশু সনাক্তকরণ প্রশ্নমালা)

১	অন্যান্য শিশুদের তুলনায় আপনার শিশুটির বসতে, দাঁড়াতে অথবা হাঁটতে খুব বেশী দেরী হয়েছে কি?	☐ হ্যাঁ	☐ না
	যদি উত্তর 'না হয় তবে ২ নং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে প্রশ্ন করুনঃ শিশুটি কি ২ বছর বয়সের মধ্যে হেঁটেছে।	☐ হ্যাঁ	☐ না
২	অন্যান্য শিশুদের তুলনায় শিশুটির দিনে অথবা রাতে চোখে দেখতে অসুবিধা হয় কি?	☐ হ্যাঁ	☐ না
৩	শিশুটির কানে শুনতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে হয় কি?	☐ হ্যাঁ	☐ না
৪	যখন আপনি শিশুটিকে কিছু করতে বলেন তখন সে কথাটি বোঝে বলে আপনার মনে হয়?	☐ হ্যাঁ	☐ না
৫	শিশুটির কি হাঁটতে অথবা হাত নাড়াতে অসুবিধা হয় অথবা তার হাত/পা দুর্বল অথবা হাত/পা শক্ত/জড়সড়, আড়ষ্ট?	☐ হ্যাঁ	☐ না
	যদি উত্তর না হয় তবে ৬নং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন যদি উত্তর 'হ্যা হয় তবে প্রশ্ন করুনঃ	☐ হ্যাঁ	☐ না
	হাঁটার জন্য তার কি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়?	☐	☐

		হ্যাঁ	না
	কোন জিনিস তোলার জন্য সে কি তার হাত ব্যবহার করতে পারে?	হ্যাঁ	না
৬	শিশুটির কি কখনও ফিট/ খিচুনী হয় অথবা সে শক্ত হয়ে যায় অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে?	হ্যাঁ	না
৭	শিশুটি কি তার সমবয়সী শিশুদের মতই সব কিছু শিখতে পারে?	হ্যাঁ	না
৮	শিশুটি কি আদৌ কথা বলতে পারে? সে কি কথা বলে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে? অন্য লোকে বোঝে এমন কথা (অর্থপূর্ণ) সে কি বলতে পারে?	হ্যাঁ	না
৯	৩ থেকে ৯ বছর বয়সের শিশু সম্পর্কে প্রশ্ন করুন: শিশুটির কথা বলার ক্ষমতা কি স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কোন না কোন ভাবে ভিন্ন? (তার পরিবার লোকজন ছাড়া অন্য কেউ ভাল ভাবে বুঝতে পারে না?)	হ্যাঁ	না
	২ বছর বয়সের শিশু সম্পর্কে প্রশ্ন করুনঃ শিশুটি কি কমপক্ষে একটি জিনিসের নাম বলতে পারে? (যেমন: একটি পশুর নাম, একটি খেলনার না, একটি চায়ের কাপ, একটি চামচ)	হ্যাঁ	না
	যদি উত্তর 'না' হয় তবে প্রশ্ন করুনঃ সে কি জিনিস বোঝাতে তার নিজস্ব শব্দ/ভাষা ব্যবহার করে? (যেমন: কুকুর বোঝাতে ঘেউ ঘেউ বা অন্য কিছু শব্দ করে।)	হ্যাঁ	না
১০	সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় সে কি বুদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে আছে, ধীরে বোঝে?	হ্যাঁ	না
	আচরণ ঃ ক) আপনি কি মনে করেন আপনার শিশুর আবেগজনিত অসুবিধা অথবা মনোযোগ বা আচরণের সমস্যা অথবা সামাজিক মেলামেশায় অসুবিধা	হ্যাঁ	না

	আছে? (যদি উত্তর 'হ্যাঁ হয় খ নং প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই), উত্তর 'না' হলে, খ নং প্রশ্ন করুন		
	খ) তার কোন কার্যকলাপ আপনাকে কি উদ্বিগ্ন করে? 'ক' অথবা 'খ' প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে, তবে কোন ধরনের সমস্যা তা লিপিবদ্ধ করুনঃ	☐ হ্যাঁ	☐ না
	স্বাস্থ্যঃ স্বাস্থ্যগত এমন কোন গুরুতর সমস্যা আছে কি যা এখানে উল্লেখ করা হয় নি? যদি হ্যাঁ হয় তবে কোন ধরনের সমস্যা তা লিপিবদ্ধ করুন?		

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা

কোন স্বাস্থ্য কর্মী যখন কোন শিশুকে প্রতিবন্ধী বলে সন্দেহ বা ধারণা করেন, তখন তার কর্তব্য হবে শিশুটির বাবা-মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা, শিশুর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনাকালে স্বাস্থ্য কর্মী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আলোচনার ভাষা হতে হবে সহজ, সঠিক ও যথোপযুক্ত।

শিশুর অবস্থা সম্পর্কে কোন বিষয় গোপন না করে অথবা বাবা-মাকে মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে, খোলাখুলিভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আলোচনাকালে স্বাস্থ্যকর্মী কথাবার্তায় কোন জড়তা বা মিথ্যা আশ্বাস যেন প্রকাশ না পায় এবং এমন কোন কথা বলা উচিৎ হবে না যে কারণে বাবা-মা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুটিকে অবজ্ঞা করতে উৎসাহিতবোধ করবেন।

এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রাথমিক সাহায্য সহযোগীতা পাবার প্রথম স্থান হলো উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কমিউনিটি প্যারামেডিককে তার কর্মক্ষেত্রের আশেপাশে অথবা নিকটস্থ এলাকায় যে সব বেসরকারী সংস্থা প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা নিয়ে কাজ করে, তাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। এ ধরনের কোন কোন সংস্থায় রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুনর্বাসন কর্মী বাহিনী, যারা গ্রাম পর্যায়ে কাজ করেন। এ সব কর্মীর সংখ্যা স্বল্প হলেও, এদের সম্পর্কে তথ্যাদি জানা থাকলে, প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা/যত্ন এর বিষয়ে বাবা-মায়ের যথেষ্ট সুবিধা হবে এবং শিশুর সেবা যত্ন অবিলম্বে আরম্ভ করা যাবে। খুবই ভাল হয় যদি কমিউনিটি প্যারামেডিক তার কর্মব্যস্থতার মধ্যেও সময় বের করে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে রেফারেল ফেসিলিটিজ/ প্রেরণ কেন্দ্রে প্রথমবার নিয়ে যাবার সময় শিশুটির বাবা-মার সাথে সহযোগি হন।

যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের নির্ধারিত সেবা কেন্দ্রে পুনঃপুনঃ যেতে হয়, সে কারণে শিশুর বাবা-মাকে উৎসাহিত করতে হবে ও পরামর্শ দিতে হবে যেন তারা কেন্দ্র থেকে পাওয়া নির্দেশ ও

উপদেশ পুরোপুরি মেনে চলেন এবং সন্তানের কল্যাণে কোন রকম বিরতি না দিয়ে নিয়মিতভাবে শিশুটিকে কেন্দ্রে নিয়ে যান এবং এ ব্যাপারে কোনভাবেই অবহেলা না করেন।

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ভর করে তার সমস্যার ধরনের উপর। অনেক কেন্দ্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা সহজ হলেও, শ্রবন ও বাক- প্রতিবন্ধীর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতে পারে। স্বল্পমাত্রার হাত ও পায়ের সমস্যাগ্রস্থ শিশু প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম উপকরণের মাধ্যমে অনেকাংশে চিকিৎসা করা সম্ভব। জেলা পর্যায়ে কোন কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় এ সকল সুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য একজন কমিউনিটি প্যারামেডিক এর জানার প্রয়োজন আছে। এ সকল তথ্য একজন কমিউনিটি প্যারামেডিক এর জানা থাকলে প্রতিবন্ধী শিশুদের সকল প্রকার সাহায্য করা সম্ভব হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশুদের বেলায় এ ধরনের সুবিধা পাবার/ ভোগ করার সুযোগ থাকে না।

পাঠ-১৫

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উপায় ও সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

প্রতিবন্ধিতার কারণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে কোন ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করলে শিশুদের এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এজন্য শিশুর জন্মপূর্ব (গর্ভাবস্থা), প্রসবকালীন, জন্মের পর এবং শৈশবকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা সাবধানতার গুরুত্ব অপরিসীম।

জন্মের পূর্ব (গর্ভাবস্থায়)

জন্মের পূর্বে বা গর্ভাবস্থায় যে সকল কারণ শিশুর বিকলাঙ্গতা বা প্রতিবন্ধিতার জন্য দায়ী এবং যেসব বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. গর্ভাবস্থায় মায়ের তামাক ব্যবহার হতে দূরে থাকা

খ. গর্ভাবস্থায় যে কোন ঔষধ ব্যবহারে সচেতনতা অবলম্বন করা, বিশেষ করে হাঁপানি বা ডায়াবেটিস-এর ঔষধ ব্যবহার কালে

গ. গর্ভাবস্থায় পেটের এক্স-রে (X-ray) থেকে বিরত থাকা

ঘ. পারতপক্ষে হাম, ফ্লু, জল বসন্ত বা অন্য কোন রকম ভাইরাস জাতীয় রোগের কাছে না যাওয়া।

ঙ. খাবারে ও রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা,

চ. গর্ভপাতের জন্য অদক্ষ দাই বা ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী কোন ঔষধ সেবন না করা

ছ. গর্ভবতী মাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুষ্টিহীনতা বা যে কোন রকম আঘাত থেকে রক্ষা করা।

প্রসবকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ক. অদক্ষ দাই এর হাতে প্রসব করানো হতে বিরত থাকা

খ. গর্ভের শিশু অস্বাভাবিক উপস্থিতি থাকলে, সম্ভব হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা হাসপাতালে দক্ষ ব্যক্তির হাতে প্রসব করানো

গ. দীর্ঘায়িত প্রসব হলে সম্ভব হলে জন্মের পর শিশুর জন্য অক্সিজেন এর ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োগ করা

ঘ. নবজাতককে গরমের মধ্যে রাখা ও জন্মের পর পর মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো।

শিশু জন্মের পর ও শৈশবকালে

ক. জন্মের পর, নবজাতককে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করা।

খ. বাহ্যিক সুস্থ শিশুকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। (বয়স বাড়ার সঙ্গে সঠিকভাবে শিশুর বৃদ্ধি হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে মা'দেরকে নিয়মিত গ্রোথ মনিটরিং করতে নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে)।

গ. জন্মের পর থেকে দু'বছর বয়সের মধ্যে যে সকল টিকা দেবার কথা, সে সকল টিকা সময়মত নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা। কারণ পোলিও, ডিপথেরিয়া, হাম ইত্যাদি প্রতিবন্ধিতার প্রধান কারণ। টিকা দিলে শিশু এ সব রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ঘ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এড়াতে ভিটামিন এ ক্যাপসুল নিয়ম অনুযায়ী খাওয়ানো।

ঙ. বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুনড়া চড়া, পাশ ফেরা ইত্যাদি শেখে, তাই ৩-৪ মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে উঁচু বিছানায় একা রাখা উচিৎ নয় বলে মাকে উপদেশ দেয়া।

চ. তীব্র জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে অবিলম্বে ঔষধ ও স্পঞ্জ করে জ্বর নিয়ন্ত্রণ করা।

ছ. তীব্র ডায়রিয়া হলে, পানি শূন্যতার চিকিৎসা করা।

জ. চঞ্চলতা শিশুর স্বভাব, তাই শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য বাড়ির চারিপাশ নিরাপদ রাখা।

ঝ. মানসিক বিকাশের সম্পর্কে সচেতন থাকা ও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

পরিবারে কোন শিশু প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা কত বড় সমস্যা কেউ সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রতিবন্ধিতা একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আজীবন সমস্যা। কাজেই এই ব্যাপারে প্রতিটি মানুষের সচেতন ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

জনগণকে যা বলতে হবে-

ক. শিশুর প্রতিবন্ধিতা পরিবারের জন্য যেমন একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তেমনি সমাজের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে, প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। এই সমস্যা সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়, তাই আক্রান্ত শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলে সমাজের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

খ. আমাদের সমাজে নানান রকম রোগ ব্যাধি বিরাজমান। গুটি বসন্ত, পোলিও, টিটেনাস প্রভৃতি রোগ যেগুলো একসময় প্রতিনিয়ত দেখা যেত, এখন প্রায় সম্পূর্ণ বা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং জনগণের চেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে এই সকল রোগ নির্মূলকরণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাতৃ মৃত্যুর হারও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই সবই সম্ভব হয়েছে জনগণের

মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই উদাহরণ টেনেই আমরা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার ব্যাপকতা কম না হলেও, এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সামাজিকভাবে খুব কম উদ্যোগই নেয়া হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

ক. কমিউনিটিকে প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

খ. শিশুদের প্রতিবন্ধিতা রোধের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

গ. কোন কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি সামান্য সহায়তার মাধ্যমে সমাজে কর্মক্ষম ব্যক্তি হয়ে জীবন যাপন করতে পারেন।

ঘ. আক্রান্ত শিশুদের মা-বাবা ও পরিবার কোন স্থান বা কেন্দ্র হতে তাদের শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য ও সহযোগীতা পেতে পারেন সেই তথ্য প্রদান।

ঙ. আক্রান্ত ব্যক্তির/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলাফেরা ও জীবনকার্য সহজ ও আরামদায়ক করতে জনগণ কি কি করতে পারেন।

চ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সমাজের লোকদের কি ধরনের ইতিবাচক আচরণ থাকা উচিৎ।

প্রথমে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রদান করা উচিত। এইসব প্রভাশালী ব্যক্তিরা সচেতন হলে পরবর্তী সময়ে তাঁরাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন। একজন কমিউনিটি প্যারামেডিক তার বিভিন্ন সভায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য বিশেষ সেবা পাওয়ার কি কি ব্যবস্থা আছে

প্রতিবন্ধি হলে শিশুকে নিচে উল্লেখিত যে কোন প্রতিষ্ঠান হতে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ।

২. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, শাহবাগ, ঢাকা।

৩. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ধানমন্ডি।

৪. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।

৫. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতুয়াইল, ঢাকা।

৬. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আশুলিয়া, ঢাকা।

৭. মিরপুর শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।

৮. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মা ও শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

৯. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

১০. প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা, মিরপুর, ঢাকা।

১১. ডিসঅ্যাবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন এ্যান্ড রিসার্চ ।

১২. কল্যাণী, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন, মগবাজার, ঢাকা।

অধ্যায় ৫ : বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসুচী

পাঠ-১
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী

বাংলাদেশে ১৯৫১ সাল হতে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২৩টি বৃহত্তম জেলায় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্লিনিকের মাধ্যমে ঐ সকল জেলার শহরের বিদ্যালয়ের সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের কেবলমাত্র রোগের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। ফলে দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সম্পৃক্ত করে ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পাইলট প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প ৪টি জেলায় কুমিল্লা, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোর ও অধীনস্থ ৩৯ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে একটি কার্যক্রম শুরু করেন। এই

প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২,০০০ শিক্ষক ও সেবাদান কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কৃমির বড়ি খাওয়ান হয়। প্রকল্পটি ১৯৯৮ সনের জুনে শেষ হয়।

একটি নিরপেক্ষ সার্ভেতে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ পূর্বের তুলনায় অনেক স্বাস্থ্য সচেতন এবং কৃমিতে আক্রান্তের পরিমান শতকরা ৪০% ভাগ থেকে কমে শতকরা মাত্র ২৩% ভাগ হয়েছে।

পুষ্টিহীনতা, ভিটামিন-এ অভাব জনিত অন্ধত্ব, আয়োডিনের অভাবজনিত রোগসমূহ দূর করতে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, শিশুদের বাড়তি খাবার দেয়ার নিয়ম সমূহ বলা, ভিটামিন যুক্ত খাবার (বিশেষতঃ ভিটামিন-এ) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে দেশের পুষ্টিহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর করা সম্ভব। কারণ একজন শিক্ষক তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও আন্তরিকতা দিয়ে আগামী দিনে নাগরিক সৃষ্টি করেন। আর একজন ছাত্র তার ছাত্র জীবনের জ্ঞান, ধারণা, অভ্যাস ও সচেতনতা দিয়েই আগামী দিনে সুস্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে এইচপিএনএসডিপি (২০১১-২০১৬) তে এই কর্মসূচীর উপর জোর দেয়া হয়। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, অপুষ্টি সংক্রামক রোগ, কৃমি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এসব বিষয়ের পাশাপাশি চোখ, কান ও দাঁতের সমস্যা, হাত ধোয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জীবন দক্ষতা শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর তিন প্রধান অংশ নিম্নরূপ ঃ

১) বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সেবা

- চিকিৎসক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চোখ, কান ও দাঁতের সমস্যা চিহ্নিত করা ও চিকিৎসা প্রদান ও ছোট খাট রোগের চিকিৎসা প্রদান।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধ।
- টিকাদান।
- কৃমির ঔষধ খাওয়ানো।

বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন।

২) স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা

- বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

- প্রস্রাবখানা ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।
- নিরাপদ পানির সরবরাহ করা।
- খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা (মানসিক বিকাশের জন্য)
- নব-আবির্ভূত রোগ সর্ম্পকে সচেতন করা

৩) বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে স্বাস্থ্যকর আচরণে অভ্যস্ত করা এই কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। আচরণ পরিবর্তনে যোগযোগের (বিসিসি) মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে শিশুদের ও পিতা মাতাকে স্বাস্থ্য জ্ঞান দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সেবা ও সেবাদান কৌশল

সেবাসমূহ	সেবাদান কৌশল	লক্ষিত জনগোষ্ঠি	সেবাদানকারী
• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। • ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কৃমির বড়ি বিতরণ। • নিয়মিত নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। • নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা, আয়োডিন অভাব জনিত রোগ, ভিটামিন এ, ইপিআই এবং আইএমসিআই ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।	• প্রতিমাসে একবার স্বাস্থ্য কর্মী বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ব্রেষ্ট ফিডিং, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ডায়রিয়া, আইএমসিআই, পুষ্টি, ইপিআই, কৃমিরোগ, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বনির্ধারিত দিন ও সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দিবেন। • প্রতি ৬ মাস পরপর নির্ধারিত দিনের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃমির বড়ি খাওয়াবেন (ট্যাবলেট, এলবেন্ডাজল ৪০০ মিঃ গ্রামঃ এক বড়ি) • বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যবেক্ষণ যথা- নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা, পরিস্কার পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। • বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হলে/ অসুস্থ থাকলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে/	বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী	কমিউনিটি প্যারমেডিক, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী।

	কমিউনিটি ক্লিনিকে রেফার করা।		

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সেবা ও সেবাদান কৌশল

সেবা সমূহ	সেবাদান কৌশল	লক্ষিত জনগোষ্ঠি	সেবাদানকারী
• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। • ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কৃমির বড়ি বিরতণ। • নিয়মিত নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। • নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা, আয়োডিন অভাব জনিত রোগ, ভিটামিন এ, ইপিআই এবং আইএমসিআই ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান। • প্রতিমাসে ১ দিন বিদ্যালয়ের অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা প্রদান।	• প্রতিমাসে একবার স্বাস্থ্য কর্মী বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ব্রেষ্ট ফিডিং, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ডায়রিয়া, আইএমসিআই, পুষ্টি, ইপিআই, কৃমিরোগ, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব-নির্ধারিত দিন ও সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দিবেন। • প্রতি ৬ মাস পরপর নির্ধারিত দিনের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃমির বড়ি খাওযাবেন (ট্যাবলেট, এলবেন্ডাজল ৪০০ মিঃ গ্রামঃ এক বড়ি) • বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যবেক্ষণ যথা- নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা, পরিস্কার পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। • প্রয়োজনে অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে/ কমিউনিটি ক্লিনিকে রেফার করা।।	বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী	এম,ও/এম, এ/ স্যাকমো/ সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/ সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/ ইউএইচএফপিও

সেবা সমূহ	সেবাদান কৌশল	লক্ষিত জনগোষ্ঠি	সেবাদানকারী
• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ।	• প্রতিমাসে একবার স্বাস্থ্য শিক্ষামুলক অধিবেশনের আয়োজন। • প্রাত তিন মাস পরপর	বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী	এম,ও (নির্ধারিত)/ ইউএইচএফপিও /ইউএফপিও/এইচ

• ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কৃমির বড়ি বিরতণ। • নিয়মিত নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। • নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা, আয়োডিন অভাব জনিত রোগ, ভিটামিন এ, ইপিআই এবং আইএমসিআই ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান। • সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ সর্ম্পকে সচেতন করা • প্রতিমাসে ১ দিন বিদ্যালয়ের অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা প্রদান।	বিদ্যালযেল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কৃমির বড়ি বিরতণ। • বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যবেক্ষণ যথা- নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল কাটা, পরিস্কার পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। • উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর চিকিৎসক প্রয়োজনে গুরুতর অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা। • শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত কর্মশালার আয়োজন করা		আই/এস আই